পরিবেশ বিজ্ঞান

দানা খাদ্য ফসল চাষের আধুনিক প্রযুক্তি

মোঃ সদরুল আমিন

পরিবেশ বিজ্ঞান : দানা খাদ্য ফসল চাষের আধুনিক প্রযুক্তি শীর্ষক গ্রন্থটি কৃষিবিজ্ঞানসহ উদ্ভিদবিজ্ঞান ও পরিবেশবিজ্ঞান বিষয়ের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের সহায়ক তথ্যসংশ্লিষ্টে প্রণীত হয়েছে। গ্রন্থটি কৃষিবিজ্ঞানের বিশেষ করে কৃষিতত্ত্ব-বিষয়ক উচ্চতর পর্যায়ে বিস্তারিত অধ্যয়নের উপযোগী করে রচিত। দানা খাদ্য ফসলের মধ্যে বিশেষ করে ধান ফসলের আধুনিক জাতের সাধারণ ও কৌলিক পরিচিতি, চাষ পদ্ধতিসংশ্লিষ্ট আধুনিক প্রযুক্তি সম্বন্ধীয় বর্ণনার পাশাপাশি ধানশস্যের রোগ ও পোকা আক্রমণবিষয়ক বর্ণনা গ্রন্থটিকে তথ্যবহুল করেছে। অন্যান্য দানা খাদ্য ফসল সম্পর্কেও বেশ বিস্তারিত ও আধুনিক তথ্য গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ধান উৎপাদনের পাশাপাশি অন্যান্য দানাখাদ্য ফসল যেমন– ভুট্টা, কাউন, চীনা ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন বিষয়ে অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণে গ্রন্থটি কাজে আসতে পারে। প্রায় প্রত্যেকটি দানা খাদ্য ফসলের জাত পরিচিতি ও সেগুলোর উৎপাদন ধারাবিষয়ক তথ্যও গ্রন্থটিতে উপস্থাপিত হয়েছে। অধিকাংশ অধ্যায় সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে যা গ্রন্থটির মান বৃদ্ধি করেছে। সর্বোপরি পাঠ্যসূচি অনুসরণে বিষয়ভিত্তিক গ্রন্থ প্রণয়নে যথাসম্ভব আধুনিক তথ্য সমৃদ্ধকরণ ও প্রমিত বানানে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর ভূমিকা উচ্চ শিক্ষাস্তরে বাংলায় পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়নের অভ্যাস গঠনে অগ্রগণ্য।

Bangla Academy
ISBN -984-07-4131-4

BANSDOC Library ★ Dhaka ★

পরিবেশ বিজ্ঞান

দানা খাদ্য ফসল চাষের আধুনিক প্রযুক্তি

পরিবেশ বিজ্ঞান : দানা খাদ্য ফসল চাষের আধুনিক প্রযুক্তি

(দানা খাদ্য ফসল চাষ সম্পর্কিত আধুনিক প্রযুক্তিবিষয়ক বর্ণনা)

প্রথম প্রকাশ

জ্যৈষ্ঠ ১৪০৭ / জুন ২০০১

বাএ ৪১২২
(২০০০-২০০১ পাঠ্যপুস্তক : জীকৃচি ১৩)
মুদ্রণ সংখ্যা ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
জীববিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যা উপবিভাগ
জীকৃচি ২৯১

প্রকাশক

সুব্রত বিকাশ বড়ুয়া
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক

মোঃ হামিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ

শা. র. শামীম

মূল্য

তিনশত ষাট টাকা মাত্র

PARIBESH BIJNAN: DANA KHADYA FASAL CHASHER ADHUNIK PROJUKTI (Environmental Science : Modern Technologies for Cereal Crop Cultivation) by Dr. Md. Sadrul Amin. Published by Subrata Bikash Barua, Director, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka-1000, Bangladesh. First Published : June 2001. Price : Tk. 360.00

ISBN 984-07-4131-4

BANSDOC Library
Accession No. 17802
Date 10.6.04

উৎসর্গ

মাকে

Dhaka

BANSDOC Library
Dhaka

ভূমিকা

বর্তমান বাংলাদেশের চাষযোগ্য জমির শতকরা প্রায় ৯০ ভাগেই দানা খাদ্য ফসলের চাষাবাদ হয়ে থাকে। এর মধ্যে প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ জমিতে কেবল ধান চাষ হয়।

বাংলাদেশে ধান চাষের বিষয়টি ধানের জাত, মাটির উর্বরতা এবং ফলনের তারতম্যের ভিত্তিতে অত্যন্ত জটিল ও ব্যাপক। এদেশে স্থানীয় ও বিদেশী জাত মিলে প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক ধানের জাত রয়েছে। এর মধ্যে কিছু সংখ্যক নিজস্ব উদ্ভাবিত উফশী জাতও রয়েছে। বাংলাদেশে বেলে মাটি থেকে শুরু করে এঁটেল মাটি এবং উঁচু জমি থেকে শুরু করে নিচু জমিতে সারা বছরই ধানের চাষ হয়। ধানের ফলন হেক্টর প্রতি ১ টন থেকে ১.৫ টনের মতো। এক্ষেত্রে বলা যায়, কাঙ্ক্ষিত ফলন প্রাপ্তি তথা তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য সংবলিত ও যথাযথ অভিযোজনশীলতাসম্পন্ন ফসল চাষের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কিত পাঠ্যবই প্রণয়ন করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ। তারপরও এই শ্রমসাধ্য ও কঠিন কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করার মাধ্যমে যথাসম্ভব আধুনিক তথ্য সমৃদ্ধ 'পরিবেশ বিজ্ঞান : দানা খাদ্য ফসল চাষের আধুনিক প্রযুক্তি' গ্রন্থটি প্রণয়ন করার প্রয়াস পেয়েছি।

যাহোক, অনেক দিনের প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থী, কৃষক, গবেষক, নীতি-নির্ধারক সকলের বিষয় ও পাঠ বিষয়ক চাহিদা বিবেচনায় রেখে এই গ্রন্থটি প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া মূলপাঠের যথাসম্ভব সংগৃহীত তথ্য এবং গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত পাঠসংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থটির মান বৃদ্ধি করেছে বলে ধারণা করা যায়। আশা করি ভবিষ্যত চাহিদার নিরিখে এর আরও উন্নয়ন ঘটানো সম্ভবপর হবে।

পরিশেষে যাদের জন্য এই গ্রন্থটি প্রণীত হয়েছে, তাদের উপকারে এলেই আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। গ্রন্থটির উৎকর্ষতা সাধনের জন্য যে কোনো যুক্তি, তথ্য বা পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সর্বোপরি গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ এবং প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ
দিনাজপুর

ড. মোঃ সদরুল আমিন

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : দানা খাদ্য ফসল ১-২৩

১. খাদ্য ফসলের প্রকার ১
২. বিশ্ব খাদ্য উৎপাদনের বিবরণ ১
৩. দানা খাদ্য ফসল ১৭
৪. বাংলাদেশের দানা খাদ্য ফসল ১৮
৫. দানা ফসলের বিবরণ ১৮

দ্বিতীয় অধ্যায় : ধান চাষ ২৪-৫৪

১. ধান গাছ পরিচিত ২৪
২. ধানের জাত পরিচিতি ২৪
৩. ধানের উৎপত্তি ২৬
৪. ধান দানার বৈশিষ্ট্য ২৬
৫. ধান চাষের গুরুত্ব ২৭
৬. ধান চাষের শ্রেণিকরণ ২৮
৭. চাষাবাদের ঋতু বা মৌসুম অনুসারে শ্রেণিকরণ ২৯
৮. চাষাবাদ কৌশল অনুসারে ধান চাষের শ্রেণিকরণ ২৯
৯. ধানের আলোর প্রয়োজনীয়তাভিত্তিক শ্রেণিকরণ ৩১
১০. প্রতি হেক্টরে ফসলের আয় ব্যয় ৩২
১১. বাংলাদেশের ধান চাষের পরিসংখ্যানগত তথ্য ৪০

তৃতীয় অধ্যায় : ধান জাতের বৈশিষ্ট্য ৫৫-৯৪

১. ধানের জাত ৫৫
২. স্থানীয় জাতের বৈশিষ্ট্য ৫৫
৩. স্থানীয় উন্নত জাতের বৈশিষ্ট্য ৫৫
৪. বাংলাদেশের স্থানীয় ধান জাতের বিবরণ ৫৬
৫. স্থানীয় জাতের ধান ফসল ৫৬
৬. স্থানীয় জাতের ধান দানার বৈশিষ্ট্য ৬০
৭. স্থানীয় জাতের ধান শীষ ও দানার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য ৬৪
৮. স্থানীয় জাতের ধানের শীষ/উপশীষ ও দানা বিন্যাস বৈশিষ্ট্য ৭৩
৯. স্থানীয় জাতের ধান শীষ/ দানার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য ৭৪
১০. আধুনিক উফশী জাতের বৈশিষ্ট্য ৭৭
১১. উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান, উৎপাদন মৌসুম ও ফলন ৭৮
১২. উফশী ধান জাতের পূর্ব বংশ ৭৯
১৩. উফশী ধান জাতের প্রজননে ব্যবহৃত পূর্ব বংশের পরিচিতি ৮০
১৪. উফশী ধান জাত ৮৫

17802 10.6.04

১৫. উফশী জাতের ধান দানার বৈশিষ্ট্য ৮৫
১৬. উফশী জাতের ধান ফসলের তুলনামূলক পার্থক্য ৮৯
১৭. উফশী বা আধুনিক জাতের ধান শীষের তুলনামূলক পার্থক্য ৯১
১৮. উফশী ধান দানায় তুলনামূলক পার্থক্য ৯৩
১৯. ধানের উচ্চ ফলনশীল সম্ভাবনাময় সারি ৯৪

চতুর্থ অধ্যায় : ধান জাতের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য **৯৫-১০২**

১. উন্নত রোপা আমন ধান জাতের কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ৯৫
২. উন্নত রোপা আমন ধান জাতের ফলন বৈশিষ্ট্য ৯৫
৩. উন্নত রোপা আমন ধান গাছের উচ্চতা ও জীবনকাল ৯৬
৪. উন্নত রোপা আমন ধান জাতের দানার বৈশিষ্ট্য ৯৭
৫. উন্নত ধান জাতের রোগ-পোকার সংক্রমণ বৈশিষ্ট্য ৯৭
৬. উন্নত রোপা আমন ধান জাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও চাষ এলাকা ৯৮
৭. উন্নত আউশ ধান জাতের কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ৯৯
৮. উন্নত বোরো ধান জাতের কুশির সংখ্যা ও ফলন ৯৯
৯. উন্নত বোরো ধান জাতের কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ১০০
১০. উন্নত উফশী ধান জাতের ফলন বৈশিষ্ট্য ১০১
১১. উন্নত বোরো ধান জাতের সংক্রমণ বৈশিষ্ট্য ১০১

পঞ্চম অধ্যায় : বাংলাদেশের ধান জাতের বিবরণ **১০৩-১৩৩**

১. চান্দিনা (বিআর ১) ১০৩
২. বিপ্লব (বিআর ৩) ১০৩
৩. মুক্তা (বিআর ১১) ১০৪
৪. গাজী (বিআর ১৪) ১০৪
৫. কিরণ (বিআর ২২) ১০৫
৬. দিশারী (বিআর ২৩) ১০৫
৭. নয়াপাজাম (বিআর ২৫) ১০৬
৮. শ্রাবণী (বিআর ২৬) ১০৬
৯. ব্রিধান-২৮ ১০৭
১০. ব্রিধান-২৯ ১০৯
১১. ব্রিধান-৩০ ১১০
১২. ব্রিধান-৩১ ১১২
১৩. ব্রিধান-৩২ ১১৪
১৪. ব্রিধান-৩৩ ১১৬
১৫. ব্রিধান-৩৪ ১১৮
১৬. ব্রিধান-৩৫ ১২০
১৭. ব্রিধান-৩৬ ১২২
১৮. ব্রিধান-৩৭ ১২৪
১৯. ব্রিধান-৩৮ ১২৬

২০. ব্রিধান-৩৯ ১২৮
২১. বিনাধান-৫ ১৩০
২২. বিনাধান-৬ ১৩০
২৩. বিনাশাইল ১৩৩
২৪. পূর্বাচী ১৩৩

Library Dhaka

ষষ্ঠ অধ্যায় : ধান গাছের বৃদ্ধি পর্যায় ১৩৪-১৩৯

১. বৃদ্ধি পর্যায়ের প্রকরণ ১৩৪
২. বৃদ্ধি পর্যায় ও ধান গাছের জীবনকাল ১৩৪
৩. ধানের চারা পর্যায় ১৩৪
৪. কুশি উৎপাদন পর্যায় ১৩৫
৫. ফুল উৎপাদন পর্যায় ১৩৬
৬. দানা পুষ্টি পর্যায় ১৩৬
৭. দানা পরিপক্ব সময় ১৩৭

সপ্তম অধ্যায় : ধান চাষ পদ্ধতি ১৪০-১৯৭

১. জমি ও মাটি নির্বাচন ১৪০
২. বীজ বাছাই ও জাগ দেওয়া ১৪০
৩. চারা উৎপাদন ১৪১
৪. বীজতলার প্রকার ও বীজ বপন ১৪২
৫. বীজতলার যত্ন ও চারা সংরক্ষণ ১৪৩
৬. মূল জমি তৈরি ১৪৪
৭. চারা রোপণ সময় ১৪৪
৮. চারা রোপণ কৌশল ১৪৫
৯. বোনা আউশের জমি তৈরি ১৪৫
১০. বীজ বপন ও সার প্রয়োগ ১৪৬
১১. সার প্রয়োগ ১৪৬
১২. ধানভিত্তিক ফসল বিন্যাসের উদাহরণ ১৪৭
১৩. চাষ পদ্ধতি ১৫২
১৪. সবজি ১৫৩
১৫. সবুজ সার ১৫৫
১৬. অঙ্কুরিত বোনা আমন ১৬০
১৭. বিনাধান চাষ পদ্ধতি ১৬১
১৮. সঙ্কর ধানের জাত উৎপাদন পদ্ধতি ১৬৫
১৯. সঙ্করসাবল্যের মূল্যায়ন ১৭১
২০. সঙ্কর বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি ১৭৭
২১. অবাঞ্ছিত গাছ বাছাই ১৮২
২২. সঙ্কর ধানের বীজ উৎপাদনে সম্ভাব্য ফলন ১৮৪
২৩. সঙ্কর ধান চাষের কলাকৌশল ১৮৮

২৪. দুই সারি সিস্টেমের সঙ্কর ধানের প্রজনন ১৯৩
২৫. বহুক্রণী ধান ১৯৫
২৬. সঙ্কর বীজ উৎপাদন ১৯৬

অষ্টম অধ্যায় : ধানের জমিতে সার প্রয়োগ ও পানি ব্যবস্থাপনা ১৯৮-২০৩

১. সারের প্রকার ১৯৮
২. উফশী ধানের জমিতে সার প্রয়োগের সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা সুপারিশ ১৯৮
৩. মৌসুম ও জাতভেদে ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগের সময় ও সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর) ১৯৯
৪. ধানের জমিতে সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিমালা ২০০
৫. ধানের জমিতে সবুজসারকরণ ২০২
৬. ধানের জমিতে এজোলার সবুজসারকরণ ২০২
৭. পানিসেচ ব্যবস্থাপনা ২০৩

নবম অধ্যায় : ধানের জমিতে আগাছা দমন ২০৪-২১৮

১. গুরুত্ব ও প্রকার ২০৪
২. ধানক্ষেতের প্রধান প্রধান আগাছা পরিচিতি ও নিয়ন্ত্রণ ২০৬
৩. শ্যামা ২০৬
৪. চাপড়া ঘাস ২০৭
৫. ঝরাধান বা লালধান ২০৭
৬. আরাইল ২০৮
৭. জয়না ২০৮
৮. কলমিলতা ২০৮
৯. বড় আঙুলি ঘাস ২০৯
১০. ক্ষুদে আঙুলি ঘাস ২০৯
১১. বড়চুচা ২১০
১২. ভেদাইল ২১১
১৩. হলদে মুথা ২১১
১৪. শিয়াললেজা ২১২
১৫. চেলা ঘাস ২১৩
১৬. দূর্বা ২১৩
১৭. পানিকচু (নখা) ২১৩
১৮. লেপ্টোক্লোয়া ২১৪
১৯. চিচড়া ২১৪
২০. বিষকাটালি ২১৪
২১. শোলা ও লজ্জাবতী ২১৫
২২. হেলেঞ্চা ২১৬
২৩. কানাই : কানাইবাঁশি ২১৬
২৪. পানা : ক্ষুদিপানা ২১৭
২৫. কচুরিপানা ২১৭

দশম অধ্যায় : ধানের পোকা দমন ২১৯-২৩৭

১. পোকার প্রকরণ ও দমন পদ্ধতি ২১৯
২. বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক এবং প্রয়োগ মাত্রা ২১৯
৩. মাজরা পোকা ২২০
৪. গলমাছি বা নলিমাছি ২২২
৫. বাদামি গাছফড়িং ২২৩
৬. সাদা-পিঠ গাছফড়িং ২২৪
৭. সবুজ পাতাফড়িং ২২৫
৮. থ্রিপ্‌স ২২৫
৯. পামরী পোকা ২২৬
১০. শীষকাটা লেদাপোকা ২২৭
১১. ছাতরা পোকা ২২৭
১২. স্কিপার পোকা ২২৮
১৩. পাতামাছি ২২৮
১৪. চুঙ্গি পোকা ২২৮
১৫. পাতামোড়ানো পোকা ২২৯
১৬. গান্ধী পোকা ২৩০
১৭. লেদাপোকা ২৩১
১৮. উড়চুঙ্গা ২৩২
১৯. ক্ষতিকর ইঁদুর ২৩২
২০. ক্ষতিকর পাখি ২৩৩
২১. মাজরা পোকা ও গলমাছি দমনের অনুমোদিত কীটনাশক ও প্রয়োগমাত্রা ২৩৩

একাদশ অধ্যায় : ধানের উপকারী পোকামাকড় ২৩৮-২৪৬

১. ধানের উপকারী পোকার বৈশিষ্ট্য ২৩৮
২. উপকারী পোকার ধরন ২৩৮

দ্বাদশ অধ্যায় : ধানের রোগ দমন ২৪৭-২৫৯

১. প্রকরণ ও দমন পদ্ধতি ২৪৭
২. মাঠ সমস্যা নিরূপণ ২৪৭
৩. ছত্রাকজনিত : বাদামি দাগ রোগ ২৪৯
৪. ব্লাস্ট রোগ ২৪৯
৫. ফল্‌স স্মার্ট রোগ ২৫০
৬. গোড়া পচা বা বাকানি রোগ ২৫০
৭. চারা পোড়া বা ঝলসানো রোগ ২৫১
৮. চারাধসা ২৫১
৯. পাতা সরু বাদামি দাগ রোগ ২৫১
১০. খোলপোড়া বা খোল ঝলসানো রোগ ২৫২

১১. কাণ্ডপচা রোগ ২৫৩
১২. পাতা ফোস্কা রোগ ২৫৩
১৩. খোলপচা রোগ ২৫৪
১৪. ব্যাকটেরিয়াজনিত : পাতাপোড়া রোগ ২৫৪
১৫. লালচে রেখা রোগ ২৫৫
১৬. কৃমিজনিত রোগ : উফরা বা ডাকপোড়া রোগ ২৫৫
১৭. ভাইরাসজনিত : টুংরো রোগ ২৫৬

ত্রয়োদশ অধ্যায় : গম চাষ ২৬০-২৬৫

১. ভূমিকা ২৬০
২. বাংলাদেশে গম আবাদের সম্ভাবনা ২৬২
৩. গম চাষের সুবিধা ২৬৩
৪. গম ও ধান পরবর্তী গম চাষ এলাকা ২৬৩
৫. গম জমির আয়তন ও উৎপাদন ২৬৩
৬. বাংলাদেশে গম চাষের কয়েকটি সমস্যা ২৬৪

চতুর্দশ অধ্যায় : গমের পরিচিতি ২৬৬-২৭০

১. উৎপত্তি ও বিস্তার ২৬৬
২. গমের জাত নির্বাচন ২৬৬
৩. গমের শ্রেণিবিন্যাস ২৬৭
৪. গম জাতের উচ্চতা, দানার বৈশিষ্ট্য ও জীবনকাল ৩৬৮
৫. গম জাতের ফলন বৈশিষ্ট্য ২৬৮
৬. গম গাছের বৃদ্ধি পর্যায় ২৬৯
৭. গম গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ের গুরুত্ব ২৬৯
৮. গমের বৃদ্ধি পর্যায় সময়সীমা ও এর কৃষিতাত্ত্বিক তাৎপর্য ২৭০

পঞ্চদশ অধ্যায় : গম চাষ পদ্ধতি ২৭১-২৭৯

১. জমি ও মাটি নির্বাচন ২৭১
২. বীজ নির্বাচন ও বপন ২৭১
৩. সার প্রয়োগ ২৭২
৪. বড় দুধিয়া ২৭৩
৫. হাতিশুঁড় ২৭৩
৬. দণ্ডকলস বা শ্বেতদ্রোণ ২৭৪
৭. বিন্দলতা বা হিরণখুড়ি আগাছা ২৭৪
৮. মিকানিয়া লতা ২৭৫
৯. উলু ২৭৫
১০. পোকা দমন ২৭৬
১১. ইঁদুর দমন ২৭৬
১২. রোগ দমন ২৭৭

১৩. ফসল কাটা ও মাড়াই ২৭৭
১৪. মুগ-রোপা আমন-গম ২৭৮

ষোড়শ অধ্যায় : উন্নত জাতের গম উৎপাদন ২৮০-২৮৭

১. ভূমিকা ২৮০
২. গমের জাত ২৮০
৩. আকবর ২৮১
৪. অঘ্রানী ২৮১
৫. গমের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি সারমর্ম ২৮৩
৬. সার প্রয়োগ ২৮৪
৭. পরিচর্যা ২৮৪
৮. গমের রোগ : গমের পাতার মরিচা রোগ ২৮৪
৯. গমের পাতায় দাগ রোগ ২৮৫
১০. গমের গোড়া পচা রোগ ২৮৫
১১. গমের আলগা ঝুল রোগ ২৮৫
১২. গমের বীজের কালো দাগ রোগ ২৮৬
১৩. গম চাষের অন্যান্য প্রযুক্তি : বিনা চাষে গম আবাদ ২৮৬
১৪. স্বল্প চাষে গম আবাদ ২৮৭
১৫. গমের বীজ সংরক্ষণ প্রযুক্তি ২৮৭
১৬. গম মাড়াই ২৮৭

সপ্তদশ অধ্যায় : বার্লি ২৮৮-২৯১

১. ভূমিকা ২৮৮
২. বাংলাদেশে বার্লি উৎপাদন তথ্য ২৮৮
৩. বার্লির জাত ২৮৮
৪. বারি বার্লি-২ ২৮৯
৫. বারি বার্লির উৎপাদন প্রযুক্তি ২৮৯
৬. বার্লির রোগ দমন : পাতা ঝলসানো রোগ ২৯০
৭. বার্লির গোড়াপচা রোগ ২৯১

অষ্টাদশ অধ্যায় : ভুট্টা চাষ ২৯২-২৯৯

১. ভুট্টা উপপ্রজাতির পরিচিতি ২৯২
২. বাংলাদেশে ভুট্টার জমির পরিমাণ ২৯৪
৩. খাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার ২৯৬
৪. বাংলাদেশে ভুট্টার জাতসমূহের পরিচিতি ২৯৮
৫. ভুট্টাভিত্তিক উন্নত ফসল বিন্যাস ২৯৮

ঊনবিংশ অধ্যায় : উচ্চ ফলনশীল জাতের ভুট্টা উৎপাদন ৩০০-৩১১

১. বর্ণালী ৩০০
২. শুভ্রা ৩০০

৩. খইভুট্টা ৩০১
৪. মোহর ৩০১
৫. বারি ভুট্টা-৫ ৩০১
৬. বারি ভুট্টা-৬ ৩০২
৭. বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১ ৩০২
৮. ভুট্টার সাধারণ চাষ পদ্ধতি ৩০২
৯. ভুট্টা উৎপাদন প্রযুক্তি ৩০৫

বিংশ অধ্যায় : ভুট্টার পোকা ও রোগ প্রতিকার **৩১২-৩১৫**

১. পোকা দমন ৩১২
২. ভুট্টার বীজ পচা ও চারা গাছের রোগ ৩১২
৩. ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ ৩১২
৪. ভুট্টার মোচা ও দানা পচা রোগ ৩১৩
৫. ভুট্টার কাণ্ডপচা রোগ ৩১৪
৬. বীজ সংগ্রহ ৩১৪
৭. ভুট্টা মাড়াই : শক্তিচালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র ৩১৪
৮. বীজ সংরক্ষণ ৩১৫

একবিংশ অধ্যায় : ক্ষুদে দানা ফসল **৩১৬-৩২৫**

১. ক্ষুদে দানা ফসল পরিচিতি ৩১৬
২. বাংলাদেশে ক্ষুদে দানা ফসলের গুরুত্ব ৩১৭
৩. কাউন ৩১৭
৪. কাউনের উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচিতি ও পুষ্টিমান ৩১৮
৫. কাউনের সাধারণ চাষ পদ্ধতি ৩১৯
৬. কাউনের উন্নত জাত : তিতাস ৩১৯
৭. সার প্রয়োগ ৩২০
৮. আগাছা দমন ৩২০
৯. কাউনের মিশ্র চাষ ৩২০
১০. ফসল কাটা, মাড়াই ও ব্যবহার ৩২১
১১. চীনার পরিচিতি ও গুরুত্ব ৩২২
১২. চীনার জাত : তুষার ৩২৩
১৩. জমি ও মাটি নির্বাচন ও তৈরি ৩২৩
১৪. বীজ বপন ৩২৩
১৫. সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা ৩২৪
১৬. চীনার ফসল বিন্যাস ৩২৪

তথ্যপঞ্জি **৩২৬**

দানা খাদ্য ফসল সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র **৩২৯-৩৬৮**

BAMSDOC Library
Dhaka

প্রথম অধ্যায়

দানা খাদ্য ফসল

খাদ্য ফসল : উদ্ভিদ বা উদ্ভিদের যেসব অংশ, বিশেষ করে দানা, প্রধানত মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে সাধারণভাবে দানা খাদ্য ফসল বলা হয়।

১। খাদ্য ফসলের প্রকার

খাদ্য ফসল সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত প্রকারের হতে পারে—

১. **দানা খাদ্য ফসল :** ধান, গম, ভুট্টা, সরগম, চীনা, কাউন, ভুরা, মারুয়া, বার্লি, জোয়ার, রাই, বাজরা, ওট বা যই, রাগি বা রিহা।

২. **কন্দ ফসল :** আলু, মিষ্টি আলু, কচু, কাসাভা।

৩. **ডাল ও তেল ফসল :** সয়াবিন, মুগ, মশুর, মাশকলাই, সরিষা, তিল, চীনাবাদাম ও নারকেল।

৪. **উদ্যান ফসল :** ফল, ফুল ও শাকসবজি।

৫. **পশুখাদ্য :** দানা ফসল ও ঘাস, লিগিউম, তৃণ ইত্যাদি।

বিশ্বের প্রধান খাদ্য ফসল হিসেবে ধান, গম, আলু ও ভুট্টাই প্রধান। উদ্ভিজ্জ আমিষ খাদ্য হিসেবে ডাল ও তেল ফসলের গুরুত্ব অধিক। বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহে বর্তমানে বিশেষ করে উষ্ণ ও অবউষ্ণ খাদ্য ফসলের বৈচিত্র্য অনেক বেশি। এসব এলাকার লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের উপর চাপ পড়ায় বিবিধ ফসলও খাদ্য ফসলের পর্যায়ে গুরুত্ব পাচ্ছে। বিশ্বে খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক তথ্যগত বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

২। বিশ্ব খাদ্য উৎপাদনের বিবরণ

১. ধান, গম, গলি, ভুট্টা, রাই, ওট, মিলেট, সরগম, কন্দাল ফসল, ডাল, তেল ও শিম-জাতীয় ফসল। এগুলোর মধ্যে গমের চাষাধীন জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, প্রায় ২.৩ কোটি হেক্টর।

২. খাদ্য ফসলের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ধান ও ভুট্টা। এগুলোর জমির পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ১৫ ও ১৩ কোটি হেক্টর।

৩. দানা রাইয়ের জমির পরিমাণ সবচেয়ে কম, দেড় কোটি হেক্টর মাত্র।

৪. দানা ফসলের মধ্যে হেক্টরে গড় উৎপাদন ভুট্টায় সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৪.৪ টন। এরপর রয়েছে ধান (৩.৭ টন/হেক্টর) ও গম (২.৬ টন/হেক্টর)।

৫. দানা ফসলের মধ্যে মোট উৎপাদন ভুট্টার সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৬১ কোটি টন।

৬. সারা বিশ্বে তেল ফসলের মধ্যে সয়াবিন চাষাধীন জমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৭.১ কোটি হেক্টর।

৭. বর্তমান দশকে নিম্নরূপ ফসলের অধীন জমির পরিমাণ বেড়েছে, কমেছে বা প্রায় সমান রয়েছে :

বেড়েছে	কমেছে	প্রায় সমান
গম	বার্লি	ভুট্টা
ধান	রাই	মিলেট
সয়াবিন	ওট	সরগম
সরিষা	শিম	কন্দাল
সূর্যমুখী	চীনাবাদাম	ডাল

বিশ্বে খাদ্য ফসলের উৎপাদন তথ্য

	১৯৮৯			১৯৯৮		
ফসল	জমি (লক্ষ হেক্টর)	ফলন (কেজি/ হেক্টর)	মোট উৎপাদন (লক্ষ টন)	জমি (লক্ষ হেক্টর)	ফলন (কেজি/ হেক্টর)	মোট উৎপাদন (লক্ষ টন)
গম	২২৭০	২৪৬২	৫৫৯১	২২৪৪	২৬২৪	৫৮৮৮
ধান	১৪৭৪	৩৫১৪	৫১৮১	১৫০৩	৩৭৪৭	৫৬৩১
বার্লি	৭৪৫	২২৮৯	১৭০৫	৬১৭	২২৫০	১৩৮৮
ভুট্টা	১৩২৪	৩৬৬১	৪৮৪৭	১৩৭৪	৪৩৯৫	৬০৪০
রাই	১৫৮	২১২৭	৩৩৬	১০৮	১৯৪১	২১০
ওট	২০৯	১৭৯৭	৩৭৭	১৪৬	১৭৭০	২৫৮
মিলেট	৩৭৪	৭৪৮	২৭৯	৩৭৬	৭৭৭	২৯২
সরগম	৪৩১	১৩২৪	৫৭১	৪৪৪	১৪২৮	৬৩৫
কন্দাল	৪৬৫	১২৩৬৮	৫৭৪৭	৪৮৫	১২৮৯০	৬২৫২
ডাল	৬৮২	৮১৮	৫৫৮	৬৮১	৮৩৭	৫৭০
শিম (শুষ্ক)	২৬১	৬২১	১৬২	২৫৭	৬৮৬	১৭৬
সয়াবিন	৫৭০	১৮৬৯	১০৬৩	৭০৭	২২৪০	১৫৮৩
চীনাবাদাম	২০৩	১১৫০	২৩৩	২৩৮	১৩০১	৩১০
সরিষা	১৮৩	১৩৬৮	২৫০	২৫০	১৩৪৩	৩৩৬
সূর্যমুখী	১৬৫	১৩৫৭	২২৩	২১৩	১১৭৪	২৫০

বিশ্বে দানা ফসল উৎপাদন তথ্য (১৯৯৮)

মহাদেশ	জমি (লক্ষ হেক্টর)	ফলন (কেজি/ হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ টন)
আফ্রিকা	৯৩৪	১২২০	১১৩৯

উঃ আমেরিকা	৯৩৬	৪৬৫০	৪৩৫৩
দঃ আমেরিকা	৩১৯	২৯২৬	৯৩৫
এশিয়া	৩২৪৮	৩০৫৯	৯৯৩৬
ইউরোপ	১৩১৪	২৯৩৪	৩৮৫৫
ওসেনিয়া	১৬৪	১৯৮৪	৩২৬
বিশ্ব	৬৯১৬	২৯৭০	২০৫৪৪

দানা ফসলের মহাদেশীয় উৎপাদন বৈশিষ্ট্য

১. সারা বিশ্বে প্রায় ৭০ কোটি হেক্টর জমিতে দানা ফসলের চাষ হয়।

২. জমির আয়তনের বিবেচনায় এশিয়া মহাদেশে দানা ফসলের জমি ও উৎপাদনের পরিমাণ বেশি, প্রায় ৩৩ কোটি হেক্টর।

৩. হেক্টর প্রতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে উত্তর আমেরিকায় দানা ফসলের গড় ফলন ৪৬৫০ কেজি। এটাই বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

৪. আফ্রিকা মহাদেশ দানা ফসলের গড় ফলন মাত্র ১২২০ কেজি/হেক্টর।

৫. সারা বিশ্বের দানা ফসলের গড় উৎপাদন প্রতি হেক্টরে ২৯৭০ কেজি।

জনসংখ্যার কৃষি নির্ভর সংখ্যা (%)

সাল	বাংলাদেশ	ভুটান	চীন	বাহরাইন/হংকং
১৯৯০	৬৫.৩	৯৪.১	৭২.২	২
১৯৯৫	৬০.৬	৯৩.৯	৬৯.৭	১
১৯৯৮	৫৭.৭	৯৩.৮	৬৭.০	১

বাংলাদেশে দানা ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত জনসংখ্যা

১. বাংলাদেশে মোট চাষকৃত জমির প্রায় ৯০% জমিতে ধানের চাষ হয়। এ হিসাবে এদেশে জনসংখ্যার প্রায় ৫০%-৬০% দানা ফসলের চাষাবাদের সাথে জড়িত।

২. এ বিবেচনায় বাংলাদেশে খাদ্য ও কর্মসংস্থান উভয় ক্ষেত্রেই দানা ফসলের চাষ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব খাদ্য সূচক বৈশিষ্ট্য

বিগত ১৯৮৯-৯১ সালকে ১০০ সূচব হিসাবে ধরে বর্তমান সময়ের সূচক পর্যালোচনা করা হলে নিম্নরূপ তথ্য বা বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

১. বিশ্ব খাদ্য সূচক (World Food indices) বেশি বেড়েছে এশিয়া মহাদেশে (১৩৫) এবং কমেছে ইউরোপে (৯৭)।

২. বর্তমানে বিশ্বে খাদ্য সূচক গড় ১১৭। ১৯৮৭ সালে তা ছিলো ৯৩।

৩. উত্তর আমেরিকায় ও এশিয়ায় খাদ্য সূচক বৃদ্ধির হার যথাক্রমে কম ও বেশি। যেমন–

উত্তর আমেরিকা :	১৯৮৭-৯৬ ১৯৯৮-১১৯	বৃদ্ধির হার ২৪%
এশিয়া :	১৯৮৭-৮৯ ১৯৯৮-১৩৫	বৃদ্ধির হার ৫২%
আফ্রিকা :	১৯৮৭-৮৯ ১৯৯৮-১২২	বৃদ্ধির হার ৩৭%
ইউরোপ :	১৯৮৭-৯৭ ১৯৮-৯৮	বৃদ্ধির হার <১%

৪. এশিয়া মহাদেশে খাদ্য সূচক বৃদ্ধির হার ইরান, জর্ডান, কুয়েত, চীন ও সিরিয়ায় সবচেয়ে বেশি (১৬০)।

৫. বাংলাদেশের বর্তমান খাদ্য উৎপাদন সূচক ১১২ (১৯৯০-২০০০)।

বিশ্ব খাদ্য সূচক তথ্য

	মহাদেশ						
সাল	আফ্রিকা	উঃ আমেরিকা	দঃ আমেরিকা	এশিয়া	ইউরোপ	ওসেনিয়া	বিশ্ব গড়
১৯৮৭	৮৮.৬	৯৫.৬	৯২.৩	৮৮.৯	৯৯.৬	৯৬.২	৯৩.৩
১৯৮৮	৯৩.৫	৯০.০	৯৭.০	৯৩.৪	৯৮.৮	১০০.৩	৯৪.৯
১৯৮৯	৯৭.২	৯৭.৭	৯৮.৯	৯৬.৪	১০০.৩	৯৮.৬	৯৮.৪
১৯৯০	৯৮.১	১০১.৪	৯৯.০	১০০.৯	৯৯.৮	১০০.৫	১০০.৮
১৯৯১	১০৪.৭	১০০.৯	১০২.২	১০২.৬	৯৯.৯	১০০.৮	১০০.৮
১৯৯২	১০২.৭	১০৮.০	১০৪.৭	১০৭.৮	৯৮.০	১০৭.৭	১০৩.৫
১৯৯৩	১০৬.৬	১০০.৬	১০৬.১	১১৩.৮	৯৫.৯	১১২.৪	১০৪.৪
১৯৯৪	১১০.২	১১৩.৩	১১২.১	১১৯.২	৯৩.৬	১০৬.৫	১০৭.৬
১৯৯৫	১১০.৮	১০৯.৭	১১৮.১	১২৫.০	৯৪.৫	১১৬.৭	১০৯.৯
১৯৯৬	১২২.৩	১১৩.৭	১২১.০	১২৯.৯	৯৭.৬	১২৬.১	১১৪.১
১৯৯৭	১১৯.৩	১১৬.৭	১২৬.২	১৩৪.৪	৯৭.৭	১২৭.৫	১১৬.৬
১৯৯৮	১২১.৫	১১৯.১	১২৮.২	১৩৫.৪	৯৭.৩	১৩০.৯	১১৭.০

এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি দেশের খাদ্য সূচক

(১৯৮৯-৯০=১০০)	গড়
আজারবাইজান, কাজাকাস্তান	৫০
বাংলাদেশ, সাইপ্রাস, ভুটান, শ্রীলংকা	১১০
কেম্বোডিয়া, কোরিয়া, মায়ানমার, লাওস, ইয়েমেন	১৩০
ফিলিপাইন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, নেপাল	১২০
ইরান, জর্ডান, কুয়েত, চীন, সিরিয়া	১৬০
ইরাক, ইসরাইল	১০০
জাপান, মালয়েশিয়া, সৌদীআরব	৯০
লেবানন, পাকিস্তান, ভিয়েতনাম	১৪৫

বাংলাদেশে খাদ্যসূচক

১৯৮৭	১০৮
১৯৮৮	৯৬
১৯৮৯	৯৭
১৯৯০	১০১
১৯৯১	১০২
১৯৯২	১০২
১৯৯৩	১০৩
১৯৯৪	১০০
১৯৯৫	১০৪
১৯৯৬	১১০
১৯৯৭	১১১
১৯৯৮	১১২

বিশ্বে ধান উৎপাদন তথ্য ও বৈশিষ্ট্য

১. জমি হিসাবে ভারতে ধানের চাষাবাদ সবচেয়ে বেশি, প্রায় ৪ কোটি হেক্টর।

২. ভারতের পরই রয়েছে চীন, জমির পরিমাণ প্রায় ৩ কোটি হেক্টর।

৩. মোট উৎপাদন হিসাবে চীনের উৎপাদন সবচেয়ে বেশি, প্রায় ১৯ কোটি টন।

৪. বাংলাদেশে ধানের জমির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি হেক্টর এবং মোট ফলন প্রায় ২.৮ কোটি টন।

৫. বিশ্বে ফলন বিবেচনায় অস্ট্রেলিয়ায় ধানের ফলন সবচেয়ে বেশি, প্রায় ১০ টন/হেক্টর।

৬. এরপরই রয়েছে মিশর ও ফ্রান্স; হেক্টর প্রতি ৮-৮.৫ টন।

৭. কানাডা, সুদান, নাইজেরিয়া ও কম্বোডিয়ায় ধানের হেক্টর প্রতি ফলন ৭৬০০-১৮০০ কেজি মাত্র।

৮. ধান উৎপাদনকারী অধিকাংশ দেশের হেক্টর প্রতি ফলন ৫ টনের চেয়ে বেশি।

৯. বুলগেরিয়া ও ফ্রান্সে ধানের চাষাধীন জমির পরিমাণ সবচেয়ে কম মাত্র ২০-২৬ হাজার হেক্টর অথচ ফলন ৫.৬-৮.০ টন/হেক্টর।

১০. যুক্তরাষ্ট্রে ধানের ফলন হেক্টর প্রতি ৬.৪ টন, জমির পরিমাণ প্রায় ১.৪ লক্ষ হেক্টর :

১১. মহাদেশীয়ভাবে ধানের উৎপাদন বাড়ছে, কমছে বা সমান থাকার বিষয় নিচে উল্লেখ করা হলো।

বাড়ছে	কমছে	প্রায় সমান রয়েছে
আফ্রিকা অসানিয়া	দক্ষিণ আমেরিকা	উত্তর আমেরিকা এশিয়া ইউরোপ

মহাবিশ্ব ধানের উৎপাদন তথ্য

মহাদেশ	সাল	জমি (লক্ষ হেক্টর)	ফলন (কেজি/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (লক্ষ টন)
আফ্রিকা	৮৯-৯১	৬৩	২০৩৪	১২৯
	৯৬	৭২	২১৬৮	১৫৭
	৯৭	৭৭	২২১১	১৭১
	৯৮	৭৯	২১৮৩	১৭৩
উঃ আমেরিকা	৮৯-৯১	১৮	৫১৮৬	৯৩
	৯৬	১৮	৫৫৭৭	৯১
	৯৭	১৯	৫৪৯৩	১০৫
	৯৮	২০	৫৩১৩	১০৭
দঃ আমেরিকা	৮৯-৯১	৫৮	২৫৬৬	১৫৪
	৯৬	৫৮	৩১৩৮	১৮৩
	৯৭	৫৬	৩২২২	১৭৯
	৯৮	৫১	৩১৮৯	১৬১
এশিয়া	৮৯-৯১	১৩২১	৩৫৯৬	৪৭৫২
	৯৬	১৩৪৭	৩৮৬৯	৫২১২
	৯৭	১৩৫৮	৩৯০৫	৫৩০৩
	৯৮	১৩৪৬	৩৮২৪	৫১৪৫

ইউরোপ	৮৯-৯১	৪.৩	৫৩২৩	২৩
	৯৬	৬.৪	৪৯৬৬	৩২
	৯৭	৬.১	৫১৭৪	৩২
	৯৮	৬.১	৫১৮৮	৩২
অসেনিয়া	৮৯-৯১	১.১	৭৯০২	৯
	৯৬	১.৫	৬৭৭১	১০
	৯৭	১.৭	৭৩৭১	১৩
	৯৮	১.৪	৯৭৫৫	১৪
বিশ্ব	৮৯-৯১	১৪৭৪	৩৫১৪	৫১৮১
	৯৬	১৫০৩	৩৭৮৬	৫৬৯২
	৯৭	১৫১৮	৩৮২৩	৫৮০২
	৯৮	১৫০৩	৩৭৪৭	৫৬৩২

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ধান উৎপাদন তথ্য (১৯৯৮)

দেশ	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (কেজি/ হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার/টন)
চীন	৩১৮৪৮	৬০৫৯	১৯২৯৭১
ভারত	৪২৩০০	২৮৯০	১২২২৪৪
ইন্দোনেশিয়া	১১৬১৩	৪১৭৪	৪৮৪৭২
থাইল্যান্ড	১০০০০	২৩২৪	২৩২৪০
ভিয়েতনাম	৭৩৬২	৩৯৫৮	২৯১৪২
বাংলাদেশ	১০২৬৩	২৭৫৭	২৮২৯৩
ব্রাজিল	৩০৭২	২৫৩৭	৭৭৯৬
নাইজেরিয়া	২০৪৮	১৫৯৬	৩২৬৮
কম্বোডিয়া	১৯৬১	১৭৯২	৩৫১৫
মায়ানমার	৫৪০৮	৩০৭৯	১৬৬৫১
পাকিস্তান	২৩৩০	২৮২৭	৬৫৮৭
ফিলিপাইন	৩১৭০	২৭০০	৮৫৫৫
ফ্রান্স	২৬	৮০৫৪	২০৯
স্পেন	১১৩	৬৬৬৭	৭৫৫
অস্ট্রেলিয়া	১৩০	১০২৬৯	১৩৩৫
বুলগেরিয়া	২০	৫৬৫০	১১৩
ইটালি	২৪০	৫৮৩৩	১৪০০
পর্তুগাল	২৯	৫৭৫৯	১৬৭
কোরিয়া	১০৪৫	৬৯৯৭	৭৩১২

জাপান	১৮০১	৬২১৯	১১২০০
তুরস্ক	৬০	৫২৮৩	৩১৭
মিশর	৬৫৫	৮৫২৭	৫৫৮৫
যুক্তরাষ্ট্র	১৩৪২	৬৩৫৪	৮৫৩০
উরুগুয়ে	১৩০	৬৬৫৪	৮৬৫
কানাডা	৫০০	৬৮০	৩৪০
সুদান	৪	৬২৫	৩

ভুট্টা উৎপাদন বৈশিষ্ট্য

১. বিশ্ব ভুট্টা উৎপাদন জমি ১৩.৭ কোটি হেক্টর।
২. বিশ্বে ভুট্টা উৎপাদন জমি মোটামুটি স্থবির রয়েছে।
৩. সবচেয়ে বেশি জমি উত্তর আমেরিকা, প্রায় ৪.০ কোটি হেক্টর।
৪. সবচেয়ে কম ওসেনিয়ায়, ৮৩ হাজার হেক্টর।
৫. দেশের ভুট্টা জমি বেশি যুক্তরাষ্ট্রে, ২.৯ কোটি হেক্টর; দ্বিতীয় চীন ২.৪ কোটি হেক্টর।
৬. ফলন বেশি ইটালি ও অস্ট্রেলিয়ায়, ৯ থেকে ৯.৫ টন/হেক্টর।
৭. যুক্তরাষ্ট্রে ভুট্টা উৎপাদন প্রায় ২৫ কোটি টন।

মহাদেশীয় ভুট্টা উৎপাদন তথ্য

মহাদেশ	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)			
	১৯৮৯--৯১	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
আফ্রিকা	২৪৯৬৭	২৫১৯০	২৬২৩৮	২৪৮৯৮
উঃ আমেরিকা	৩৭০১৫	৪০৭৭২	৪০৩১০	৩৯৯৮৯
দঃ আমেরিকা	১৬৯২৬	১৮৭৬২	১৯৮৫২	১৬৬১৩
এশিয়া	৩৯৪০০	৪২৯০৪	৪২১৮৪	৪২৭৭৩
ইউরোপ	১০৬৯৬	১৩০৩৬	১৪১৪৬	১৩০৭৫
ওসেনিয়া	৭১	৭৮	৯০	৮৩
বিশ্ব	১৩২৩৮৬	১৪০৭৪৩	১৪২৮১৮	১৩৭৪৩০

বিভিন্ন দেশে ভুট্টা উৎপাদন (১৯৯৮)

দেশ	জমির পরিমাণ হাজার/হেক্টর	ফলন (কেজি/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
ব্রাজিল	১০৫৯৯	২৭৬৪	২৯২৯৭
যুক্তরাষ্ট্র	২৯৩৮২	৮৪৩৯	২৪৭৯৪৩
নিকারাগুয়া	৭৫০০	২৪৫৫	১৮৪১১
নাইজেরিয়া	৪২৫৫	১৩৭৭	৫৮৫৮

চীন	২৪০৭০	৫২১০	১২৫৩৯৫
ভারত	৬২০০	১৬১৩	১০০০০
রুমানিয়া	৩০৮৫	২৭৯৫	৮৬২৩
ফিলিপাইন	২৩৫৪	১৬২৪	৩৮২৩
ইন্দোনেশিয়া	৩৮৩৪	২৬২৪	১০০৫৯
আর্জেন্টিনা	৩১৮৭	৫৯৯৬	১৯১০০
তাঞ্জানিয়া	২০২৮	১৩৫৬	২৭৫০
দক্ষিণ আফ্রিকা	৩৫২১	২১৫১	৭৫৭৪
কেনিয়া	১৫১০	১৬২৩	২৪৫০
বাংলাদেশ	৩	১০৪৪	৩
মিশর	৭১০	৭৫০৭	৫৩৩০
চিলি	১০০	৯৪০১	৯৪৩
কুয়েত		১৭৬২৩	২
অস্ট্রিয়া	১৭১	৯১৮৬	১৫৭৩
নিউজিল্যান্ড	১৮	৯৭৭৮	১৭৬
স্পেন	৪৬৯	৮৮৬৩	৪১৫৪
গ্রীস	২১৪	৮৪৯১	১৮১৬
ফ্রান্স	১৭৭০	৮১৫০	১৪৪২৬
জার্মানি	৩৪১	৮১৫৬	২৭৮১
ইটালি	৯৬৯	৯৩২২	৯০৩১
বিশ্ব	১৩৭৪৩০	৪৩৯৫	৬০৪০১৩

বিভিন্ন দেশে সরগম উৎপাদন তথ্য (১৯৯৮)

দেশ	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (কেজি/ হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
ভারত	১১২০০	৮০৪	৯০০০
চীন	১৩১৩	৪৩৯১	৫৭৬৭
নাইজেরিয়া	৬৮০৮	১১০৪	৭৫১৬
সুদান	৬৪০৫	৭৬৪	৪৮৯১
নাইজার	১৪০০	৩০৭	৪৩০
বারকিনা ফাসো	১৩৮৬	৬৮০	৯৪৩
কেমেরুন	৬০০	৮৩৩	৫০০
চাদ	৮৫৩	৭৪৬	৬৩৭

মাননীয় সচিব
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।

বিষয়ঃ ০১ (এক) দিনের নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন।

মহোদয়,

যথাযথ সম্মানপূর্বক নিবেদন এই যে, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমার আগামী ০৬/০২/২০১৮ তারিখ ০১ (এক) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি প্রয়োজন।

অতএব, প্রার্থিত ০১ (এক) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি মুঞ্জুর করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি।

তারিখঃ ০৫/০২/২০১৮ খ্রিঃ

আপনার একান্ত

০৪/০২/১৮

(জেসমীন আক্তার)
মহাপরিচালক(অতিঃ সচিব)
ব্যান্সডক, আগারগাঁও, ঢাকা।

ছুটিকালীন ঠিকানাঃ
বাড়ি নং-৪৮
রোড নং-১৯
সেক্টর-১৪
উত্তর মডেল টাউন, ঢাকা

যুগোস্লাভিয়া	১১	৪৮২৬	৫৩
মিশর	১৫৬	৪৯৩৬	৭৭০
ফ্রান্স	৬৫	৬১০৮	৩৯৭
মালে	৫৪১	৯৯৯	৫৪০
ক্রোয়েসিয়া	-	৪০৮০	১
দঃ আফ্রিকা	১৫৯	২০০৪	৩১৯
ডোমিনিকান	৯	২৫৫৩	২২
ইটালি	৩০	৫৫৫৮	১৬৮
মেক্সিকো	২০০০	৩১৯৩	৬৩৮৬
যুক্তরাষ্ট্র	৩১২৫	৪২২৬	১৩২০৭
আর্জেন্টিনা	৭৮৫	৪৭৩৯	৩৭২০
ইসরায়েল		১২৫০০	১
ওমান	১	৩০০০	৩
ইরাক		৭৬৪৭	১
উরুগুয়ে	২৯	৩৩৫৯	৯৭
বিশ্ব	৪৪৪৪২	১৪২৮	৬৩৪৫১

মহাদেশীয় সরগম উৎপাদন তথ্য

মহাদেশ	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)			
	১৯৮৯-৯১	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
আফ্রিকা	১৮২৩২	২৩৭২১	২২৪৩৮	২২৯৭১
উঃ আমেরিকা	৬১০৯	৭৪২২	৬১০৮	৫৫৭৩
দঃ আমেরিকা	১৪১৫	১১৯১	১৩৩০	১৪৭৮
এশিয়া	১৬৬২১	১৪১৬৬	১৩৫৫৮	১৩৬৬৮
ইউরোপ	১৬৩	১৫৩	১৫৭	১৬৩
ওসেনিয়া	৪৬১	৭৭১	৫৪৫	৫৭০
বিশ্ব	৪৩১১৩	৪৭৪২৪	৪৪১৩৬	৪৪৪৪২

সরগম উৎপাদন তথ্য ও বৈশিষ্ট্য

১. বিশ্ব সরগম জমি : ৪.৫ কোটি হেক্টর।

২. সর্বোচ্চ জমির মহাদেশ আফ্রিকা : ১.৮ কোটি হেক্টর।
দ্বিতীয় : এশিয়া ১.৭ কোটি হেক্টর।

৩. কম জমি : ইউরোপে, ১.৬ লক্ষ হেক্টর।
৪. উৎপাদন ধারা : জমির পরিমাণ প্রায় স্থবির।
৫. দেশ হিসেবে জমি : বেশি, ভারত ১.১ কোটি হেক্টর
দ্বিতীয় : সুদান, নাইজেরিয়া ৬৪ থেকে ৬৮ লক্ষ হেক্টর।
৬. ফলন বেশি : ইসরায়েলে, ১২.৫ টন/হেক্টর।
ইরাক ৭.৬ টন/হেক্টর।
মিশর, আর্জেন্টিনা ৪.৮ থেকে ৫.০ টন/হেক্টর।
কম : নাইজার, ভারত, ৩০০ থেকে ৮০০ কেজি/হেক্টর
৭. মোট উৎপাদন বেশি যুক্তরাষ্ট্রে, অর্থাৎ প্রায় ১.৩ কোটি টন।

বিশ্বে বার্লি উৎপাদন তথ্য ও বৈশিষ্ট্য

১. সারা বিশ্ব বিবেচনায় প্রায় ১৬ কোটি হেক্টর জমিতে বার্লির চাষ হয়।
২. বার্লি চাষাধীন জমি সবচেয়ে বেশি ইউরোপে, ৩ কোটি হেক্টরের বেশি।
সবচেয়ে কম দঃ আমেরিকা ৭-৮ লক্ষ হেক্টর।
৩. বর্তমানে উঃ আমেরিকায় বার্লির চাষাধীন জমির পরিমাণ কমছে। এশিয়ার প্রায় সমান আছে এবং ইউরোপে বাড়ছে।

মহাদেশীয় বার্লি উৎপাদন তথ্য

মহাদেশ	জমির পরিমাণ (হাজার হেক্টর)			
	১৯৮৯-৯১	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮
আফ্রিকা	৫৪৭৬	৫৯০০	৩৯৩৫	৫০৫৭
উঃ আমেরিকা	৮০১১	৭৯১১	৭৫৪৫	৬৮৮৮
দঃ আমেরিকা	৬৮৯	৮০০	৮৬৪	৭৮২
এশিয়া	১৩২৯৯	১৬৩৪৪	১৪৯৪৩	১৩৬৮৪
ইউরোপ	১৭৫৪৯	৩২০৩২	৩৩৮৯৩	৩২২৫২
ওসেনিয়া	২৫৫৯	৩৪৪২	৩৫৫০	৩০৩৭
বিশ্ব	৭৪৫৩৭	৬৬৪২৯	৬৪৭৩০	৬১৬৯৯

বার্লি উৎপাদনের দেশভিত্তিক তথ্য ও বৈশিষ্ট্য

১. জমি বেশি— রাশিয়ায় ১ কোটি হেক্টরের উপরে।
দ্বিতীয় স্থান— কানাডা প্রায় ৪৩ লক্ষ হেক্টর।
২. বাংলাদেশে মাত্র ৯ হাজার হেক্টর।
৩. হেক্টর প্রতি ফলন সবচেয়ে বেশি— সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সে ৬.৬ টন
সবচেয়ে কম— বাংলাদেশ ৬৫২ কেজি।

৪. বার্লি উৎপাদনের বিশ্ব গড়– ২২৫০ কেজি/ হেক্টর।

৫. মোট উৎপাদন– সবচেয়ে বেশি রাশিয়ায়, প্রায় ২ কোটি টন। তারপর ফ্রান্স ও জার্মানি, ১.০ থেকে ১.২ কোটি টন।

বিভিন্ন দেশে বার্লি উৎপাদন (১৯৯৮)

দেশ	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (কেজি/ হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
রাশিয়া	১২৫১৭	১৬৬১	২০৭৮৬ (৯৭)
কানাডা	৪২৬৯	২৯৭৪	১২৬৯৬
স্পেন	৩৫২৬	৩০৯২	১০৯০২
ইউক্রেন	৩৫৬২	১৬৪৮	৫৮৭০
অস্ট্রেলিয়া	২৯৬৪	১৮২০	৫৩৯৫
জার্মানি	২১৮১	৫৭৪০	১২৫১৭
ফ্রান্স	১৬২৪	৬৫০৮	১০৫৬৯
মরক্কো	২৪২৬	৮১২	১৯৭০
যুক্তরাষ্ট্র	২৩৭৪	৩২৩২	৭৬৭৪
চীন	১৬০০	২৭৫০	৪৪০০
যুক্তরাজ্য	১২৬২	৫১৮২	৬৫৩৭
বাংলাদেশ	৯	৬৫২	৬
চিলি	২৭	৪৩৩১	১১৫
নিউজিল্যান্ড	৭৩	৪৬৯০	৩৪০
কোরিয়া	১০৫	৩৯০৫	৪১০
কুয়েত	-	৩৪৬২	১
সৌদী আরব	৬৩	৬৩৪৯	৪০০
বসনিয়া হার্জিগোভিন	৬৭	৬১৬২	৪১১
ডেনমার্ক	৬৭৭	৫২১৩	৩৫২৯
আয়ারল্যান্ড	১৯১	৫৬২৭	১০৭৩
নেদারল্যান্ড	৪২	৬২৬২	২৬৩
সুইজারল্যান্ড	৪৯	৬৬১৯	৩২৭
বিশ্ব	৬১৬৯৯	২২৫০	১৩৮৮২০

বিশ্বে গম উৎপাদন তথ্য ও বৈশিষ্ট্য

১. বিশ্বে গমের জমি প্রায় ২২.৫ কোটি হেক্টর।

২. বিশ্ব উৎপাদন ৫৯ কোটি টন।

৩. মহাদেশ হিসেবে দক্ষিণ আমেরিকায় ৭.২ কোটি হেক্টর।

৪. ফলন বেশি ইউরোপে, ৩০৬১ কেজি/হেক্টর।
৫. ফলন সবচেয়ে কম আফ্রিকায়, ১৮৩৬ কেজি/হেক্টর।
৬. দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি চীনে, ৩ কোটি/হেক্টর
দ্বিতীয় ভারত ও রাশিয়ায়, ২.৫ কোটি/হেক্টর।
৭. ফলন সবচেয়ে বেশি বসনিয়া হার্জেগোভিনায়, ৮ টন/হেক্টর।
দ্বিতীয়, ইউক্রেন ৭.৬ টন/হেক্টর।
৮. ফলন সবচেয়ে কম সোমালিয়া ও কাজাকস্তানে, ৪০০ থেকে ৫০০ কেজি/হেক্টর।
রাশিয়া, ১০২৯ কেজি/হেক্টর।
৯. গমের মোট উৎপাদন বেশি– চীনে, ১১ কোটি টন।
১০. বাংলাদেশে গম চাষযোগ্য জমি প্রায় ১০ লক্ষ হেক্টর।
১১. বাংলাদেশে গমের ফলন ২৩৬০ কেজি/হেক্টর।

মহাদেশীয় গম উৎপাদন (১৯৯৮)

মহাদেশ	জমি (লক্ষ হেক্টর)	ফলন (কেজি/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (লক্ষ টন)
আফ্রিকা	১০০	১৮৩৬	১৮৩
উঃ আমেরিকা	৩৫৪	২৭৪০	৯৭১
দঃ আমেরিকা	৭১৮৭	২০৯০	১৫০
এশিয়া	১০০৫	২৫২০	২৫৩২
ইউরোপ	৫৯৮	৩০৬১	১৮২২
ওসেনিয়া	১১৫	১৯২২	২২১
বিশ্ব	২২৪৪	২৬২৪	৫৮৮৮

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গম উৎপাদন (১৯৯৮)

দেশ	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (কেজি/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
যুক্তরাষ্ট্র	২৩৮৭৮	২৯০৭	৬৯৪১০
চীন	৩০০০০	৩৬৬৭	১১০০০০
কানাডা	১০৭৬৮	২২৬৬	২৪৪০০
ভারত	২৫৬০০	২৫৭৮	৬৬০০০
রাশিয়া	২৬১৫১	১০২৯	২৬৯০০
অস্ট্রেলিয়া	১১৪৬০	১৯০৭	২১৮৫৫
নিউজিল্যান্ড	৫১	৫১৯৬	২৬৫
তুরস্ক	৯৪০০	২২৩৪	২১০০০
পাকিস্তান	৮৩৫৫	২২৩৮	১৮৬৯৪

আর্জেন্টিনা	৪৬০০	২১৭৪	১০০০০
ইরান	৭০০০	১৭১৪	১২০০০
কাজাকস্তান	৯১১০	৫২১	৪৭৪৬
যুক্তরাজ্য	৯৬	৬৪৫২	৬১৬
মিশর	১০১৭	৫৯৯০	৬০৯৩
ফ্রান্স	৫২৪৩	৭৬০৩	৩৯৮৬২
জিম্বাবুই	৫২	৫৩৮৫	২৮০
জার্মানি	২৮০২	৭২০৩	২০১৮৭
মেক্সিকো	৭৭২	৪১৯৭	৩২৪১
চিলি	৩৮৪	৩৬৪৯	১৪০০
আয়ারল্যান্ড	৮৪	৮০৩১	৬৭৩
জাপান	১৬২	৩৫১১	৫৭০
কোরিয়া	২	৪০৪৪	৭
নেদারল্যান্ড	১৪১	৭৩৭৬	১০৪০
অস্ট্রিয়া	২৬৪	৫০৭৫	১৩৪২
সুইডেন	৪০৫	৫৬৪৮	২২৮৭
বসনিয়া হার্জিগোভিনা	২২২	৮১১৯	১৮০৩
সুইজারল্যান্ড	৯৬	৬৪৫২	৬১৬
চেকোস্লোভাকিয়া	২৪২	৪২২০	১০২০
চেক	৮৬২	৪৫৬১	৩৯৩১
ডেনমার্ক	৬৭৮	৭২৭৬	৪৯৩৩
ইউক্রেন	২০৪৪	৭৫৫৮	১৫৪৪৯

বাংলাদেশে গম উৎপাদন

সাল	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (কেজি/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
১৯৮৯-৯১	৫৮৪	১৬৬৮	৯৭২
১৯৯৬	৭০১	১৯৫৩	১৩৬৯
১৯৯৭	৭০৮	২০৫৪	১৪৫৪
১৯৯৮	৮০৫	২২৪০	১৪০৩
১৯৯৯	৯৮০	২৩৬০	২৩০

গমের ফলন সবচেয়ে কম (কেজি/হেক্টর)

আলজেরিয়া	৮৮৭ (২৫৭১ হাজার হেক্টর)
বুরুন্ডি	৮১৫
কঙ্গো	৯৪১
ইরিত্রিয়া	৭০৬
সিরিয়া	৭০০
সোমালিয়া	৩৭০
হন্ডুরাস	৬৪৩
ইকুয়েডর	৬০০
ভেনিজুয়েলা	৪০০
ভুটান	৭১৪
ইরাক	৭৫৯ (১৪৫০ হাজার হেক্টর)
কাজাকস্তান	৫২১ (৯১১০ হাজার হেক্টর)
মঙ্গোলিয়া	৬৩৭ (৩০১ হাজার হেক্টর)
থাইল্যান্ড	৬৮২
বলিভিয়া	৮৭৫

BANSDOC Library Dhaka

বিশ্বে রাই উৎপাদন তথ্য ও বৈশিষ্ট্য

১. সারা বিশ্বে প্রায় ১ কোটি হেক্টর জমিতে রাই চাষ করা হয়।

২. বিশ্বে রাই চাষের অধীন জমি ও উৎপাদন কমছে।

৩. রাইয়ের বিশ্ব উৎপাদন প্রায় ২.১ কোটি টন।

৪. রাই উৎপাদন জমি বেশি রাশিয়ায়, ৪০ লক্ষ হেক্টর;
দ্বিতীয় পোলান্ডে, ২৩ লক্ষ হেক্টর।

৫. হেক্টর প্রতি ফলন বেশি যুক্তরাষ্ট্রে ৬ কেজি/হেক্টর
দ্বিতীয় নেদারল্যান্ড– জার্মানি ০.৫ থেকে ১.৫ টন/হেক্টর।
কম– রাশিয়া, বেনলাক্স ১.৬ থেকে ১.৭ টন/হেক্টর।

বিশ্বে রাই উৎপাদন তথ্য

সাল	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (কেজি/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
১৯৮৯-৯১	১৫৭৯৮	২১২৭	৩৩৬৩৯
১৯৯৬	১১০০৫	২০৬৬	২২৯৪৪
১৯৯৭	১০৯২৪	২২৮১	২৪৯২০
১৯৯৮	১০৮১০	১৯৪১	২০৯৭৭

বিভিন্ন দেশে রাই উৎপাদন (১৯৯৮)

দেশ	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (কেজি/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
কাজাকস্তান	৫০০	১৬০০	৮০০
বেনলাক্স	৮০০	১৭১৩	১৩৭০
জার্মানি	৯২৬	৫১৫৪	৪৭৭৫
পোল্যান্ড	২২৯১	২৪৭২	৫৬৬৪
রাশিয়া	৪০০৫	১৮৬৭	৭৪৭৮
ইউক্রেন	৭০০	১৬২৩	১১৩৬
অস্ট্রিয়া	৫৯	৩৯৮৮	২৩৬
ডেনমার্ক	১০৩	৫১২৬	৫২৮
ফ্রান্স	৪৬	৪৬৯৬	২১৬
নেদারল্যান্ড	৫	৫৪০০	২৭
যুক্তরাজ্য	৩	৬০৮৮	২১
বেলারাম	৫৯	৩৯৮৮	২৩৬
বসনিয়া হার্জেগোভিনা	৩	৩৮৪৬	১০
নরওয়ে	৪	৪০০০	১৬
বিশ্ব	১০৮১০	১৯৪১	২০৯৭৭

বিশ্বের ওট উৎপাদন তথ্য ও বৈশিষ্ট্য

১. বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ১.৪ কোটি হেক্টর জমিতে ওটের চাষ হয়।

২. গড় ফল, প্রতি হেক্টরে ১৭৭০ কেজি (১৯৯৮)।

৩. সর্বোচ্চ পরিমাণ জমির দেশ রাশিয়া, ৬৫ লক্ষ হেক্টর।
দ্বিতীয় কানাডা, ১৬ লক্ষ হেক্টর।

৪. সর্বোচ্চ ফলন আয়ারল্যান্ড ৬ টন/হেক্টর।
দ্বিতীয় যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড, ৫.৫ থেকে ৫.৮ টন/হেক্টর।
কম রাশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া, ১.৪ থেকে ১.৬ টন/হেক্টর।

৫. বিশ্বে ওট চাষাধীন জমির পরিমাণ কমছে।

বিশ্বে ওট উৎপাদন তথ্য (১৯৯৮)

সাল	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (কেজি/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
১৯৮৯-৯১	২০৯৪২	১৭৯৭	৩৭৬৬৩
১৯৯৬	১৬৮১০	১৮৪১	৩০৯৪০
১৯৯৭	১৬২৭৫	১৯৫৬	৩১৮৩৪
১৯৯৮	১৪৫৮০	১৭৭০	২৫৮০২

বিভিন্ন দেশে ওট উৎপাদন তথ্য (১৯৯৮)

দেশ	জমি (হাজার হেক্টর)	ফলন (কেজি/হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)
কানাডা	১৫৯২	২৪৮৫	৩৯৫৫
রাশিয়া	৬৫১০	১৪৪২	৯৩৮৭
অস্ট্রেলিয়া	৭৯৫	১৫৭৫	১২৫২
যুক্তরাষ্ট্র	১১১৯	২১৬৮	২৪২৬
পোল্যান্ড	৫৬১	২৬০১	১৪৬০
ইউক্রেন	৫৫০	১৩৪৯	৭৪১
যুক্তরাজ্য	১০০	৫৮৬২	৫৮৮
সুইজারল্যান্ড	৭	৫৫০৭	৩৮
নিউজিল্যান্ড	১২	৪২৬৬	৪৯
অস্ট্রিয়া	৪১	৫০১১	২০৩
বেললাক্স	১১	৪৫৪৫	৫০
ডেনমার্ক	২৬	৫৭৬৯	১৫০
আয়ারল্যান্ড	১৯	৬১৩৪	১১৯
নেদারল্যান্ড	২	৫৫০০	১১
জার্মানি	২৬৪	৪৮৪৩	১২৭৯
ফ্রান্স	১৩৬	৪৬৫৪	৬৩৩

৩। **দানা খাদ্য ফসল**

যেসব ফসল চাষ করে মানুষ ও পশু-পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহারযোগ্য দানা খাদ্য পাওয়া যায়, সেগুলোকে দানা খাদ্য ফসল বলে। ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি দানা খাদ্য (চএরএঅল গরঅইনস) হিসেবে পরিচিত। অধিকাংশ দানাখাদ্য মাঠ ফসলের (হৈএলড চরওপস) অন্তর্ভুক্ত। মাঠ ফসলের অন্যান্য প্রকারের মধ্যে রয়েছে আঁশ ফসল (পাট, তুলা), চিনি ফসল (আখ, সুগারবিট), ডাল ফসল (মুগ, মশুর), তেলবীজ ফসল (সরিষা, সয়াবিন) ইত্যাদি।

দানা খাদ্য ফসলের মধ্যে বাংলাদেশে ধান অন্যতম ফসল। বাংলাদেশের মাঠ ফসলের মধ্যে প্রায় ৮০% জমিতে ধানের চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে দানা খাদ্য ফসল হিসেবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে গম ও ভুট্টা। চতুর্থ স্থানে রয়েছে মিলেট বা চীনা ও কাউন।

আমাদের দেশে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে এসব ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর প্রচুর সুযোগ রয়েছে। মাঠ ফসল চাষের অধ্যায়সমূহে বিভিন্ন দানা ফসলের বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন দানা ফসলের পরিচিতি বর্ণনা করা হলো।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দানা ফসল ধান সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ধান চাষের উন্নত প্রযুক্তিসমূহের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে ও ধান চাষের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

৪। বাংলাদেশের দানা খাদ্য ফসল

বাংলাদেশের অধিকাংশ দানা ফসল উদ্ভিদতাত্ত্বিকভাবে Graminae বা Poaceae গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। মাঠে ব্যাপকহারে চাষযোগ্য ফসলের মধ্যে বিশেষ করে বাংলাদেশে দানা ফসলের গুরুত্ব খুবই বেশি। বাংলাদেশে মোট চাষকৃত জমির (Total cropped area) মোট ফসলের মধ্যে শতকরা প্রায় ৯০ ভাগই দানা খাদ্য ফসলের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দানা খাদ্য ফসল হচ্ছে :

১।	ধান (Rice)	*Oryza sativa*
২।	গম (Wheat)	*Triticum aestivum* (spp.)
৩।	ভুট্টা (Maize)	*Zea mays*
৪।	চীনা (Prosso or common millet)	*Panicum milliaceum*
৫।	কাউন (Foxtail millet)	*Setaria italica*
৬।	ফিংগার মিলেট (Finger millert)	*Eleusine coracana*
৭।	বাজরা বা বুলরাশ মিলেট (Bulrush/Pearl millet)	*Pennisetum typhoideum*
৮।	ক্ষুদে মিলেট (Little millet)	*Panicum miliare*
৯।	জাপানিজ মিলেট (Japanese millet)	*Echinochloa frumentacea*
১০।	যব বা যই (Oat)	*Avena fatua (sativa)*
১১।	জোয়ার বা সরগম (Sorghum)	*Sorghum vulgare*
১২।	বার্লি (Barley)	*Hordeum vulgare (H. distiction)*
১৩।	রাই (Rye)	*Secale cereale*

বাংলাদেশে দানা খাদ্য ফসলের জমির পরিমাণ ও উৎপাদন (BBS '৯২–৯৫)

ফসলের নাম	জমির পরিমাণ(হাজার হেক্টর)	উৎপাদন (হাজার মে. টন)
ধান	৯০০০	১৮৫০০
গম	৪৩০	১১৭৬
বার্লি বা যব	১২	৮
ভুট্টা	৫	৫.৮
চীনা	১৮	১৫
জোয়ার বা সরগম	০.৪০	০.৪০
বাজরা	০.৪০	০.৪০
অন্যান্য	৬৪	৪৬

৫। দানা ফসলের বিবরণ

নিচে বিভিন্ন ধরনের দানা ফসলের সাধারণ পরিচিতি উপস্থাপন করা হলো। পরবর্তী অধ্যায়ে এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ধান

ধান সারা বিশ্বের দ্বিতীয় প্রধান দানা শস্য। নিচু থেকে উঁচু সকল জমিতে ধান জন্মে। ধানের

পারে। এ গাছের কাণ্ড নরম, পাতা ফলক ও খোলে বিভক্ত, শিকড় গুচ্ছমূল ধরনের। এশিয়ায় ধানের ১৮টি জাত রয়েছে। গাছের পত্রফলকের গোড়ায় অরিকল রয়েছে।

ধানের ক্রোমোজোম সংখ্যা 2n = 28

ফল-কেরিওপসিস (caryopsis) ধরনের।

ধান থেকে চাল হয়। চাল প্রধানত শ্বেতসার (starch) দিয়ে গঠিত।

ধানে সাধারণত ১৭টি এমাইনো এসিড রয়েছে।

BANSDOC Library Dhaka

ধানে অত্যাবশ্যক এমাইনো এসিডের পরিমাণ (গ্রাম/১০০ গ্রাম আমিষ)

নাম	দ্রব্য		
	চাল	গম	গরুর দুধ
আইসোলিউসিন	৫.১	৪.২	৬.৪
লিউসিন	৯.০	৬.৯	৯,৯
লাইসিন	৩.২	১.৬	৭.৮
ফিনাইল্ এলানিন	৬.৩	৪.৯	৪.৯
মেথিওনিন	৩.৪	১.৭	২.৪
থায়ামিন	৩.০	২.৪	৪.৫
ট্রিপ্টোফ্যান	১.৩	১.০	১.৪
ভ্যালিন	৫.৪	৪.৩	৬.৯

উল্লেখ্য যে, কতকগুলো দেশীয় জাতের মধ্যে উল্লিখিত এমাইনো এসিডের পরিমাণ আরও বেশি।

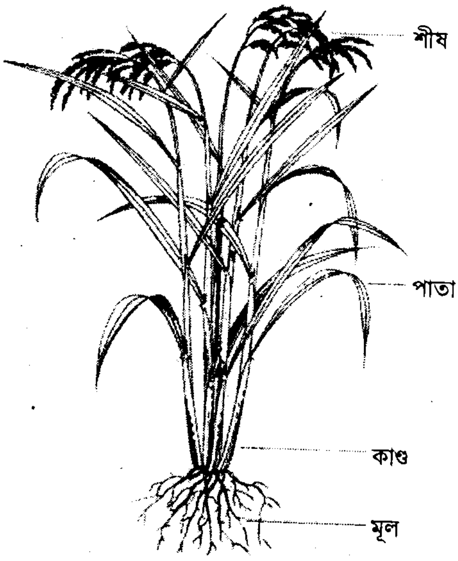

চিত্র ১.১ : ধান গাছ

গম

গমের অন্তত ৪টি প্রজাতি রয়েছে। যথা—
Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum dicoccum এবং *Triticum sphaerococcum.*

চিত্র ১.২ : গম গাছ

এটি শীতপ্রধান দেশের বা শীতপ্রধান মৌসুমের ফসল। *Triticum aestivum* প্রজাতির গম থেকে রুটি তৈরি করা হয়।

ভুট্টা (Maize or Corn)

ভুট্টা মূলত আমেরিকার ফসল। সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজদের মাধ্যমে ভুট্টা ভারতবর্ষে আসে। দানা খাদ্য ফসলের মধ্যে ভুট্টার ফলন সবচেয়ে বেশি। ভুট্টার দানা, পাতা ও নরম কাণ্ড সবই পশু-পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভুট্টার দানা ও তেল মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র ১.৩ : ভুট্টা গাছ

বার্লি

বার্লি অপেক্ষকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ দানা ফসল। তবে বাংলাদেশে এর চাষাবাদ কম। বার্লি দানা থেকে ছাতু তৈরি হয়। বার্লির অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে রয়েছে *Hordium disticum*

গম ও বার্লি গাছের মধ্যে পার্থক্য

গম	বার্লি
১. গাছ গাঢ় সবুজ, দৃঢ়	১. গাছ হালকা সবুজ, কিছুটা নরম
২. কুশির সংখ্যা ৩ থেকে ৫টি	২. কুশির সংখ্যা ১৫ থেকে ৩০টি
৩. অণুমঞ্জরী ১টি	৩. অণুমঞ্জরী ৩টি
৪. শুঙ খাটো	৪. শুঙ লম্বা

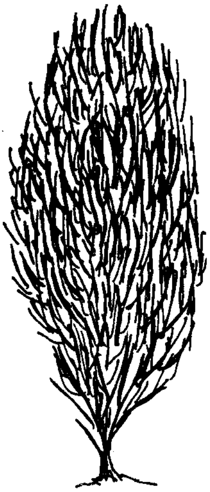

চিত্র ১.৪ : বার্লি গাছ

যই বা ওট এবং সরগম

সরগমের বৈজ্ঞানিক নাম *Sorghum vulgare*, সরগমের অপর নাম জোয়ার (Jowet)। যই বা ওট *(Avena fatua)* ও সরগম মানুষ ও পশু–পাখির খাদ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। শীষের ধরন অনুসারে সরগম আঁটো শীষ ও ঢিলা শীষ সম্পন্ন হতে পারে। সরগমের অন্যান্য প্রজাতির মধ্যে রয়েছে *Sorghum cemum, Sorghum dehra*। বাংলাদেশে চাষকৃত *vulgare* কে *bicolor*-ও বলা হয়।

ক্রোমোজোম : সরগমের ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n$ = ১০
শিকড় : গভীরমূলী ও বিস্তৃত
ফল : কেরিওপিসস
বর্ণ : সাদা–কালো বা লালচে হতে পারে।

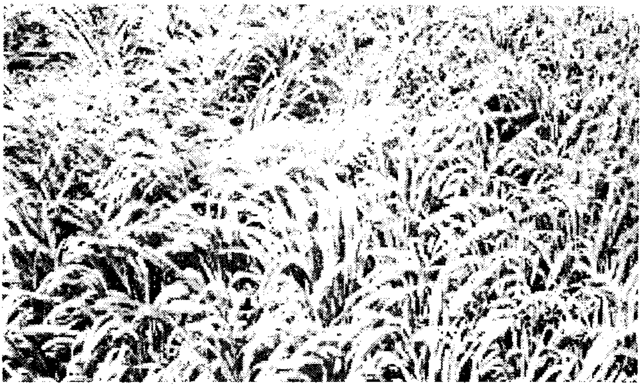

চিত্র ১.৫ : ওট গাছ

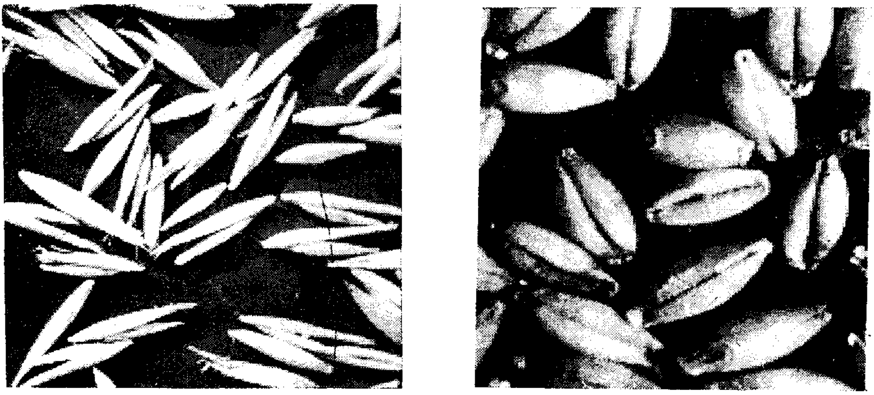

চিত্র ১.৬ : ওট ও বার্লি বীজ

চীনা

চীনার বৈজ্ঞানিক নাম *Panicum milliaceum*. চীনার অন্যান্য জাতের মধ্যে *Panicum maximum* গরু ঘাস উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই ঘাস প্রচলিতভাবে গিনি ঘাস (Guinea grass) নামে পরিচিত।

বাংলাদেশে প্রাচীনকাল থেকে চীনার চাষ হয়ে আসছে। পাবনা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, ফরিদপুর জেলাসমূহে চীনার চাষ বেশি হয়।

চীনার ক্রোমোজোম সংখ্যা : 2n = ১৮, ৩৮

গাছের উচ্চতা : ৩০ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার

ফল : কেরিওপসিস

বীজের বর্ণ : হালকা বাদামি, মসৃণ।

বাজরা বা বুলরাশ

বাজরার বৈজ্ঞানিক নাম *Pennisetum typhoides*. এটি অপেক্ষাকৃত কম চাষযোগ্য ফসল।

কাউন বা ইটালিয়ান মিলেট

এর বৈজ্ঞানিক নাম *Setaria italica.* এ ফসলের জীবনকাল ৯০ থেকে ১১০ দিন। নিরক্ষীয় ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ভালো ফসল জন্মে।

ক্রোমোজোম সংখ্যা : 2n = ১৪

অন্য প্রজাতির নাম : *S. sphacelata.*

এটি মূলত খড় ও সেজের জন্য চাষ করা হয়।

ফল : কেরিওপসিস

শীষ : শিয়ালের লেজের মতো।

শীষ ও বীজের রঙ : হলদে, কমলা–লাল, বাদামি ও কালো হতে পারে।

ক্ষুদে মিলেট

এর বৈজ্ঞানিক নাম *Panicum miliare.* এটি খরা প্রতিরোধী ফসল, কিন্তু জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। এই ফসলের জীবনকাল ৮০ থেকে ৮৫ দিন।

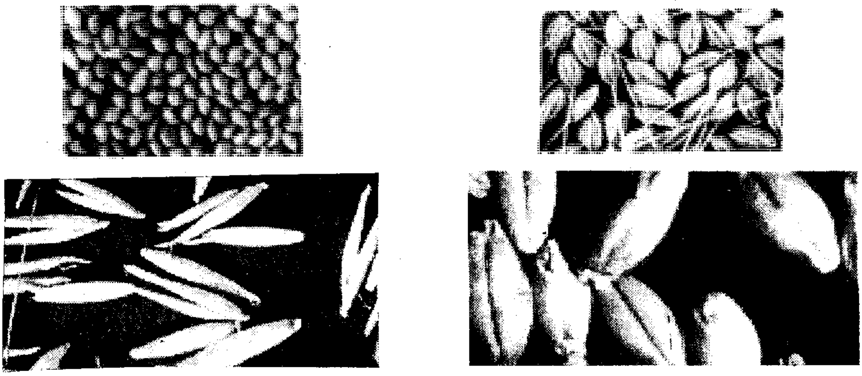

চিত্র ১.৭ : বিভিন্ন দানাবীজের গঠন

বিভিন্ন ধরনের দানা ফসলের পুষ্টি বিষয়ক তথ্য

ফসলের নাম	শর্করা (%)	আমিষ (%)	স্নেহ (%)	মোট তাপশক্তি (ক্যালোরি)
ধান	৭৭	৮	৩.৫	৪৪৫
গম	৭২	১২	১.৭	৩৬৪
ভুট্টা	৭৮	৯	৪.৫	৩৬৭
বার্লি	৬৭	১১	২.৫	৩৫২
সরগাম	৭৩	১১	৩.২	৩৬০
চীনা	৬৮	১৩	১.১	৩৬৩
কাউন	৭১	১০	৩.৫	[illegible]
বাজরা	৬৬	১০	৪.০	৩৫২

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধান চাষ

১। ধান গাছ পরিচিতি

ধান গাছের প্রধান প্রধান অংশের বৈশিষ্ট্য : ধান গাছের প্রধান প্রধান অংশ হচ্ছে— কাণ্ড, পাতা-ফলক, খোল, পর্ব, কুশি, শীষ, অরিকল, লিগ্যুল ও শিকড়। এখানে প্রধান প্রধান অংশের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

১. কাণ্ড	নরম, ফাঁপা
২. পাতা	ফলক ও খোল, অরিকল, লিগ্যুল (ligule) ও কলার (collar), নিশান পাতা (flag leaf)
৩. শীষ	শীষ ও দানা
৪. শিকড়	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিকড়
৫. কুশি	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক কুশি

চিত্র ২.১ : ধান গাছ

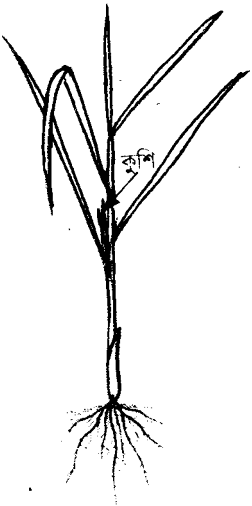

চিত্র ২.২ : কুশি

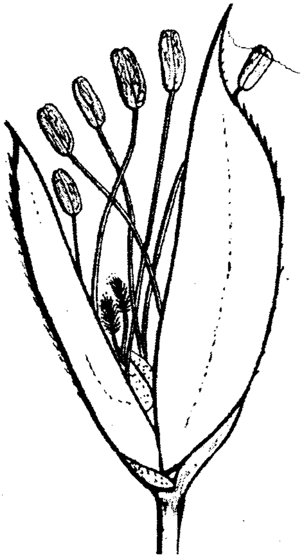

চিত্র ২.৩ : ধানের পাতা ও খোল

২। ধানের জাত পরিচিতি

ধানের পরিচিতি আলোচনা করতে হলে প্রথমেই ধানের উপপ্রজাতিসমূহ সম্পর্কে বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। এশিয়ায় ধানের তিনটি প্রজাতি রয়েছে। এগুলো হচ্ছে —

ক). ইন্ডিকা টাইপ (indica type)

BAMSDOC Library Dhaka

খ) জ্যাপোনিকা টাইপ (japonica type)
গ) জাভানিকা টাইপ (javanica type)

ধান গাছের উপপ্রজাতিসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	উপপ্রজাতিসমূহের নাম ও বৈশিষ্ট্য		
	indica	*japonica*	*javanica*
আলোর প্রতি স্পর্শকাতরতা	স্পর্শকাতর	স্পর্শকাতর নয়	স্পর্শকাতর নয়
প্রতিকূলতা সহ্য ক্ষমতা	বেশি	মধ্যম	মধ্যম
দৈহিক বৃদ্ধিকাল	দীর্ঘ	মধ্যম	খুবই দীর্ঘ
গাছের কাঠামো	নরম	শক্ত	শক্ত
গাছের উচ্চতা	লম্বা	খাটো	লম্বা
কুশির সংখ্যা	বেশি	কম	কম
নিশান পাতা	সরু	মধ্যম	চওড়া
ফলনশীলতা	মধ্যম	বেশি	কম

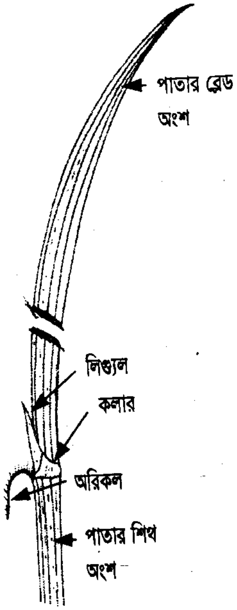

চিত্র ২.৪ : ধানের নিশান পাতা ও শীষ

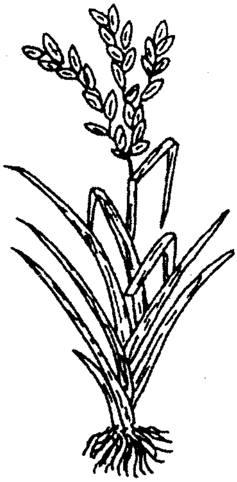

চিত্র ২.৫ : দেশী অনুন্নত ধান গাছ

চিত্র ২.৬ : উফশী ধান গাছ

৩। ধানের উৎপত্তি

ধানের মূল উৎপত্তি ভারত ও চীন। ধানের বৈজ্ঞানিক গণের নাম *Oryza*। এই গণের প্রায় ২৫টি প্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে কেবল ২টির চাষাবাদ হয়। এগুলো হলো :

১। *Oryza sativa*
২। *Oryza glaberima*

অন্যান্য প্রজাতি এখনো বন্য অবস্থায় রয়েছে।

Oryza sativa-এর ৩টি রেস (race) বা প্রজাতির মধ্যে বাংলাদেশে ইন্ডিকা ও জ্যাপোনিকা রয়েছে।

৪। ধানের দানার বৈশিষ্ট্য

সারা বিশ্ব এবং বাংলাদেশে বহু প্রজাতি, উপপ্রজাতি ও জাতের ধান রয়েছে। রেসগতভাবে ইন্ডিকা, জ্যাপোনিকা ও জাভানিকা জাতের ধান গাছের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। এসব উপপ্রজাতির মধ্যেই আবার দানার বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান ধান, যথা—ইন্ডিকা জাতের ধানের দানার মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য সহজেই সনাক্ত করা যায়।

১. দানার আকার ও আকৃতি

মোটা ধান	:	দেশীয় আউশ ধান : ধারিয়াল,	
		বোরো : টেপি ধান, উচ্চ ফলনশীল : ইরি–৮ ধান	
মধ্যম মোটা ধান	:	আমন ধান –	রতিশাইল, সাদা মোটা, বিপ্লব
চিকন ধান	:	আমন ধান –	কালিজিরা, শাক্কর কড়া, কাটারিভোগ দোলাভোগ, চিনিগুড়া, রাঁধুনি পাগল।

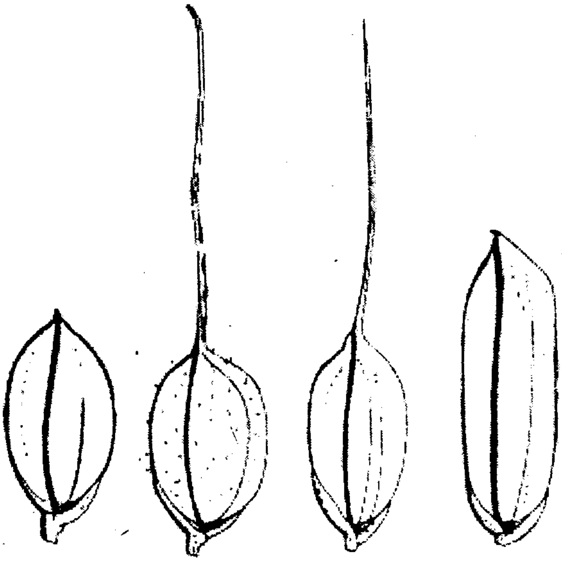

চিত্র ২.৭ : বিভিন্ন আকার–আকৃতির ধান দানা

২. দানার বর্ণ

সোনালি	:	ধানের অধিকাংশ জাত যথা— মুক্তা, বিপ্লব, চাপালনি, বিরই
লালচে	:	কটকতারা, মরিচবাটি, বিন্নি
কালচে	:	কালোমোটা, কালিজিরা
ধূসর	:	ধারিয়াল, কালোমোটা।

৩. দানায় শুঙ-এর উপস্থিতি

শুঙবিহীন	:	অধিকাংশ জাত
শুঙযুক্ত	:	গাজী, স্থানীয় অনেক জাতের ধান যথা– কলম, শুঙকলম, কনকচুর।

৪. ব্যবহার অনুসারে

খই, চিড়া-মুড়ি	:	বিন্নি, কনকচুর
পোলাও	:	কাটারি, রাজভোগ
ভাত	:	সকল জাত
খীর-পায়েস	:	রাঁধুনি পাগল, শাক্কর কড়া
সুগন্ধী	:	রাতা, কালিজিরা
পিঠা	:	চাপালনি, বিরই।

৫. পুষ্টি অনুসারে

স্নেহপ্রধান	:	আউশ ধান (স্থানীয়)
সহজপাচ্য	:	আমন ধান (স্থানীয়)
পুষ্টিকর	:	বোরো ধান (স্থানীয়)।

৬. সৌন্দর্য

পঙ্খীরাজ	:	পাখির ঠোঁটের মতো
বাঁশমতি	:	লম্বা চিকন
জিরাকাটারি	:	জিরার মতো শিরা
কটকতারা	:	উজ্জ্বল রঙ।

৫। ধান চাষের গুরুত্ব

সারা বিশ্বের ধান উৎপাদনকারী প্রধান দেশগুলো হচ্ছে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ড। ধানের হেক্টর প্রতি ফলন সবচেয়ে বেশি উত্তর কোরিয়া ও জাপানে। অপরদিকে ফলন সবচেয়ে কম বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের প্রধান খাদ্য ভাত। তাই এদেশে ধান চাষের গুরুত্ব বর্ণনা করে শেষ করা যায় না। নিচে কয়েকটি প্রধান গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো।

১. বাংলাদেশে সকল এলাকায়ই ধান চাষ করা যায়।

২. বাংলাদেশে অনেক উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত রয়েছে।

৩. বাংলাদেশের প্রায় ৫০% জমিতে অনায়াসে আমন ধানের চাষ করা যায়।
৪. নিচু জমিতে ধান ব্যতীত সহজে অন্যান্য ফসলের চাষ করা যায় না।
৫. দেশে খাদ্য ঘাটতি রয়েছে।
৬. খাদ্য ঘাটতি পূরণে ধানের চাষ না বাড়ালে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিদেশ থেকে ধান আমদানি করতে হবে।
৭. ধান চাষ সম্পর্কে এদেশের সাধারণ কৃষকের মোটামুটি ধারণা রয়েছে।
৮. বর্তমানে মোট ফসলী জমির প্রায় ৭০% জমিতে বিভিন্ন ঋতুতে ধান চাষ হয়।
৯. ধান এ দেশবাসীর সংস্কৃতির সাথে মিশে আছে। ধান কাটার সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। যেমন—নবান্ন, বাঘাই শিন্নী।
১০. ধানে অত্যাবশ্যক এমাইনো এসিডের পরিমাণ অন্যান্য দানা ফসলের চেয়ে, বিশেষ করে গমের চেয়ে বেশি।
১১. নিচু জলাবদ্ধ জমি যেখানে অন্য কোনো ফসলের চাষ করা যায় না, সেখানেও চাষ করার উপযোগী গভীর পানির জাত রয়েছে।
১২. ধানের খড়, তুষ, কুঁড়া, প্রভৃতি ঘর নির্মাণ করার কাজে, পশু খাদ্য ও জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।
১৩. ধান প্রক্রিয়াজাতকরণে এদেশের গ্রামীণ মহিলারাও কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত থাকে।

বাংলাদেশে ধান চাষে পরিসংখ্যানগত তথ্য নিম্নলিখিত শিরোনামে এ অধ্যায়ের শেষাংশে উপস্থাপন করা হলো।

১. মোট ধান উৎপাদন
২. আউশ ধান উৎপাদন
৩. স্থানীয় আউশ ধান উৎপাদন
৪. উফশী আউশ ধান উৎপাদন
৫. পাজাম আউশ ধান উৎপাদন
৬. মোট আউশ ধান উৎপাদন
৭. আমন ধান উৎপাদন তথ্য
৮. বোনা আমন ধান উৎপাদন
৯. স্থানীয় রোপা আমন ধান উৎপাদন
১০. উফশী রোপা আমন ধান উৎপাদন
১১. পাজাম আমন ধান উৎপাদন
১২. স্থানীয়, পাজাম ও উফশী রোপা আমন ধান উৎপাদন
১৩. বোনা ও রোপা আমন ধান উৎপাদন
১৪. বোরো ধান উৎপাদন
১৫. স্থানীয় বোরো ধান উৎপাদন
১৬. উফশী বোরো ধান উৎপাদন
১৭. ধানের পুষ্টি বিষয়ক তথ্য।

৬। ধান চাষের শ্রেণিকরণ

ধান চাষ পদ্ধতি অনুসারে শ্রেণিকরণ

কৃষিতাত্ত্বিক উদ্দেশ্যে ধান ও ধানচাষের বিষয়সমূহকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিকরণ করা যায়। যেমন—

১. চাষাবাদের ঋতু (Season of cultivation) অনুসারে ;

২. চাষাবাদের কৌশল (Cultivation technique) অনুসারে ;
৩. আলোর প্রয়োজনীয়তা (Photosensivity) ;

উল্লিখিত বিষয় অনুসারে নিচে এসব শ্রেণিকরণ বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

৭। চাষাবাদের ঋতু বা মৌসুম অনুসারে শ্রেণিকরণ

চাষবাদের ঋতু বা মৌসুম অনুসারে ধান চাষকে প্রধান তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

ক) বোরো (Boro) বা শীতকালীন ধান চাষ (রবি মৌসুম)
খ) আউশ (Aus) বা গ্রীষ্মকালীন ধান চাষ (খরিফ ১ মৌসুম)
গ) আমন (Aman) বা বর্ষাকালীন ধান চাষ (খরিফ ২ মৌসুম)

১. বোরো বা শীতকালীন ধান (Boro rice)

নভেম্বর মাস থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে জন্মানো ধানকে বোরো ধান বলে। বীজতলায় চারা উৎপাদন করে তারপর মূল জমিতে চারা রোপণ করতে হয়। বোরো ধান চাষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এ মৌসুমে ধান চাষ করতে হলে পানি সেচের প্রয়োজন হয় এবং প্রয়োজনানুসারে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয়। ধান সাধারণত আকারে কিছুটা মোটা হয়। বোরো ধান চাষে ফলন সবচেয়ে বেশি। বোরো ধান দুই প্রকার। যথা—

ক) দেশী বোরো ধান
খ) উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান

দেশী বোরো ধান কিছুটা আগাম অর্থাৎ এপ্রিল মাসে কাটা শুরু করা যায়। আবার উচ্চ ফলনশীল বোরো ধান কিছুটা বিলম্বে অর্থাৎ মে-জুন মাসে কাটতে হয়।

২. আউশ ধান (Aus rice)

মে মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে চাষ করা ধানকে আমন ধান বলে। আমন ধান স্বল্পমেয়াদি অর্থাৎ জীবনকাল ১২০ থেকে ১৬০ দিন হতে পারে। এই ধান আলোর প্রতি স্পর্শকাতর। যখনই রোপণ করা হোক না কেন, দিনের দৈর্ঘ্য ১২ ঘণ্টার চেয়ে কমতে শুরু করলে গাছে থোড় আসে। ধান গাছের উচ্চতা মধ্যম থেকে লম্বা, ফলন মধ্যম।

৩. আমন ধান (Aman rice)

বর্ষাকালে সাধারণত যে ধান চাষ করা হয়ে থাকে তাকে আমন ধান বলা হয়। আমন মৌসুমে দেশী ও উচ্চ ফলনশীল উভয় প্রকার ধানই চাষ করা যায়। আমন ধানের জাতসমূহের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে *শাইল* কথাটি যুক্ত থাকে। তবে পশুশাইল আমন ধান বা শাইল ধান নয়। আমন ধানের চাল চিকন, সুস্বাদু ও জনপ্রিয়।

৮। চাষাবাদ কৌশল অনুসারে ধান চাষের শ্রেণিকরণ

চাষাবাদ কৌশলের ভিত্তিতে ধানের চাষাবাদ সম্পর্কে নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. বোনা ধান

জমি প্রস্তুত করার পর তাতে সরাসরি বীজ বুনে চাষ করা ধানকে বোনা ধান বলে। বোনা ধান নিম্নলিখিত প্রকারের হতে পারে। যথা—

ক) বোনা আউশ
খ) বোনা আমন
গ) মিশ্র বোনা আউশ ও আমন

বোনা আউশ (Broadcast aus)

বোনা আউশ ধান ছিটিয়ে এবং সারিতে উভয় পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। বোনা আউশ ধান সাধারণত বৃষ্টির উপর নির্ভর করে চাষ করা হয়। তবে সুযোগ থাকলে সম্পূরক সেচ দেওয়া ভাল। দেশী ধান সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয় এবং উফশী বোনা আউশ ধান সারিতে বোনা হয়। কোনো কোনো সময় আউশ ধান ডিবলিং (dibbling) করা হয়। মাটিতে চিকন খুঁটি দিয়ে গর্ত করে তাতে বীজ রোপণকে ডিবলিং করা বলে। খরায় বোনা আউশ ধানের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।

বোনা আমন (Broadcast aman)

বোনা আমন ধান সাধারণত মে মাসে সরাসরি বপন করা হয়। বর্ষার পানি ও বৃষ্টির সাথে সাথে গাছও লম্বা হয়। গভীর পানিতে বোনা আমন ধান চাষ করা হয় বলে একে গভীর পানির ধান (Deep water rice) বলে। বোনা আমন ধানকে বা এর অনেক জাতকে ভাসমান ধান (floating rice) বলে।

বাংলাদেশের বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও পাবনা জেলার হাওর–বাওর এলাকায় এই ধান বেশি হয়।

মিশ্র বোনা ফসল চাষ

আউশ ও আমন

বোনা ধান অন্যান্য ফসলের সাথে বা একাধিক ধানের জাত মিশ্রভাবে চাষ করা হয়। যথা—

ক) বোনা আউশ + বোনা আমন মিশ্র চাষ ;
খ) বোনা আউশ + ভুট্টা মিশ্র চাষ ;
গ) বোনা আউশ + মিশ্র ঝুম চাষ ;
ঘ) বোনা আমন + খেশারি মিশ্র চাষ ;
ঙ) বোনা আউশ + তিল/ডাঁটা মিশ্র চাষ।

রোপা ধান চাষ

আউশ, আমন ও বোরো ধান রোপা চাষ করা যায়। এই পদ্ধতিতে বীজতলায় চারা উৎপাদন করে তারপর মূল জমিতে চারা রোপণ করা হয়। দেশী ও উফশী ধান উভয়েই রোপা হিসেবে চাষ করা যায়।

সেচের সুবিধা থাকলে বৃষ্টির উপর নির্ভর না করে আউশের রোপা চাষ করা যায়। প্রধানত উফশী ধানের রোপা চাষ করা হয়। রোপা আমন ধানের বৃষ্টি নির্ভরভাবে দেশী জাত এবং সেচ দিয়ে উফশী ধানের চাষ করা হয়।

রোপা আউশ চাষ

মার্চ–এপ্রিল মাসে রোপা আউশের চারা কাদাময় জমিতে রোপণ করা হয়। বোনা আউশের চেয়ে রোপা আউশের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এতে–

১) খরার ক্ষতিকর প্রভাব কম ;

২) উফশী জাত অধিক চাষ করা হয় ;

৩) ধানের জীবনকাল ১৫ থেকে ২৫ দিন বেড়ে যায় ;

৪) ধানের ফলন বেশি ;

৫) জমি প্রস্তুত করার সময় বা পরবর্তী সময়ে সেচের প্রয়োজন হয় এবং

৬) নিচু জমিতে দেশী জলীয় আউশ ধানের চারাও রোপণ করা যায়।

রোপা আমন ধানের চাষ

রোপা আমন ধানই বাংলাদেশের প্রধান ধান ফসল। জুন–জুলাই মাসে চারা উৎপাদন করে তা মূল জমিতে রোপণ করা হয় এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে কাটা হয়। দেশী জাতের রোপা আমন ধানে সাধারণত সেচ দেয়া হয় না, তবে উফশী ধানে সেচ দিতে হয়।

দেশী রোপা আমন ধানের চাষে অনেক স্থানে মশুর ডাল ও মটরের মিশ্র চাষ করা হয়। বোনা আমন ধানের চেয়ে রোপা আমন ধানের ফলন বেশি হয়, গাছ খাটো থাকে। বাংলাদেশে বন্যায় প্রতি বছর রোপা আমন ধানের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

বোরো ধান

বোরো ধান সর্বদাই রোপণ করা হয়। তবে দু'একটি জায়গায় সরিষার সাথে মিশ্রভাবে বোরো ধানের বীজ বপন করা যায়। এতে ফলন কম হয়।

৯। ধানের আলোর প্রয়োজনীয়তাভিত্তিক শ্রেণিকরণ

অন্যান্য গাছের মতো ধান গাছের বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য আলো একান্ত প্রয়োজন। আলোর প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ধানের চাষকে প্রধান দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(ক) আলো নিরপেক্ষ ধান (Photoneutral rice) চাষ

ফুল উৎপাদনের জন্য এই ধান দিবসের দৈর্ঘ্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। যখনই চাষ হোক, একটি নির্দিষ্ট সময় বা বয়সে ফুল উৎপাদন করে এগুলোকে মৌসুমে বা বয়স নির্দিষ্ট ধান (Periodically fixed rice) বলে। অধিকাংশ আউশ ধানের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রকার ধান চাষে বীজ বপন বা চারা রোপণ করার সময়সীমা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

(খ) খাটো দিবসী ধান (Short day rice) চাষ

এসব ধান আলোর প্রতি স্পর্শকাতর হয়। এই ধান যখনই রোপণ করা হোক, ঠিক দিবস দৈর্ঘ্য খাটো হলেই অর্থাৎ অক্টোবর–নভেম্বর মাসে ফুল ও ফল উৎপাদন করে। এগুলোকে সময় নির্দিষ্ট ধান বলে। এ ধান আমন ধানের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতি হেক্টরে ফসলের আয়-ব্যয়

ফসলের নাম : স্থানীয় ধান-রোপা আমন

১. শ্রমিক ব্যয়

বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	বিবরণ	হার ৫০.০০ টাকা	ব্যয় টাকা (টাকা/ কেজি)	মন্তব্য
হাল	১০		৬০	৬০০	
হাল চাষ	১০		৫০	৫০০	
জমি বিন্যাস	৫		৫০	২৫০	
সার প্রয়োগ	৫		৪০	২০০	
চারা রোপন	১৫		৫০	৭৫০	
ওষুধ প্রয়োগ	৩		৬০	১৮০	
পরিচর্যা	১০		৫০	৫০০	
পানি সেচ	২		৪০	৮০	
পরিবহন	৩		৫০	১৫০	
প্রক্রিয়াকরণ	৫		৪০	২০০	
বিবিধ	৫		৪০	২০০	
মোট	৭৩			৩৬০০	

২. উপকরণ ব্যয়

বিষয়	সংখ্যা/ পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
চারা	৪০ আঁটি		২৫	১০০০	
ইউরিয়া	৬০		৭	৪২০	
অ্যামো-সালফেট					
টিএসপি	৪০		১০	৪০০	
এসএসপি					
এমপি	৩০		১০	৩০০	
ডিএপি					
জিপসাম					
দস্তাসার					

বোরন সার					
ডলোচুন	২০০		৩	৬০০	
অন্যান্য সার					
খামার সার					
কম্পোস্ট	২৫০		৪	১০০০	
খৈল					
বিবিধ					
অণুজীব সার					
কীটনাশক	৬ কেজি			৭০০	
রোগনাশক	৩ কেজি			৩০০	
আগাছানাশক					
হরমোন					
পানি				৩০০	
অন্যান্য সার					
মোট				৫০২০	

৩. মূলধন, উপরি ও অন্যান্য ব্যয়

বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
মূলধন সুদ				৭০০	
বেতন				১২০০	
ভাতা				৫০০	
ডেপ্রিসিয়েশন				৪০০	
আকস্মিক ব্যয়				২০০	
ট্যাক্স				৫০	
ফি					
ইজারা				২০০	
চিকিৎসা					
বিবিধ					
অন্যান্য				২০০	
মোট				৩৪৫০	

BANSDOC Library Dhaka

৪. মোট আয়

বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	বিবরণ	হার টাকা	আয় (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
মূলদ্রব্য	২২০০ কেজি		৭	১৫,৪০০	
উপদ্রব্য	৩০০০ কেজি		.৫০	১৫০০	
অন্যান্য					
মোট				১৬,৯০০	

সারমর্ম

১.	শ্রমিক ব্যয়		৩,৬০০	৩০%
২.	উপকরণ ব্যয়		৫,০২০	৪১%
৩.	মূলধন ও উপরি ব্যায়		৩,৪৫০	২৯%
		মোট ব্যয়	১২,০৭০	১০০%
৪.	মোট আয়	১৬,৯০০		
৫.	নীট আয়	৪,৮৩০		

ফসলের নাম : উফশী বোরো

১. শ্রমিক ব্যয়

বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার ৫০ টাকা (টাকা/কেজি)	ব্যয় টাকা	মন্তব্য
হাল	১৬		৫০	৮০০	
হাল চাষ	১৮		৫০	৯০০	
জমি বিন্যাস	৭		৫০	৩৫০	
সার প্রয়োগ	৭		৪৫	৩১৫	
চারা রোপণ	১৬		৬০	৯৬০	
ওষুধ প্রয়োগ	৫		৭০	৩৫০	
পরিচর্যা	২০		৪০	৮০০	
পানি সেচ	৬		৪৫	২৭০	
পরিবহন	৫		৪০	২০০	
প্রক্রিয়াকরণ	৬		৪০	২৪০	
বিবিধ	৪		৪০	১৬০	
মোট	১১০			৫৩৪৫	

২. উপকরণ ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার টাকা	ব্যয় টাকা	মন্তব্য
চারা	৫০ আঁটি		৩০	১,৫০০	
ইউরিয়া মূল	১২০	•	৭	৮৪০	
অ্যামো-সালফেট					
টিএসপি	৮০		১০	৮০০	
এসএসপি					
এমপি	৫০		১০	৫০০	
ডিএপি					
জিপসাম	৭০		৫	৩৫০	
দস্তাসার	১০		২০	২০০	
বোরন সার				১০০	
ডলোচুন	৩০০		২	৯০০	
অন্যান্য সার					
খামার সার	৫০০		২	১,০০০	
কম্পোস্ট					
খৈল					
বিবিধ					
অণুজীব সার					
কীটনাশক	১০ কেজি		১০০	১,০০০	
রোগনাশক	৮ কেজি		১০০	৮০০	
আগাছা দমন				১,০০০	
হরমোন					
পানি সেচ	২ বার			১,০০০	
অন্যান্য সার				৩০০	
মোট				১৯,৮৭০	

৩. মূলধন, উপরি ও অন্যান্য ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
মূলধন সুদ				৬৫০	
বেতন				১৫০০	
ভাতা				৭০০	

ডেপ্রিসিয়েশন					
আকস্মিক ব্যয়				৫০০	
ট্যাক্স				৫০	
ফি					
ইজারা					
চিকিৎসা					
বিবিধ				১০০	
অন্যান্য					
মোট				৩,৫০০	

৪. মোট আয়

বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	বিবরণ	হার টাকা	আয় (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
মূলদ্রব্য	৫৫০০		৭	৩৫,০০০	
উপদ্রব্য	৫০০০		০.৩০	১,৫০০	
অন্যান্য					
মোট				৩৬,৫০০	

আয় ব্যয় বিশ্লেষণ

১.	শ্রমিক ব্যয়	৫৩৪৫	২৬%
২.	উপকরণ ব্যয়	১১৮৭০	৫৭%
৩.	মূলধন ও উপরি ব্যায়	৩৫০০	১৭%
	মোট ব্যয়	২০৭১৫	১০০%
৪.	মোট আয়	৩৬৫০০	
৫.	প্রকৃত আয়	১৫৭৮৫	
৫.	প্রকৃত আয়	১৫৭৮৫	

৪. মূলধন, উপরি ও অন্যান্য ব্যয়

বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
মূলধন সুদ				১,০০০	
বেতন				১,২০০	
ভাতা				৬০০	

ডেপ্রিসিয়েশন				৫০০	
আকস্মিক ব্যয়				২০০	
ট্যাক্স				৫০	
ফি					
ইজারা				৩০০	
চিকিৎসা					
বিবিধ					
অন্যান্য				৫০০	
মোট				৪,৩৫০	

মোট আয়					
বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	বিবরণ	হার (টাকা)	আয় (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
মূলদ্রব্য	৬,০০০		৭	৪২,০০০	
উপদ্রব্য	৫,০০০		০.৩০	১,৫০০	
অন্যান্য					
মোট				৩৬,৫০০	

আয় ব্যয় বিশ্লেষণ

১.	শ্রমিক ব্যয়	৫,৯১০	৩০%
২.	উপকরণ ব্যয়	৯,৪৫০	৪৮%
৩.	মূলধন ও উপরি ব্যায়	৪,৩৫০	২২%
	মোট ব্যয়	১৯,৭১০	১০০%
৪.	মোট আয়	৪৩,৫০০	
৫.	প্রকৃত আয়	২৩,৭৯০	

ফসলের নাম : হাইব্রিড ও সুপার ধান

১. শ্রমিক ব্যয়					
বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার (৫০ টাকা)	ব্যয় টাকা (টাকা/কেজি)	মন্তব্য
হাল	১৮		৫০	৯০০	
হাল চাষ	২০		৫০	১,০০০	

জমি বিন্যাস	৫		৪০	২০০	
সার প্রয়োগ	৮		৫০	৪০০	
বীজ বপন	১৮		৪০	৭২০	
ওষুধ প্রয়োগ	৬		৭০	৪২০	
পরিচর্যা	২৫		৪০	১০০০	
পানি সেচ	৮		৫০	৪০০	
পরিবহন	৮		৪০	৩২০	
প্রক্রিয়াকরণ	৫		৫০	২৫০	
বিবিধ	৬		৫০	৩০০	
মোট	১২৭			৫,৯১০	

২. উপকরণ ব্যয়

বিষয়	সংখ্যা/পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	বিবরণ	হার (টাকা)	ব্যয় (টাকা)	মন্তব্য
চারা	৫০ আঁটি		৮০	২,০০০	
ইউরিয়া মূল	১৫০		৭	১,০৫০	
অ্যামো-সালফেট					
টিএসপি	৮০		১০	৮০০	
এসএসপি					
এমপি	৬০		১০	৬০০	
ডিএপি					
জিপসাম	৮০		৫	৪০০	
দস্তাসার	১৫		২০	৩০০	
বোরন সার	১০		২০	২০০	
ডলোচুন	৩০০		৩	৯০০	
অন্যান্য সার	৩০		২০	৬০০	
খামার সার					
কম্পোস্ট					
খৈল					
বিবিধ					
অণুজীব সার					

কীটনাশক	১ কেজি		১০০	১,০০০	
রোগনাশক	৭ কেজি		১০০	৭০০	
আগাছানাশক					
হরমোন					
পানি সেচ				৫০০	
অন্যান্য সার				৪০০	
মোট				৯,৪৫০	

বাংলাদেশে ধান চাষের পরিসংখ্যানগত তথ্য

১। বাংলাদেশে মোট ধান উৎপাদন

আউশ ধান

ধান	১৯৯৫—৯৬		১৯৯৬—৯৭	
	জমি	উৎপাদন	জমি	উৎপাদন
স্থানীয়	২৭৭৫০২০	৯৭৪৩০০	২৭৫৮৬৪০	১০২৭৪৫০
উফশী	১০২৮২১০	৬৯৭১৯০	১১৭০০২০	৮৩৮৮৭০
পাজাম	৬৮১০	৪৫৩০	৬০৬০	৪৪৩০
মোট	৩৮১০০৪০	১৬৭৬০২০	৩৯৩৪৭২০	১৮৭০৭৫০

আমন ধান

ধান	১৯৯৫—৯৬		১৯৯৬—৯৭	
	জমি	উৎপাদন	জমি	উৎপাদন
বোনা	২০৬৭২১০	৭৮৯৫২০	২০৭৫৬৯০	৮৬৬২৯০
স্থানীয় রোপা	৬২৮০১৪০	৩৩২০১৩০	৬১৫৬১৪০	৩৩২৫৯৮০
উফশী	৪৯৪৭২৬০	৪১৯৯৮০০	৫২৮৮৯৩০	৪৭৩৫৩৭০
পাজাম	৬৫৮২৩০	৪৮০৮৮০	৮১৭৭৭০	৬২৪১৪০
মোট	১৩৯৫২৮৪০	৮৭৯০৩৩০	১৪৩৩৮৫৩০	৯৫৫১৭৮০

বোরো ধান

ধান	১৯৯৫—৯৬		১৯৯৬—৯৭	
	জমি	উৎপাদন	জমি	উৎপাদন
স্থানীয়	৬১০৫৪০	৩৬৭৪৬০	৫৮২০৬০	৩৫৪৫৫০
উফশী	৬০৬৬৩৮০	৬৭৩৯৩০০	৬১৬৪৭৮০	৬৯৮৪৫৫০
পাজাম	১২৭৪৩০	১১২২৬০	১২৯২২০	১২০৮২০
মোট	৬৮০৪৩৫০	৭২২১০২০	৬৮৭৬০৬০	৭৪৫৯৯২০

২। আউশ ধান উৎপাদন

(ক) জমির পরিমাণ

জাত	জমি (একর)		% পরিবর্তন
	১৯৯৫—৯৬	১৯৯৬—৯৭	
স্থানীয়	২৭৭৫০২০	২৭৫৮৬৪০	(—) ০.৫৯
উফশী	১০২৮২১০	১১৭০০২০	(+) ১৩.৭৯
পাজাম	৬৮১০	৬০৬০	(—) ১১.০১
মোট	৩৮১০০৪০	৩৯৩৪৭২০	(+) ৩.২৭

(খ) উৎপাদন হার

জাত	উৎপাদন (কেজি/একর)				
	১৯৯৫—৯৬		১৯৯৬—৯৭		
	কেজি	মন	কেজি	মন	% পরিবর্তন
স্থানীয় ৩১৫	৯.৪১	৩৭২	৯.৯৮	(+) ৬.০৬	(+) ৫.৭২
উফশী	৬৭৮	১৮.১৭	৭১৭	১৯.২১	
পাজাম ৬৬৫	১৭.৮২	৭৩১	১৯.৫৮	(+) ৯.৮৮	
মোট	৪৪০	১১.৭৮	৪৭৭	১২.৭৪	(+) ৮.১৫

(গ) অনুমিত উৎপাদন

জাত	উৎপাদন (টন)		% পরিবর্তন
	১৯৯৫—৯৬	১৯৯৬—৯৭	
স্থানীয়	৯৭৪৩০০	১০২৭৪৫০	(+) ৫.৪৬
উফশী	৬৯৭১৯০	৮৩৮৮৭০	(+) ২০.৩২
পাজাম	৪৫৩০	৪৪৩০	(—) ২২১
মোট	১৬৭৬০২০	১৮৭০৭৫০	(+) ১১.৬২

৩। স্থানীয় আউশ ধান উৎপাদন

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	২২০২০	১০৩৭০	২৩৫১০	১১৫২০
চট্টগ্রাম	৩০১৯০	১২১৫০	৪৩২৯০	১৮৯৫০
কুমিল্লা	১৫৫৮৯০	৪৪৯৮০	১৭৯০১০	৬৬০৮০
খাগড়াছড়ি	১২২০	৬৬০	১৩৭০	৭২০
নোয়াখালি	১৪১৯২০	৪৬৮৩০	১৩২২৭০	৪৪৫৩০
রাঙ্গামাটি	১০২৪০	৫০৯০	৭২৪০	৩৭১০
সিলেট	২৬৫৯০০	১১৩২৫০	২৬৫৬১০	১১৯৯৭০
ঢাকা	১৩৫১৮০	৩৯৫১০	১২৩১৭০	৪০৫০০
ফরিদপুর	৪০৭৬৯০	১৩৪২২০	৪০৬৮৭০	১৪৮৫৩০
জামালপুর	১৩০৭৫০	৩৬৪৬০	১০৫৮৭০	৩২১৭০
কিশোরগঞ্জ	৩৮৯১০	১৩৫১০	৩৯৩১০	১৪৮৫০
ময়মনসিংহ	১৫২৯২০	৪৩৭৮০	১৩৪৮১০	৪০৯৬০
টাঙ্গাইল	১০৫৩৯০	৩৩৪০০	১০৫৬১০	২৭৩৬০

বরিশাল	৩৪৭৯৯০	১০১৩২০	৩২৬৩১০	৯৮৬৬০
যশোর	১৬০৮১০	৬৯৯৯০	১৫০২৩০	৬৫৬৭০
খুলনা	৩০৩৫০	১৪৩৫০	২৯৭৩০	১৪০৫০
কুষ্টিয়া	১৪৭৩৮০	৭০৮৬০	১৬৩৫৭০	৮০৫৯০
পটুয়াখালী	১৫৮৭০০	৬৮১৮০	১৬৩৭৬০	৭৩৩৫০
বগুড়া	৬১৬০	১৮০০	৪১৭০	১৪১০
দিনাজপুর	৪৪৮৩০	১৪৬১০	৪১১৯০	১২০২০
পাবনা	৬৯২০০	২১০৫০	৬৯৪১০	২১১৯০
রাজশাহী	৮৮৫৭০	৩৬৭৬০	১৩৭৫৬০	৫৭৪১০
রংপুর	১২২৮১০	৪১১৭০	১০৪৭৭০	৩৩২৪০
বাংলাদেশ	**২৭৭৫০২০**	**৯৭৪৩০০**	**২৭৫৮৬৪০**	**১০২৭৪৫০**

৪। উফশী আউশ ধান উৎপাদন

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	৪৪৭০	৪৪৭০	৫৭৬০	৫১৭০
চট্টগ্রাম	৪২৭৮০	৩৬৩৯০	৪৪৭৮০	৩৮৫৮০
কুমিল্লা	১১৮৫৮০	৮৩৪৩০	১২৭২৮০	৯৪৫৪০
খাগড়াছড়ি	২৭০০	২১৭০	২৮২০	২৩৩০
নোয়াখালি	৯৬৫১০	৬০৯৫০	১০৮৮২০	৭২৯৫০
রাঙ্গামাটি	৪২৫০	৩৬৮০	৩৯৭০	৩৫৮০
সিলেট	১৬৪০৬০	১২১৪৪০	১৭৭৯২০	১৪০৬৬০
ঢাকা	১৪২২০	৭০৪০	১৪৪৯০	৮১২০
ফরিদপুর	১৩০০	১১৩০	১৩৯০	১২৪০
জামালপুর	১৫৪৬০	৮৪২০	১৯২৭০	১১৭৬০
কিশোরগঞ্জ	৯৯৭৩০	৫৬২৫০	১০৩৪২০	৬২৮৫০
ময়মনসিংহ	৯৮৯৬০	৬৫৬০০	১২৭৫৩০	৯০২১০
টাঙ্গাইল	৯৯৪০	৪২৫০	১০৩১০	৪৮২০
বরিশাল	৪৮৩৯০	২২৭৪০	৫২২৫০	৩১২৬০
যশোর	৩৭৭৪০	৩৩৭০০	৫০৬১০	৪৫১৩০

খুলনা	২৯৯৪০	২৬৯১০	২৭৫৮০	২২২০০
কুষ্টিয়া	১৫৮০০	১৪৮১০	১৯১১০	১৮১০০
পটুয়াখালী	৩৪৭৩০	২৪৫৮০	৩৮১৬০	২৮৫৪০
বগুড়া	৯২০	৬০০	২৯৮০০	২০৭০০
দিনাজপুর	৫২৭৬০	২৭৮৫০	৫৩৯০০	৩১২৭০
পাবনা	৭৮০	৩০০	৭১০	২৯০
রাজশাহী	৮২৭৭০	৬৪১৩০	৮৯৬৬০	৭২৫৬০
রংপুর	৫১২৭০	২৬৩৫০	৬০৪৮০	৩২০১০
বাংলাদেশ	১০২৮২১০	৬৯৭১৯০	১১৭০০২০	৮৩৮৮৭০

৫। পাজাম আউশ ধান উৎপাদন

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
চট্টগ্রাম	১০৪০	৮৬০	৮৫০	৭০০
কুমিল্লা	২০০০	১৫৩০	১৯২০	১৪৬০
খাগড়াছড়ি	—	—	—	—
সিলেট	২১৫০	১২৫০	২১৪০	১৬১০
ঢাকা	৯৪০	৪৯০	৯৫০	৫০০
জামালপুর	২৫০	৫০	১১০	৭০
ময়মনসিংহ	৩৪০	২৭০	—	—
টাঙ্গাইল	—	—	—	—
পটুয়াখালি	৯০	৮০	১০০	৯০
বাংলাদেশ	৬৮১০	৪৫৩০	৬০৬০	৪৪৩০

৬। মোট আউশ ধান উৎপাদন

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	২৬৪৯০	১৪৮৪০	২৯২৭০	১৬৬৯০
চট্টগ্রাম	৭৪০১০	৪৯৪০০	৮৮৯১০	৫৮২৩০

কুমিল্লা	২৭৬৪৭০	১২৯৯৪০	৩০৮২১০	১৬২০৮০
খাগড়াছড়ি	৩৯২০	২৮৩০	৪১৯০	৩০৫০
নোয়াখালি	২৩৮৪৩০	১০৭৭৮০	২৪১০৯০	১১৭৪৮০
রাঙ্গামাটি	১৪৪৯০	৮৭৭০	১১২১০	৭২৯০
সিলেট	৪৩২১১০	২৩৫৯৪০	৪৪৫৬৭০	২৬২২৪০
ঢাকা	১৫০৩৪০	৪৭০৪০	১৩৮৬১০	৪৯১২০
ফরিদপুর	৪০৮৯৯০	১৩৫৩৫০	৪০৮২৬০	১৪৯৭৭০
জামালপুর	১৪৬৪৬০	৪৪৯৩০	১২৫২৫০	৪৪০০০
কিশোরগঞ্জ	১৩৮৬৪০	৬৯৭৬০	১৪২৭৩০	৭৭৭১০
ময়মনসিংহ	২৫২২২০	১০৯৬৫০	২৬২৩৪০	১৩১১৭০
টাঙ্গাইল	১১৫৩৭০	৩৭৬৫০	১১৫৯২০	৩২১৮০
বরিশাল	৩৯৬৩৮০	১২৪০৬০	৩৭৮৫৬০	১২৯৯২০
যশোর	১৯৮৫৫০	১০৩৬৯০	২০০৮৪০	১১০৮০০
খুলনা	৬০২৯০	৪১২৬০	৫৭৩১০	৩৬২৫০
কুষ্টিয়া	১৬৩১৮০	৮৫৬৭০	১৮২৬৮০	৯৮৬৯০
পটুয়াখালী	১৯৩৫২০	৯২৮৪০	২০২০২০	১০১৯৮০
বগুড়া	৭০৮০	২৪০০	৩৩৯৭০	২২১১০
দিনাজপুর	৯৭৫৯০	৪২৪৬০	৯৫০৯০	৪৩২৯০
পাবনা	৬৯৯৮০	২১৩৫০	৭০১২০	২১৪৮০
রাজশাহী	১৭১৪৫০	১০০৮৯০	২২৭২২০	১২৯৯৭০
রংপুর	১৭৪০৮০	৬৭৫২০	১৬৫২৫০	৬৫২৫০
বাংলাদেশ	৩৮১০০৪০	১৬৭৬০২০	৩৯৩৪৭২০	১৮৭০৭৫০

৭। আমন ধান উৎপাদন তথ্য

(ক) জমির পরিমাণ

জাত	জমি (একর)		% পরিবর্তন
	১৯৯৫—৯৬	১৯৯৬—৯৭	
বোনা	২০৬৭২১০	২০৭৫৬৯০	(+) ০.৪১

স্থানীয় রোপা	৬২৮০১৪০	৬১৫৬১৪০	(—) ১.৯৭
উফশী	৪৯৪৭২৬০	৫২৮৮৯৩০	(+) ৬.৯১
পাজাম	৬৫৮২৩০	৮১৭৭৭০	(+) ২৪.২৪
মোট	১৩৯৫২৮৪০	১৪৩৩৮৫৩০	(+) ২.৭৬

(খ) উৎপাদন হার

জাত	জমি (একর)		% পরিবর্তন
	১৯৯৫—৯৬	১৯৯৬—৯৭	
	খগ	খগ	
বোনা	৩৮২	৪১৭	(+) ৯.২৯
স্থানীয় রোপা	৫২৯	৫৪০	(+) ২.১৯
উফশী	৮৪৯	৫৯৫	(+) ৫.৫০
পাজাম	৭৩০	৭৬৩	(+) ৪.৫০
গড়	৬৩০	৬৬৬	(+) ৫.৭৫

(গ) অনুমিত উৎপাদন

জাত	উৎপাদন (টন)		% পরিবর্তন
	১৯৯৫—৯৬	১৯৯৬—৯৭	
বোনা	৭৮৯৫২০.	৮৬৬২৯০	(+) ৯.৭২
স্থানীয় রোপা	৩৩২০১৩০	৩৩২৫৯৮০	(+) ০.১৮
উফশী	৪১৯৯৮০০	৪৭৩৫৩৭০	(+) ১২.৭৫
পাজাম	৪৮০৮৮০	৬২৪১৪০	(+) ২৯.৭৯
মোট	৮৭৯০৩৩০	৯৫৫১৭৮০	(+) ৮.৬৬

৮। বোনা আমন ধান উৎপাদন

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবন	—	—	—	—
চট্টগ্রাম	—	—	—	—

কুমিল্লা	২৪৬২৬০	১২৮৩৪০	৩৭৯৩০০	১৬৯১৯০
খাগড়াছড়ি	—	—	—	—
নোয়াখালি	৫২৩৭০	১৯০২০	২৭৪২০	১২৬৯০
রাঙ্গামাটি	৪০	২০	৫০	২০
সিলেট	২৮৯৫২০	১৪২৪৪০	২১২৩৪০	১০৬৫৩০
ঢাকা	১৯২৮৩০	৫১৯৭০	১৭৯১৮০	৫৬৩৮০
ফরিদপুর	৪৭০৭০০	১৫১৯৮০	৪৮৮৯১০	১৮৯৯৮০
জামালপুর	২০১০	৫৯০	৪৫৬০	১৪৫০
কিশোরগঞ্জ	৮৯৯০	৩৬২০	৫১৬০	২১৯০
ময়মনসিংহ	৫৪০	২১০	৫৭০	২৩০
টাঙ্গাইল	৫৩৫৭০	২৩৭২০	৮৩৬৯০	৩৯১৪০
বরিশাল	৯৯৯৬০	৩৮৯২০	১০৬১৮০	৪৯২৬০
যশোর	১৭১৮১০	৮০৬১০	১৮৮৮৭০	৭৯৮৮০
খুলনা	১০৪৪৯০	৪২০৫০	১১২৪৭০	৪২৩৬০
কুষ্টিয়া	২৬৩৪০	১১৪১০	১৮০৪০	৭৭৯০
পটুয়াখালী	—	—	—	—
বগুড়া	—	—	—	—
দিনাজপুর	—	—	—	—
পাবনা	১৪১৬১০	৫৬২৪০	১৫৬২৫০	৬৫১৫০
রাজশাহী	৯২৬৬০	৩২৫১০	৯৮০০০	৩৭১৭০
রংপুর	১৪০১০	৫৮৭০	১৪৭০০	৬৮৮০
বাংলাদেশ	২০৬৭২১০	৭৮৯৫২০	২০৭৫৬৭০	৮৬৬২৯০

৯। স্থানীয় রোপা আমন ধান উৎপাদন

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	১৮৯০	১৩৭০	১৮২০	১২৪০
চট্টগ্রাম	৫২৮০০	৩৬৫২০	১৩৫৫০০	৯৮৭৮০

কুমিল্লা	১৪৭৮০০	৭৬১৩০	১২৩৪৯০	৭২০৫০
খাগড়াছড়ি	১৪৩০	৯২০	১৩১০	৮৩০
নোয়াখালি	৩৯৪৫২০	২০০৭২০	৪২৫০৭০	২০৯৯২০
রাঙ্গামাটি	২৬৫০	১৬৮০	১৫৪০	১০২০
সিলেট	৪৮৩৪৫০	২৭০৬৯০	৪২৪৬৭০	২৫০৩০০
ঢাকা	১০৪৫৯০	৫৩০২০	৮৪৩৩০	৪৭৮৭০
ফরিদপুর	১৮৬৫০	৭২৭০	১১২৪০	৬৪৮০
জামালপুর	৩৩৬০১০	১৬৮০৭০	৩১৮৯৮০	১৮৯৫৫০
কিশোরগঞ্জ	৩১১০৪০	১৭৯৪৯০	৩১৯৯৫০	১৮৮৫৬০
ময়মনসিংহ	৩৫২১৬০	১৭৩২১০	৩৬৫১৪০	২০৩৯০০
টাঙ্গাইল	১৩৩৯৬০	৭১৭০০	১৩০১৯০	৭৬৬৮০
বরিশাল	৭৩০০১০	৩৮৬১২০	৭৩৪১১০	৩৯০৭৬০
যশোর	৬৯৭৮৫০	৩৮১৪০	৭৮৭০০	৪৫০০০
খুলনা	৪৭৮৩০০	২৬৯০৫০	৪৪০৫০০	২৪৬১৫০
কুষ্টিয়া	১৯৮১০	৯৮৪০	৭৭৩০	৩৬৪০
পটুয়াখালী	৭৩৩৭৪০	৩৭৩৫৮০	৭৩৩৫১০	৩১৯৮০০
বগুড়া	১৯১৪৭০	৯৫৯১০	২১১৮৫০	১১২৬৯০
দিনাজপুর	৫৪৫৯২০	২৮৭৩৩০	৫৪৬৩৮০	২৯০৬৩০
পাবনা	৭৫৩০০	৩৯৭২০	৭৪৪০০	৪১৩০০
রাজশাহী	৪২৭৩২০	২১৫১৮০	৪৪১০১০	২৩৬০৬০
রংপুর	৬৬৭৫৭০	৩৬৪৫৬০	৫৪৩৭২০	২৯২৮৭০
বাংলাদেশ	**৬২৮০১৪০**	**৩৩২০১৩০**	**৬১৫৬১৪০**	**৩৩২৫৯৮০**

১০। উফশী রোপা আমন ধান উৎপাদন

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	১৫০৮০	১৫৮৫০	১৫৭১০	১৬২১০

চট্টগ্রাম	৩৫৮৪০	৩৬৯৫৪০	৩০৭৯৬০	১৯৯৮০০
কুমিল্লা	৪৩০৯৫০	৩৮১৩২০	২৯৯৯১০	২৭৪২৭০
খাগড়াছড়ি	১৫৮০০	১৬০০০	১৫৬৯০	১৫৯৪০
নোয়াখালি	১৪৫২৯০	১৫৫৭০	১৩৭১২০	১২২৪৩০
রাঙ্গামাটি	১৬৫৬০	১৪১১০	১৯০২০	১৭৫৩০
সিলেট	১৪৬১২০	২২৩১৫০	৩৮২২২০	৩৪১৫৬০
ঢাকা	৯৭৭০০	৭৬১১০	১২৭৯৯০	১১৪০৯০
ফরিদপুর	৬৭১৯০	৪১৯১০	৫৬২০০	৪৫০৪০
জামালপুর	৭৭০৬০	৫৯৯৪০	১০৯৩৬০	৯৮৯১০
কিশোরগঞ্জ	১০৯৯৫০	১০২৩৬০	১১৮৬৯০	১১১৭৮০
ময়মনসিংহ	১৬৪৯৯০	১২৫৭০০	১৭৩৩৭৯	১৪৩৪১০
টাঙ্গাইল	৭৯৬৫০	৬০২৩০	৮৩৬৯০	৭০১৩০
বরিশাল	৬৬৭২০	৫৫৩৪০	৪৪২৪০	৩৭৬৭০
যশোর	৫৬৬৬৭০	৫০৯১৪০	৫১১৫৪০	৪৬৪১৯০
খুলনা	৩০৩৫১০	২৭৫৯৮০	৩৭৪৯০০	৩৫১৬৭০
কুষ্টিয়া	২২৩১২০	১৭৫৬৫০	২৩১৯৮০	১৯৯৯৪০
পটুয়াখালী	৭৩২৩০	৫০৬০০	৭৩৩৫০	৪৭৫৬০
বগুড়া	৩৪২৮৪০	২৫৩৭৭০	৩৬৩১৭০	২৯০৯২০
দিনাজপুর	৩৭১২৭০	২৯০৬১০	৪০২০৫০	৩২৭৩১০
পাবনা	১০৬০৫০	৮২৩০০	১৩৭৬৫০	১০০১৪০
রাজশাহী	৩৮৯১৯০	৩২১৪৯০	৪২১৪১০	৩৯২৭৮০
রংপুর	৬৮২৪৮০	৫৮৩১৩০	৮৮১৭১০	৮৫২০৯০
বাংলাদেশ	৪৯৪৭২৬০	৪১৯৯৮০০	৫২৮৮৯৩০	৪৭৩৫৩৭০

১১। পাজাম আমন ধান উৎপাদন

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	৬৫৮০	৫২০০	৫০১০	৪৩৯০

চট্টগ্রাম	১৪৭৫১০	১২৬৯৭০	১৭২৫৪০	১৫৫২৬০
কুমিল্লা	৩০৯৩০	২৩৭০০	৭৯৩৯০	৬৩৮৩০
খাগড়াছড়ি	৫০৮০	৩৬২০	৫২০০	৩৭৯০
নোয়াখালি	৮৭৭৮০	৬২৯৯১০	৯৫৯৯০	৭১২৭০
রাঙ্গামাটি	৪২২০	৩১৬০	২৬৬০	২৩৩০
সিলেট	৩১৩৯০	২৫০০০	৪২৪৭০	৩৪১৯০
ঢাকা	১০৬২০	৬৯৬০	৩৪১৩০	২৪৭৪০
ফরিদপুর	২৩৭০	১৪০০	৫৬২০	৪২৯০
জামালপুর	১৫২৪০	১০৯০০	২২৭৮০	১৯৪৭০
কিশোরগঞ্জ	৭১৫৪০	৫৮৮০০	৭২২৫০	৫৬৯৬০
ময়মনসিংহ	৭৩৮৮০	৪৭২৭০	৭৫৯৯০	৫২৭০০
টাঙ্গাইল	১৩৮২০	৯২৭০	১২৪০০	৯১৯০
বরিশাল	৪০০	২৫০	৩০০	১৮০
যশোর	৩৪০	২৭০	৭৮৭০	৫৭৯০
খুলনা	১০৩১০	৭৮৩০	৯৩৭০	৭০২০
কুষ্টিয়া	–	–		
পটুয়াখালী	৫৫২০	৩৮৮০	৮১৫০	৪৮৩০
বগুড়া	২৪০৯০	১৩৫৩০	৩০২৬০	২০৪২০
দিনাজপুর	৭৩২১০	৪৬৫১০	৮২৪৭০	৫৩৯৩০
পাবনা	১৬১০	৯২০	৩৭২০	১৮৩০
রাজশাহী	১৫৬৪০	৭৭৯০	১৯৬০০	১০৫৩০
রংপুর	২৬১৫০	১৪৭৪০	২৯৩৯০	১৭২০০
বাংলাদেশ	৬৫৮২৩০	৪৮০৮৮০	৮১৭৭৭০	৬২৪১৪০

১২। স্থানীয় + পাজাম + উফশী রোপা আমন ধান উৎপাদন

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	২৩৫৫০	২২৪২০	২২৫৪০	২১৮৪০

চট্টগ্রাম	৫৫৫১৫০	৫৩৩০৩০	৬১৫৯১০	৫৫৩৮৪০
কুমিল্লা	৩১০৬৮০	৪৮১১৫০	৫০২৭৯০	৪১০১৫০
খাগড়াছড়ি	২২৩১০	২০৫৪০	২২২০০	২০৫৬০
নোয়াখালি	৬২৭৫৯০	৩৭৯২০০	৬৫৮১৮০	৪০৩৬২০
রাঙ্গামাটি	২৩৪৩০	১৮৯৫০	২৩৫২০	২০৮৮০
সিলেট	৭৬০৯৬০	৫১৮৮৪০	৮৪৯৩৬০	৮২৬০৫০
ঢাকা	২১২৯১০	১৩৬০৯০	২৪৭৪৫০	১৮৬৭০০
ফরিদপুর	৮৮২১০	৫০৫৮০	৭৩০৬০	৫৫৮১০
জামালপুর	৪২৮৩১০	২৩৮৯১০	৪৫১১২০	৩০৭৯৩০
কিশোরগঞ্জ	৪৯২৫৩০	৩৪০৬৫০	৫১০৮৯০	৩৫৭২০০
ময়মনসিংহ	৫৯১০৩০	৩৪৬০৯০	৬১৪৫০০	৪০০১০
টাঙ্গাইল	২২৭৪৩০	১৪১২০০	২২৬২৮০	১৫৬০০০
বরিশাল	৭৯৭১৩০	৪৪১৭১০	৭৭৮৬৫০	৪২৮৬১০
যশোর	৬৩৬৭৬০	৫৪৭৫৫০	৫৭৮১১০	৫১৪৯৮০
খুলনা	৭৯২১২০	৫৫২৮৬০	৮২৪৭৭০	৬০৪৮৪০
কুষ্টিয়া	২৪২৯৩০	১৮৫৪৯০	২৩৯৭১০	২০৩৫৮০
পটুয়াখালী	৮১২৪৯০	৪২৮০৬০	৮১৫০১০	৩৭২১৯০
বগুড়া	৫৫৮৪০০	৩৬৩২১০	৬০৫২৮০	৪২৪০৩০
দিনাজপুর	৯৯০৪০০	৬২৪৪৫০	১০৩০৯০০	৬৭১৮৭০
পাবনা	১৮২৯৬০	১২২৯৪০	২১৫৭৭০	১৪৩২৭০
রাজশাহী	৮২৩১৫০	৫৪৪৪৬০	৮৮২০২০	৬৩৯৩৭০
রংপুর	১৩৭৬২০০	৯৬২৪৩০	১৪৫৪৮২০	১১৬২১৬০
বাংলাদেশ	১১৮৮৫৬৩০	৮০০০৮১০	১২২৬২৮৪০	৮৬৮৫৪৯০

১৩। বোনা ও রোপা আমন ধান উৎপাদন

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	২৩৫৫০	২২৪২০	২২৫৪০	২১৮৪০

চট্টগ্রাম	৫৫৫১৫০	৫৩৩০৩০	৬১৫৯১০	৫৫৩৮৪০
কুমিল্লা	৯৫৬৯৪০	৬০৯৪৯০	৮৮২০৯০	৫৭৯৩৪০
খাগড়াছড়ি	২২৩১০	২০৫৪০	২২২০০	২০৫৬০
নোয়াখালি	৬৭৯৯৬০	৩৯৮২২০	৬৮৫৬০০	৪১৬৩১০
রাঙ্গামাটি	২৩৪৭০	১৮৯৭০	২৩৫৭০	২০৯০০
সিলেট	১০৫০৪৮০	৬৬১২৮০	১০৬০৭০০	৭৩২৫৮০
ঢাকা	৪০৫৭৪০	১৮৮০৬০	৪২৬৬৩০	২৪৩০৮০
ফরিদপুর	৫৫৮৯১০	২০২৫৬০	৫৬১৯৭০	২৪৫৭৯০
জামালপুর	৪৩০৩২০	২৩৯৫০০	৪৫৫৬৮০	৩০৯৩৮০
কিশোরগঞ্জ	৫০১০২০	৩৪৪২৭০	৫১৬০৫০	৩৫৯৩৮০
ময়মনসিংহ	৫৯১৫৭০	৩৪৬৩০০	৬১৫০৭০	৪০০২৪০
টাঙ্গাইল	২৮১০০০	১৬৪৯২০	৩০৯৯৭০	১৯৫১৪০
বরিশাল	৮৯৭০৯০	৪৮০৬৩০	৮৮৪৮৩০	৪৭৭৮০০
যশোর	৮০৮৫৭০	৬২৮১৬০	৭৪৬৯৮০	৪৯৪৮৪০
খুলনা	৮৯৬৬১০	৫৯৪৯১০	৯৩৭২৪০	৬৪৭২০০
কুষ্টিয়া	২৬৯২৭০	১৯৬৯০০	২৫৭৭৫০	২১১৩০০
পটুয়াখালী	৮১২৪৯০	৪২৮০৬০	৮১৫০১০	৩৭২১০০
বগুড়া	৫৫৮৪০০	৩৬৩২১০	৬০৫২৮০	৪২৪০০০
দিনাজপুর	৯৯০৪০০	৬২৪৪৫০	১০৩০৯০০	৬৭১৮০০
পাবনা	৩২৪৫৭০	১৭৯১৮০	৩৭২০২০	২০৮৪০০
রাজশাহী	৯২৪৮১০	৫৭৬৯৭০	৯৮০০২০	৬৭৬৫০০
রংপুর	১৩৯১২১০	৬৯৮৩০০	১৪৬৯৫২০	১১৬৯০০
বাংলাদেশ	**১৩৯৫২৮৪০**	**৮৭৯০৩৩০**	**১৪৩৩৮৫৩০**	**৯৫৫১৭০০**

১৪। বোরো ধান উৎপাদন

(ক) জমির পরিমাণ

জাত	জমি (একর)		% পরিবর্তন
	১৯৯৫—৯৬	১৯৯৬—৯৭	
স্থানীয়	৬১০৫৪০	৫৮২০৬০	(–) ৪.৬৬

উফশী	৬০৬৬৩৮০	৬১৬৪৭৮০	(+) ১.৬২
পাজাম	১২৭৪৩০	১২৯২২০	(+) ১.৪০
মোট	৬৮০৪৩৫০	৬৮৭৬০৬০	(+) ১.০৫

(খ) উৎপাদন হার

জাত	উৎপাদন/কেজি/একর		
	১৯৯৫—৯৬	১৯৯৬—৯৭	
	কেজি	কেজি	% পরিবর্তন
স্থানীয় ৩৫১	৬০৫	৬০৯	(+) ০.৬৮
উফশী	১১১১	১১৩৩	(+) ১.৯৮
পাজাম ৬৬৫	৮৮১	৯৩৫	(+) ৬.১৪
গড়	১০৬১	১০৯৫	(+) ২.২২

(গ) অনুমিত উৎপাদন

জাত	উৎপাদন (মেট্রিক টন)		% পরিবর্তন
	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭	
স্থানীয়	৩৬৯৪৬০	৩৫৪৫৫০	(–) ৪.০৪
উফশী	৬৭৩৯৩০০	৬৯৮৪৫৫০	(+) ৩.৬৪
পাজাম	১১২২৬০	১২০৮২০	(+) ৭.৬২
মোট	৭২২১০২০	৭৪৫৯৯২০	(+) ৩.৩১

১৫। স্থানীয় বোরো ধান উৎপাদন

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	–	–	–	–
চট্টগ্রাম	৯০	৮০	৯০	৯০
কুমিল্লা	১৫৩১০	১০০৩০	১৫০৩০	১০৪১০
খাগড়াছড়ি	–	–	–	–
নোয়াখালি	১১৮০	৫৭০	১০	১০
রাঙ্গামাটি	২০	২০	৩০	২০
সিলেট	৩৭১৭৭০	১৮৮৩৬০	৩২১৯৬০	১৯০৪৮০

ঢাকা	২১৪৭০	১০৪৫০	২০৮০০	১০৯০০
ফরিদপুর	৩৯৩০০	২৩৪৩০	৩৩৯১০	২১,৬৮০
জামালপুর	১১৩৫০	৭২২০	১২০৫০	৮০৫০
কিশোরগঞ্জ	১৩৫৭৩০	৯০৮৪০	১১৬৫৩০	৭৯০৪০
ময়মনসিংহ	১৪৭২০	৭৪১০	১৩৯৬০	৭৫২০
টাঙ্গাইল	২৭২০	১৬৯০	২৭০০	১৬৯০
বরিশাল	৯৯৭০	৪২৪০	৯২৯০	৩৯৯০
যশোর	২৫১০	১৭১০	১৭৮০	১২৫০
খুলনা	১৫৪৪০	৮১১০	১৭০৮০	৮৮৬০
কুষ্টিয়া	৭৩০	৫৯০	৬৮০	৫৪০
পটুয়াখালী	২১৩০	৯২০	২১৮০	১০৪০
বগুড়া	৫৮০	৪০০	৭০০	৪৮০
দিনাজপুর	৬৫৬০	৫২৫০	৭২০	৭০০
পাবনা	৫০৭০	২৭৭০	৫৩৯০	৩০৪০
রাজশাহী	৫৬২০	৩৫৭০	৫৪০০	৩৫৮০
রংপুর	২২৭০	১৪০০	১৭৭০	১১৮০
বাংলাদেশ	**৬১০৫৪০**	**৩৬৯৪৬০**	**৫৮২০৬০**	**৩৫৪৫৫০**

১৬। উফশী বোরো ধান উৎপাদন

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	৮১১০	৭৭১০	৮৫৫০	৭৯৫০
চট্টগ্রাম	২৭৭৮৪০	৩০০২৪০	২৬৪০১০	২৫১০০০
কুমিল্লা	৫৬১৪৭০	৬০২১৩০	৫৬৭৮৮০	৬২৪২৭০
খাগড়াছড়ি	৩৬৮০	৩২৩০	৩৬৬০	৩৪৩০
নোয়াখালি	২৩০৫১০	২৩১৯৭০	২৩০০৬০	২৪৩৮০০
রাঙ্গামাটি	১১৮৫০	১১৭৯০	১২৮৫০	১৩১৬০
সিলেট	৩৮৯৮৪০	৩৫৫৭৯০	৩৯৪২১০	৩৬৪৭৮০
ঢাকা	৪৪২১৩০	৫১৪২৫০	৪৪৮৬৩০	৫২৮৩৪০
ফরিদপুর	১৬৪৪৬০	১৯৬৪৪০	১৬৬৭০০	২২১২৭০

জামালপুর	২৩৯৯১০	২৬১১৩০	২৪৭৫৩০	২৭৪৫১০
কিশোরগঞ্জ	৫৩০৩৭০	৬০৯৭৬০	৫৩৫৭৩০	৬২৩৯২০
ময়মনসিংহ	২৫০৮৭০	২৫৯৩৯০	২৬৪৭০০	২৯৯৪৮০
টাঙ্গাইল	২৩৩৭৯০	২৫৫২৬০	২৪৫২৪০	২৭৭৬৫০
বরিশাল	৭২১৫০	৭৩১৭০	৭৯৯১০	৮৪১২০
যশোর	৩৬০১০০	৪২২৩৩০	৩৬৮৯৫০	৪৪৬৩৫০
খুলনা	১০৬৪৪০	১১২৪০০	১১৩৬১০	১২৫৮২০
কুষ্টিয়া	৮৫১৪০	৯০১০০	৮৯০৩০	৯৪১১০
পটুয়াখালী	১৯০৯০	২০৫৮০	২০০৫০	২৪৮২০
বগুড়া	৪৭৩২০০	৫৫৪২৭০	৪৭৭৬০০	৫৭২০৯০
দিনাজপুর	২৭৫৩৪০	২৮৮১৯০	২৭০৮২০	২৮৯৩২০
পাবনা	২৩৬২৭০	২৮৬৭২০	২৪২২৯০	২৯৫৮৩০
রাজশাহী	৫২৮১১০	৬৩৪১৭০	৫৩৩০৬০	৬৪৩৪৯০
রংপুর	৫৬৫৭১০	৬৪৮২৮০	৫৭৯৮১০	৬৭৫০৪০
বাংলাদেশ	**৬০৬৬৩৮০**	**৬৭৩৯৩০০**	**৬১৬৪৭৮০**	**৬৯৮৪৫৫০**

বিগত ১৯৯৫–৯৬ ও ১৯৯৬–৯৭ বছরের উল্লিখিত ধান উৎপাদন বিষয়ক তথ্য থেকে ধান চাষের ধারা সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। এ থেকে পরবর্তী সময়ে করণীয় বিষয় নির্ধারণ করাটা সহজতর হয়ে থাকে।

BARSDOC Library
Dhaka

তৃতীয় অধ্যায়

ধান জাতের বৈশিষ্ট্য

১। ধানের জাত

বাংলাদেশে প্রধানত তিন জাতের ধান রয়েছে। যথা—

১. স্থানীয় জাত (Local Variety, LV)
২. স্থানীয় অনুমোদিত জাত (Local Improved Variety, LIV)
৩. আধুনিক উচ্চ ফলনশীল জাত (Modern High Yielding Variety, MHYV)

নিচে ধানের এই তিন ধরনের জাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

২। স্থানীয় জাতের বৈশিষ্ট্য

প্রাচীনকাল থেকে নির্দিষ্ট এলাকায় চাষ করা জাতসমূহকে স্থানীয় জাত নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশব্যাপী বহুসংখ্যক স্থানীয় জাতের ধানের চাষ হয়ে থাকে। এক এলাকার স্থানীয় জাত সাধারণত অন্য এলাকায় চাষ করতে দেখা যায় না।

আমাদের দেশে এ ধরনের জাতের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। স্থানীয় জাতের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো :

১. নির্দিষ্ট এলাকায় চাষ করা হয়।
২. ফলন খুব কম, হেক্টর প্রতি ১.৫ থেকে ২.০ টন।
৩. ধান গাছ লম্বা, এজন্য হেলে পড়ে।
৪. মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ ক্ষমতা কম।
৫. গাছের কাণ্ড নরম, পাতা লম্বাটে।
৬. উৎপাদিত ধানের ওজন ও খড়ের ওজনের অনুপাত গড়ে ১ : ২।
৭. রোগ ও পোকার আক্রমণের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।
৮. অনেক জাত স্বল্পমেয়াদি।

কিছু স্থানীয় জাতের ধানের নাম উদাহরণ হিসেবে এখানে উল্লেখ করা হলো :

বোরো – টেপি, গঁচি, খৈয়া বোরো।
আউশ – গিরবি, লাল মোটা, কালো মোটা।
বোনা আমন – দুধসর, বাজাইল।
রোপা আমন – রতিশাইল, চাপালনি, বিরই।

৩। স্থানীয় উন্নত জাতের বৈশিষ্ট্য (LIV)

আমাদের দেশে স্থানীয় ধান জাতসমূহের মধ্যে যেগুলোর উন্নত গুণাবলী রয়েছে এবং কৃষি বিভাগ অনুমোদন দিয়েছে, সেগুলোকে স্থানীয় উন্নত জাত নামে অভিহিত করা যায়। স্থানীয় উন্নত জাতসমূহের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য অপর পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত হলো।

১. ফলন ক্ষমতা স্থানীয় জাতের চেয়ে বেশি, হেক্টর প্রতি ২.০ থেকে ৩.০ টন।
২. একাধিক এলাকায় চাষাবাদ হয়।
৩. রোগ-পোকার আক্রমণের প্রতি কিছুটা প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।
৪. সার প্রয়োগ করে ফলন বাড়ানো যায়।
৫. ধান গাছের আকার মধ্যম থেকে লম্বা।
৬. কোনো কোনো জাত এলাকা বিশেষের জন্য অনুমোদিত। যেমন— লোনা জমির জন্য রাজাশাইল।

অনুমোদিত স্থানীয় উন্নত কয়েকটি জাতের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো।

বোরো : হবিগঞ্জ – ১, হবিগঞ্জ –২

আউশ : কটকতারা, ধারিয়াল

রোপা আমন : পাজাম, লতিশাইল, রাজাশাইল, কালিজিরা।

৪। বাংলাদেশের স্থানীয় ধান জাতের বিবরণ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং অন্যান্য গবেষণা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে ৫ হাজারেরও অধিক জাতের ধান রয়েছে। এগুলো আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে চাষাবাদ হয়। তবে আমন ধানের স্থানীয় জাতই বেশি। অবশ্য এসব ধানের একই জাতের এলাকাভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকায় জাতের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা বেশ গবেষণাসাপেক্ষ। তবুও এখানে এলাকায় পরিচিত নামে সচরাচর চাষকৃত স্থানীয় জাতসমূহের নাম ও একই সাথে এসব ধানের ফসল, গাছ, দানা, মৌসুম, ফলনের সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

৫। স্থানীয় জাতের ধান ফসল (এ সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত)

বাঁশিরাজ (Banshi raj)

১. উত্তরাঞ্চলের রোপা আমনের স্থানীয় উন্নত ধান ;
২. গাছ লম্বা ;
৩. ধান খয়েরি, মধ্যম, চিকন।
৪. ফলন কম ;
৫. গাছ হেলে পড়ে ;
৬. ধান মধ্যম আকারের।

নাসিমশাইল (Nasimshail)

১. রোপা আমন ধান ;
২. সবুজ গাছের গড়ন শক্ত ;
৩. পাকা শীষের ভারে হেলে পড়ে ;
৪. নিশান পাতা চওড়া ;
৫. ধানের বর্ণ হলদে সোনালি, দেখতে বেশ সুন্দর ;
৬. ফলন মধ্যম।

জয়া (Joya)

১. রোপা আমন ধানের স্থানীয় বা বাইরে থেকে আনীত জাত।
২. গাছ মধ্যম উঁচু ;
৩. শীষ নিশান পাতার উপরে উঠে ;

পাঁচ্ জাগ (Panch jag)

১. উত্তরাঞ্চলের স্থানীয় জাতের রোপা আমন ধান ;
২. গাছ লম্বাটে খাড়া ;
৩. শীষ ছোটো, হলদে ;

৪. শীষ কিছুটা ছড়ানো ;
৫. ফলন মধ্যম থেকে বেশি।

সালে (Salle)

১. বৃহত্তর রংপুরে জন্মানো রোপা আমন জাত ;
২. গাছ লম্বা ;
৩. পরিপক্বতার পর্যায়ে গাছ হেলে পড়ে ;
৪. গাছের পাতা অনেকদিন সবুজ থাকে।

হালাই (Halai)

১. প্রধান মৌসুম রোপা আমন ;
২. গাছ মধ্যম উঁচু থেকে উঁচু
৩. কুশি উৎপাদন কম ;
৪. ফলন কম ;
৫. উত্তরাঞ্চলে চাষ বেশি হয় ;
৬. গাছ মধ্যম আকারের।

কালোমেই

১. কাঁচা শীষ খয়েরি কালচে ;
২. গাছ উচুঁ ;
৩. শীষ বড় ;
৪. নিশান পাতায় চেয়ে শীষ উপরে ;
৫. পাতা মধ্যম সরু ;
৬. ফলন মধ্যম থেকে সন্তোষজনক ;
৭. গাছ হেলে পড়ে।

যাদু (Jadhu)

১. অনেক উপজাত রয়েছে;
২. রংপুরে বেশি চাষাবাদ হয়;
৩. পাতা গাঢ় সবুজ;
৪. পাত বড়;
৫. গাছের উচ্চতা মধ্যম;
৬. ফলন মধ্যম।

৪. পাতা খাড়া ধরনের, ময়লা সবুজ ;
৫. ফলন কম।

মুক্তাহার (Mujta har)

১. প্রধান উৎপাদন মৌসুম রোপা আমন ;
২. গাছ খাড়া ;
৩. পাতা মধ্যম সরু ;
৪. শীষ চিকন খাড়া ;
৫. গাছের উচ্চতা মধ্যম ;
৬. ফলন কম থেকে মধ্যম।

উকুন মধু (Ukne madhu)

১. মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের ধান ;
২. প্রধানত আমন মৌসুমে চাষ হয় ;
৩. গাছ লম্বা ;
৪. শীষ বড় ;
৫. কাঁচা শীষ ধূসর খয়েরি ;
৬. ফলন সন্তোষজনক।

যশোয়া (Joshua)

১. অনেক উপজাত রয়েছে ;
২. প্রধানত রোপা মৌসুমে চাষ করা হায় থাকে ;
৩. শীষবিশিষ্ট কাণ্ড লম্বা ;
৪. গাছ হেলে পড়ে ;
৫. ফলন মধ্যম ;
৬. পাতা লম্বাটে।

পানিশাইল (Pani shail)

১. গাছের উচ্চতা মধ্যম;
২. নিশান পাতা শীষের উপরে থাকে;
৩. শীষের আকার মধ্যম;
৪. কাঁচা শীষ সবুজ ধূসর;
৫. ফলন মধ্যম;
৬. ধান পরিপক্বতা পর্যন্ত পাতা সবুজ থাকে।

বাওই ঝাক (Bowai jhak)

১. গাছ সরু, লম্বাটে;
২. শীষ লম্বা, হলদে খয়েরি;
৩. নিশান পাতা শীষের নিচে থাকে;
৪. শীত ততো ছড়ানো হয়;
৫. ফলন সন্তোষজনক ;
৬. শীষ তেমন ছড়ানো নয়।

মিয়া (Mian)

১. উত্তরাঞ্চলে সীমিত আকারে চাষ হয়ে থাকে;
২. আমন মৌসুমে উৎপাদনের উপযোগী;
৩. কিছুটা নাবী চাষ করা যায়;
৪. ফলন কম;
৫. কুশি উৎপাদন কম;
৬. রোগ প্রবণতা আছে।

বিন্নিধান (Binni dhan)

১. অনেক ধরনের উপজাত রয়েছে;
২. গাছ সরু, লম্বা;
৩. পাতা লম্বাটে;
৪. গাছ হেলে পড়ে;
৫. ফলন মধ্যম;
৬. প্রধান আমন মৌসুমে চাষ করা হয়ে থাকে।
৭. ভাত বেশ সুস্বাদু।

সোনাশাইল (Sona shail)

১. বেশ জনপ্রিয় রোপা আমন ধানের জাত;
২. পাকা ফসল পরিপূর্ণ সোনালি রঙ ধারণ করে;
৩. ফলন মধ্যম থেকে বেশি;
৪. নিশান পাতা দীর্ঘ সময় সবুজ থাকে;
৫. গাছ মধ্যম উঁচু;
৬. গাছের কাঠামো শক্ত, খাড়া থাকে।

সুজনী Sujani)

১. প্রধানত আমন মৌসুমে চাষ হয়;
২. গাছের কাঠামো সরু;
৩. গাছ হেলে পড়ে;
৪. গাছ মধ্যম উঁচু থেকে উঁচু;
৫. শীষ ছড়ানো নয় ;
৬. ফলন কম থেকে মধ্যম;

মালসিরা

১. আমন ধানের মধ্য ও উত্তরাঞ্চলের জাত বিশেষ;
২. পানিবদ্ধতায় গাছ হেলে পড়ে;
৩. পল্লব বেশি, শীষ ছোটা;
৪. ফলন কম;
৫. নিশান পাতা শীষের নিচে থাকে;
৬. নিচু জমিতে চাষ করা যায়।

নাগিনশাইল (Naginshail)

১. রংপুরে বেশি চাষ হয়;
২. পাতা অবস্থায় ফসল সোনালি রঙ ধারণ করে;
৩. ফসল কিছুটা আগাম কাটা যায়;
৪. ফলন মধ্যম;
৫. শীষ পাকা অবস্থায়ও নিশান পাতা কিছুটা সবুজ থাকে;
৬. গাছ মধ্যম থেকে লম্বা।

শুভরাজ (Shuva raj)

১. মূলত আমন ধানের জাত;
২. ফলন মধ্যম;
৩. গাছ হেলে পড়ে;
৪. গাছ লম্বা;
৫. পল্লব (folliage) বেশি;
৬. অপরিপক্ব শীষ ধূসর খয়েরি।
৭. উত্তরাঞ্চলে বেশি চাষ করা হয় ;
৮. পানিবদ্ধতায় অনেকটা স্থায়ী।

বিন্দিপাকরি (Bindi pakri)

১. প্রধানত উত্তরাঞ্চলে চাষাবাদ করা হয়;
২. শীষ খুবই হালকা ও ছড়ানো;
৩. গাছে পাতা কম;
৪. গাছ হেলে পড়ে;
৫. ফলন কম;
৬. নিশান পাতা লম্বাটে।

আলে ধান (Aleydhan)

১. স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকতে পারে;
২. কুড়িগ্রামে আলে ধান নামে পরিচিত;
৩. চরাঞ্চলে বেশ চাষ হয়;
৪. কিছুটা খরাসহিষ্ণু;
৫. গাছ মধ্যম থেকে লম্বা;
৬. শীষ বেশ বড়।

বেতো ধান (Bheto dhan)

১. প্রধানত আমন মৌসুমে চাষ করা হয়ে থাকে;
২. গাছ লম্বা;
৩. শীষ বেশ বড়, সবুজ ধূসর;
৪. গাছ হেলে পড়ে;
৫. কিছুটা নিচু জমিতেও চাষ করা যায়।

মধুমাসী (Madhumashi)

১. ফলন কম থেকে মধ্যম
২. মধুমাস নামে পরিচিতি আছে;
৩. কুশি উৎপাদন মধ্যম;
৪. গাছ মধ্যম উঁচু থেকে উঁচু;
৫. ঘন করে লাগালে গাছ খাড়া থাকে;
৬. উত্তরাঞ্চলে বেশি চাষ হয়।

ভুট্টাশাইল (Bhutta Shail)

১. মধ্য ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় জাত;
২. গাছ লম্বা, হেলে পড়ে;
৩. পাতা গাঢ় সবুজ, লম্বাটে;
৪. ফলন মধ্যম;
৫. রোগ পোকা প্রতিরোধী;
৬. কিছুটা নাবী চাষ করা যায়।

নয়ারাজ (Noya raj)

১. স্থানভেদে একই নামে অনেক উপজাত রয়েছে;
২. গাছে কুশি কম;
৩. অপরিপক্ব শীষ ধূসর খয়েরি;
৪. গাছ লম্বা, হেলে পড়ে;
৫. শীষ মধ্যম ;
৬. উত্তরাঞ্চলে বেশি চাষ হয়।

লাল মোটা (Lal mota, red bold)

১. প্রধানত দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে চাষ হয়;
২. আমন ধানের জাত;
৩. কুশি উৎপাদন বেশি;
৪. পাতা সরু, ততোটা শক্ত নয়;
৫. কিছুটা নিচু জমিতেও চাষ করা যায়।

তিলকাবুর

১. প্রধানত দেশের উত্তরাঞ্চলে বেশি চাষ করা হয়ে থাকে;
২. গাছ বেশ লম্বা;
৩. শীষ দেখতে কালচে খয়েরি;
৪. নিশান পাতা সুস্পষ্ট;
৫. ফলন মধ্যম।

৬। স্থানীয় জাতের ধান দানার বৈশিষ্ট্য

কালো কাটারি (Kalo katari, black katari)

১. দিনাজপুরে বেশি জন্মে;
২. ধান সরু লম্বাটে;
৩. রঙ কালো;
৪. কাটারি ধানের একটি উপজাত;

মোগল সাই (Moghol shai)

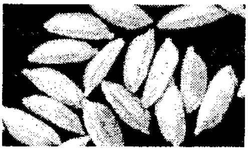

১. নেত্রকোনা এলাকায় বেশি জন্মে;
২. ধান ছোটো, গোলাকার-ডিম্বাকার;
৩. পোলাওয়ের চাল হয়;
৪. রঙ সোনালি।

ঘিগজ (Ghigaj)

১. ধান মধ্যম মোটা;
২. আমন ধান;
৩. রঙ হলদে খয়েরি।

বিরই (Biroi)

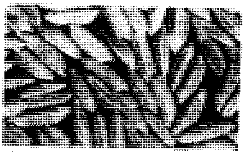

১. আমন ধান (চিকন);
২. ধান হলদে খয়েরি;
৩. ধান সরু;
৪. চাল চিকন, উন্নত মানের ভাত হয়।

সাপাহার (Sapahar)

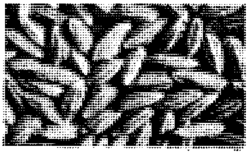

১. স্থানভেদে নামে পার্থক্য হতে পারে;
২. ধান লালচে সোনালি'
৩. ধানের আকার মধ্যম;
৪. আমন ধান।

কেরনডল (Kerandol)

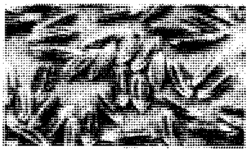

১. আউশ ধান;
২. ধানের রঙ লালচে খয়েরি;
৩. ধান মধ্যম ছোট;
৪. ধানের শিরা গভীর, রঙ হালকা।

পংখীরাজ (Pankiraj)

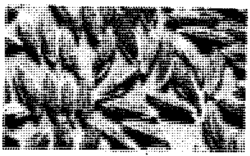

১. আমন ধান
২. ভ্রূণ প্রান্তের সাদা উপাঙ্গ পাখির ঠোঁটের মতো;
৩. ধান মধ্যম আকারের।

চাপালনি (Chapalni)

১. নেত্রকোনা এলাকায় বেশি জন্মে;
২. চিকন চাল হয়, খুবই ভাল;
৩. ধান মধ্যম সরু;
৪. রঙ হলদে খড় বর্ণ।

জামাই আদুরী (Jamai aduri)

১. ধান মধ্যম বড়, লম্বাটে;
২. রঙ হালকা খড় বর্ণ;
৩. ভ্রূণ প্রান্তে ঈষৎ সাদা উপশাঁস আছে;
৪. চালের মান উন্নত।

বাঁশমতি (Banshmati)

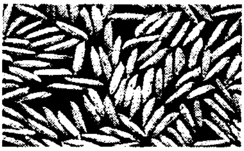

১. ধান ও চাল লম্বাটে;
২. চাল মধ্যম স্বচ্ছ;
৩. ভাত উন্নত মানের।

কান্দিশাও (Kandishaw)

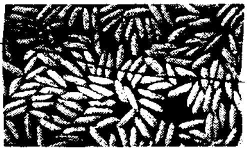

১. স্থানভেদে ভেতো নামেও পরিচিত;
২. ধান খয়েরি সোনালি;
৩. আকার মধ্যম;
৪. ভ্রূণ প্রান্ত ক্রম সরু।

মৌলতা (Moulata)

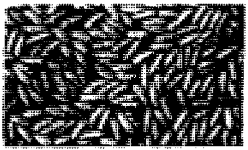

১. দক্ষিণাঞ্চলীয় এলাকায় বেশি জন্মে;
২. ধানের দু'প্রান্ত হলদে, মধ্যে লালচে খয়েরি;
৩. ধানের লেজ প্রান্ত কিছুটা প্রলম্বিত।

সলই (Solai)

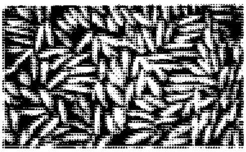

১. আউশ ধান;
২. দক্ষিণাঞ্চলে বেশি হয়;
৩. ধানের ভ্রূণপ্রান্ত ক্রম সরু;
৪. রঙ লালচে হলুদ;
৫. আকার মধ্যম।

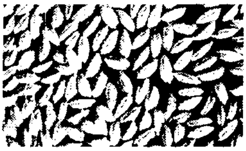

কনকচুঁর (Kanakchur)

১. অনেকগুলো উপজাত রয়েছে;
২. রঙ খড় বর্ণ থেকে ধূসর;

৩. কোনো কোনো উপজাতে শুঙ আছে।

৪. এ ধানে ভাল খৈ হয়।

কলম (Kalom)

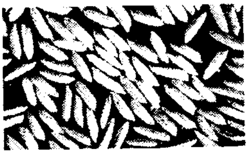

১. আমন ধান;

২. ধান মধ্যম আকার, সরু লম্বাটে;

৩. কোনো কোনো উপজাতে শুঙ থাকে;

৪. রঙ হলদে খড় বর্ণ;

ইন্দ্রশাইল

১. আমন ধান (অনেকটা বিশুদ্ধ জাত);

২. ধান মধ্যম, সরু লম্বাটে;

৩. রঙ হালকা হলদে;

৪. চাউল উষ্ণ মানের।

শুঙ কালিজিরা (kalijira)

১. কালিজিরার একটি উপজাত;

২. ধান সরু লম্বাটে;

৩. লম্বা শুং আছে;

৪. রঙ বেগুনি খয়েরি।

শুঙ পাইরজাত (Pairjat)

১. টাংগাইল এলাকায় বেশ দেখা যায়;

২. ধান ডিম্বাকার মোটা;

৩. কোনো কোনো উপজাতে শুঙ আছে;

৪. রঙ হালকা হলদে;

৫. ভ্রূণ ও উপাঙ্গের মাঝে সামান্য ফাঁকা আছে।

বেগুন বীচি (Begun bichi)

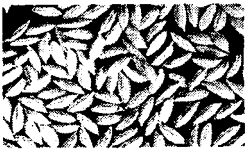

১. আমন ধান;

২. ধান ছোটো;

৩. পোলাওয়ের চাল ভাল হয়;

৪. রঙ খড় বর্ণ।

নাইজারশাইল (Nigershail)

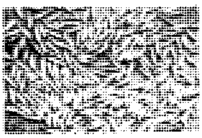

১. খুবই জনপ্রিয় ধান;

২. ধান সরু লম্বাটে;

৩. উন্নত মানের চাল হয়;

৪. ভাতের মান বেশ উন্নত।

লাল বিন্নি (Lal binni, red binni)

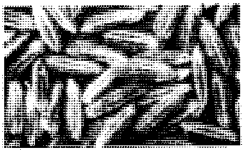

১. ধান মধ্যম আকারের;
২. রঙ লালচে খয়েরি;
৩. ভ্রূণ প্রান্তের রঙ হালকা;
৪. ধানের শিরা খুব স্পষ্ট।

কেলাডোমা (Keladoma)

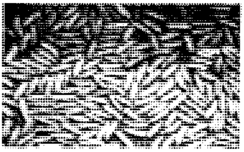

১. প্রধানত আমন ধান;
২. ধানের রঙ গাঢ় খড় বর্ণ;
৩. ধানের আকার মধ্যম ছোট।

চল্লিশা (Challisha)

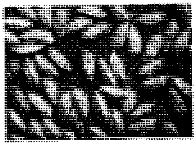

১. ধান মোটা;
২. ধানের রঙ ধূসর;
৩. ধান বেশি খসখসে।

সীতাভোগ (Seetabhog)

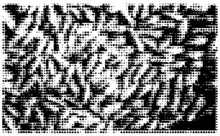

১. দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে বেশি হয়;
২. ধানের আকার মধ্যম, ঈষৎ লম্বাটে;
৩. চালের মান উন্নত;
৪. ধানের রঙ গাঢ় খড় বর্ণ।

মোটা আমন (Mota aman, bold aman)

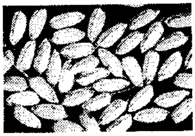

১. আমন ধান;
২. দানা মোটা, ডিম্বাকার;
৩. রঙ খড় বর্ণ;
৪. চালে মোটা, ভাত হয়।

সাদা মোটা আমন (Sada mola, white bold)

১. আমন ধান;
২. ধান মোটা ডিম্বাকার;
৩. দানার রঙ হালকা খড় বর্ণ থেকে কিছুটা ধূসর;
৪. চাল মোটা।

বাদশাভোগ (Badshabhog)

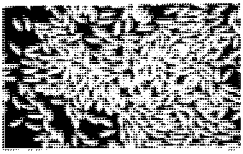

১. ধান খুব ছোট;
২. দানা সরু লম্বাটে;
৩. দানার বর্ণ-সোনালি খড় বর্ণ;
৪. উন্নত মানের পোলাও চাল হয়।

দুধসর (Dhudsar)

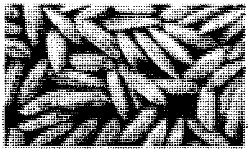

১. বোনা আমন ধান;
২. দানা মধ্যম সরু লম্বাটে;
৩. দানার রঙ খড় বর্ণ;
৪. নেত্রকোনা এলাকায় বেশি চাষ হয়।

হিড়িং (Hiring)

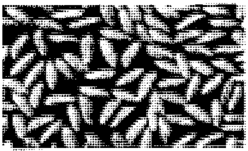

১. দিনাজপুর এলাকায় বেশি চাষ হয়;
২. ধান মধ্যম মোটা;
৩. ভ্রূণ প্রান্ত ক্রম সরু;
৪. দানার রঙ গাঢ় খড় বর্ণ;

মাগুরশাইল (Magurshail)

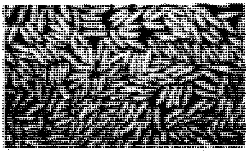

১. উত্তরাঞ্চলীয় ধান;
২. দানার রঙ হালকা খয়েরি;
৩. দানা মধ্যম সরু;
৪. চাল বেশ স্বচ্ছ।

গরছা ধান (Gorcha dhan)

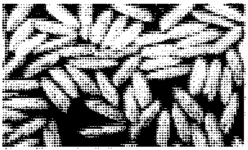

১. মধ্যাঞ্চলীয় ধান;
২. অনেক উপজাত আছে;
৩. কোনো কোনো উপজাতের শুঙ আছে;
৪. দানা মধ্যম বড়;
৫. দানার রঙ হালকা খড় বর্ণ।

৭। **স্থানীয় জাতের ধান শীষ ও দানার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য** (সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত)

বিন্দিপাকরি ও সোনাশাইল

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	**জাতের নাম**	
	বিন্দিপাকরি	সোনাশাইল
দানার আকার	ছোটো	বড়
দানার রঙ	খয়েরি	সোনালি
শীষে দানাবনন্ধন	হালকা	ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

জামাইসোহাগী ও বাউ–২

শীষ দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	জামাই সোহাগী	বাউ–২
দানার আকার	ছোট	বড়
দানার রঙ	সোনালি	ধূসর খয়েরি
শীষে দানাবন্ধন	ঘন	হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম
জাত	স্থানীয়	আধুনিক

রাজাভোগ ও ব্রিধান–২৬

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	রাজাভোগ	ব্রিধান–২৬
দানার আকার	একটু ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	সোনালি	উজ্জ্বল সোনালি
শীষে দানাবন্ধন	সামান্য হালকা	ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	আধুনিক

ব্রিধান–৩৯ এবং ভুট্টাশাইল

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	ব্রিধান–৩৯	ভুট্টাশাইল
দানার আকার	একটু বড়	একটু ছোট
দানার রঙ	সোনালি	খড় বর্ণ
শীষে দানাবন্ধন	ঘন	একটু হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম
জাত	আধুনিক	স্থানীয়

বিনাশাইল ও তিলকাবুর

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	বিনাশাইল	তিলকাবুর
দানার আকার	ডিম্বাকার	গোলাকার
দানার রঙ	সোনালি	কালো

শীষে দানাবন্ধন	ঘন	হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম
জাত	আধুনিক	স্থানীয়

পাটেশ্বরী ও পাজাম

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	পাটেশ্বরী	পাজাম
দানার আকার	সামান্য বড়	সামান্য ছোট
দানার রঙ	খয়েরি	সোনালি
শীষে দানাবন্ধন	হালকা	ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেমি
জাত	স্থানীয়	আধুনিক

ব্রিধান–৪ এবং নয়ারাজ

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	ব্রিধান–৪	নয়ারাজ
দানার আকার	একটু ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	খড় বর্ণ	ধূসর খয়েরি
শীষে দানাবন্ধন	সামান্য ঘন	সামান্য হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	আধুনিক	স্থানীয়

জামাই সোহাগী ও বাওইজাক

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	জামাই সোহাগী	বাওইজাক
দানার আকার	সামান্য বড়	সামান্য ছোট
দানার রঙ	সোনালি	খড় বর্ণ দানায খয়েরি ছাপ
শীষে দানাবন্ধন	ঘন	সামান্য হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	সামান্য কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

ব্রিধান—২৮ এবং নয়াপাজাম

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	ব্রিধান—২৮	নয়াপাজাম
দানার আকার	সামান্য বড়	সামান্য ছোট
দানার রঙ	উজ্জ্বল খড় বর্ণ	গাঢ় সোনালি
শীষে দানাবন্ধন	ঘন	সামান্য হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম
জাত	আধুনিক	আধুনিক

বিন্দিপাকরি ও কালোমেই

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	বিন্দি পাকরি	কালোমেই
দানার আকার	লম্বাটে	গোলাকার/ডিম্বাকার
দানার রঙ	খয়েরি	কালচে
শীষে দানাবন্ধন	সামান্য ঘন	সামান্য হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

পানিশাইল ও পাটেশ্বরী

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	পানিশাইল	পাটেশ্বরী
দানার আকার	লম্বাটে সুরু	চ্যাপ্টা
দানার রঙ	খড় বর্ণ	খয়েরি
শীষে দানাবন্ধন	একটু ঘন	একটু হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	সামান্য কম
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

কেলাডোমা, ফিলকাটারি, সাপাহার ও ব্রিধান—৩২

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম			
	কেলাডোমা	ফিল কাটারি	সাপাহার	ব্রিধান—৩২

আকার	মধ্যম	খুব সরু	মধ্যম	সরু
আকৃতি	ডিম্বাকার	লম্বাটে	ডিম্বাকার	লম্বাটে
রঙ	হালকা খড় বর্ণ	খড় বর্ণ	খয়েরি	উজ্জ্বল খড় বর্ণ
জাত	স্থানীয়	আধুনিক	স্থানীয়	আধুনিক

বাদশাভোগ, ফিলকাটারি, পাজাম ও দেশী কাটারি

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম			
	বাদশা ভোগ	ফিল কাটারি	পাজাম	দেশী কাটারি
আকার	ছোট	খুব সরু	মধ্যম	সরু
আকৃতি	ডিম্বাকার	লম্বাটে	ডিম্বাকার	লম্বাটে
রঙ	খড় বর্ণ	গাঢ় খড় বর্ণ	সোনালি	উজ্জ্বল খড় বর্ণ
জাত	স্থানীয়	আধুনিক	স্থানীয়	আধুনিক

গন্ধরাজ ও যশোয়া

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	গন্ধরাজ	যশোয়া
দানার আকার	একটু ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	কালো	হালকা খয়েরি
শীষে দানাবন্ধন	সামান্য. হালকা	সামান্য ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

কালোকাটারি, স্বর্ণা ও কলম

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম		
	কলম	স্বর্ণা	কালো কাটারি
দানার আকার	মধ্যম	মধ্যম	একটু ছোট
দানার রঙ	খড় বর্ণ	সোনালি	কালো
শীষে দানাবন্ধন	হালকা	ঘন	সামান্য হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি	মধ্যম
জাত	স্থানীয়	আধুনিক	স্থানীয়

বাদশাভোগ, কান্দিশাও ও কনকচুর

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম		
	বাগশাভোগ	কান্দিশাও	কনকচুর
দানার আকার	ছোট	মধ্যম	মধ্যম
দানার রঙ	খড় বর্ণ	ধূসর খয়েরি	ধূসর খড় বর্ণ
শীষে দানাবন্ধন	ঘন	হালকা	সামান্য হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়	স্থানীয়

কালিজিরার উপজাত (দানা)

বর্ণভিত্তিক	কালচে, হালকা কালচে, হালকা খয়েরি, লালচে, গাঢ় সোনালি।
শুঙের উপস্থিতি	আছে, নাই।
শুঙের বর্ণ	কালো, হালকা খয়েরি।
আকার	ডিম্বাকৃতি, লম্বাটে।
ভ্রূণ উপাঙ্গ	খয়েরি, সাদাটে

কান্দিশাও, দেশী কাটারি ও পাজাম

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম		
	কান্দিশাও	দেশী কাটারি	পাজাম
দানার আকার	ছোট	মধ্যম	মধ্যম
দানার আকৃতি	সরু	সরু	ডিম্বাকার
দানার রঙ	খড় বর্ণ	উজ্জ্বল খড় বর্ণ	সোনালি
শীষে দানা বন্দন	হালকা	সামান্য ঘন	সামান্য হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি	মধ্যম
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়	আধুনিক

দেশী কাটারি ও বাদশাভোগ

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	দেশী কাটারি	বেগুন বীচি
দানার আকার	একটু বড়	একটু ছোট

দানার আকৃতি	লম্বাটে	ডিম্বাকার
দানার রঙ	উজ্জ্বল খড় বর্ণ	উজ্জ্বল সোনালি
শীষে দানাবন্ধন	সামান্য ঘন	সামান্য হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

ধানের শীষের ধরন

উফশী : (উদাহরণ) ১. শীষে দানা আঁটে-সাটো; ৩. শাখা-প্রশাখা বেশি;	২. গোড়া পর্যন্ত ধান থাকে; ৪. শীষে দানা বেশি;
দেশী বা স্থানীয় ১. শীষে দানা হালকা, ছড়ানো; ৩. শাখা-প্রশাখা কম;	২. গোড়ায় দানা থাকে না; ৪. শীষে দানা কম।

বেগুনবীচি ও ফিলকাটারি

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	**জাতের নাম**	
	বেগুন বীচি	ফিলকাটারি
দানার আকার	একটু ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	খড় বর্ণ সোনালি	গাঢ় সোনালি
শীষে দানা বন্ধন	সামান্য হালকা	ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	একটু কম	একটু বেশি
জাত	স্থানীয়	আধুনিক

বিন্দি পাকরি ও মালসিরা

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	**জাতের নাম**	
	বিন্দি পাকরি	মালসিরা
দানার আকার	একটু ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	খয়েরি	গাঢ় খয়েরি
শীষে দানাবন্ধন	সামান্য হালকা	সামান্য ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

সালে ও মালসিরা

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	সালে	মালসিরা
দানার আকার	ছোট	বড়
দানার রঙ	খড় বর্ণ	খয়েরি
শীষে দানাবন্ধন	ঘন	সামান্য হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

পাটেশ্বরী ও মালসিরা

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	পাটেশ্বরী	মালসিরা
দানার আকার	দানা পুরু	সামান্য চ্যাপ্টা
দানার রঙ	গাঢ় খয়েরি	খয়েরি
শীষে দানাবন্ধন	হালকা	কম হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

চিনিগুড়া ও ব্রিধান–৩৪

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	চিনিগুড়া	ব্রিধান–৩৪
দানার আকার	সামান্য ছোট	সামান্য বড়
দানার রঙ	সোনালি	উজ্জ্বল সোনালি
শীষে দানাবন্ধন	সামান্য হালকা	ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	আধুনিক

ভোগগান্ধিয়া ও জটাকাটারি

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	ভোগগান্ধিয়া	জটাকাটারি
দানার আকার	সামান্য ছোট চ্যাপ্টা	পুরু ডিম্বাকার
দানার রঙ	খড় বর্ণ	সোনালি

শীষে দানাবন্ধন	হালকা	ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

বিআর—১ (চান্দিনা) ও যশোয়া

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	বিআর—১ (চান্দিনা)	যশোয়া
দানার আকার	ডিম্বাকার	সামান্য লম্বা
দানার রঙ	খড় বর্ণ	ধূসর খয়েরি
শীষে দানাবন্ধন	ঘন	সামান্য হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম
জাত	আধুনিক	স্থানীয়

রাজাভোগ ও শীলকমল (শীল কমর)

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	রাজাভোগ	শীলকমল
দানার আকার	একটু ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	খড় বর্ণ	গাঢ় খড় বর্ণ
শীষে দানাবন্ধন	সামান্য হালকা	ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

কালোজিরার উপজাত (শীষের শাখা-প্রশাখা)

শুঙসহ	হালকা খয়েরি;
শুঙবিহীন	গাঢ় খয়েরি, কালচে;
দানা	লম্বাটে, ডিম্বাকার;
শাখা-প্রশাখা	সোজা, বাঁকা;
রঙ পার্থক্য	কালচে থেকে খয়েরি আভাসহ সবুজাভ খড়বর্ণ পর্যন্ত অনেক রঙ।

কালিজরা ও চিনিগুড়া

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	কালিজিরা	চিনিগুড়া

দানার আকার	একটু ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	কালচে	উজ্জ্বল খড় বর্ণ
শীষে দানা বন্দন	সামান্য ঘন	সামান্য হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	একটু কম
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

কান্দিশাও, স্বর্ণা, পাজাম, দেশী কাটারি

দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম			
	কান্দিশাও	স্বর্ণা	পাজাম	দেশী কাটারি
আকার	মধ্যম	মধ্যম	মধ্যম	ছোট
আকৃতি	ডিম্বাকার	লম্বাটে, ডিম্বাকার	লম্বাটে, ডিম্বাকার	সরু
রঙ	গাঢ় খয়েরি	গাঢ় সোনালি	খয়েরি সোনালি	সোনালি

কান্দিশাও, কনকচুর, কালো কাটারি, ব্রিধান–৩২

দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম			
	কান্দিশাও	কনকচুর	কালো কাটারি	ব্রিধান–৩২
আকার	মধ্যম	মধ্যম বড়	ছোট	ছোট
আকৃতি	ডিম্বাকার	গোলাকার	ডিম্বাকার	সরু
রঙ	গাঢ় খয়েরি	ধূসর খয়েরি	কালো	সোনালি

ব্রিধান–৩৩ এবং পাজাম

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	ব্রিধান-৩৩	পাজাম
দানার আকার	ছোট	মধ্যম
আকৃতি	ডিম্বাকার	লম্বাটে ডিম্বাকার
রঙ	খড় বর্ণ	খয়েরি ভ্রূণ প্রান্তে হালকা

৮। স্থানীয় জাতের ধানের শীষ/উপশীষ ও দানাবিন্যাস বৈশিষ্ট্য (সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত)

শীষে দানার অবস্থান এবং স্পাইকের বিন্যাস মাটি/জাত/উপজাতগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল। এখানে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান স্থানীয় জাতসমূহের শীষের দানার অবস্থান বিন্যাস উল্লেখ করা হলো।

লোহাজং (Lohajang) **:** মধ্যম আকারের দানা, খড় বর্ণ, দানাবিন্যাস মধ্যম।

বেগুনবীচি (Begun bichi) : স্থানভেদে অন্যনাম রাজাভোগ, বাদশাভোগ। দানা ছোট, দানা বিন্যাস হালকা।

স্থানীয় বোরো (Local boro) : নেত্রকোনা এলাকার বোরো ধান, শুঙ আছে। উপশীষ খাটো দানাবিন্যাস মধ্যম ঘন।

দুধসর (Dudhsar) : বোনা আমন, দানাবিন্যাস হালকা, উপশাখার কাণ্ড সরু।

কনকচুড় (Kanakchur) : উপশীষ খাটো, দানাবিন্যাস খুন হালকা, শুঙ আছে, বোঁটা লম্বা।

কলম (Kolom) : উপশীষের গোড়ায় দানা কম। দানাবিন্যাস মধ্যম ঘন।

কালোজিরা (Kalojira) : বিভিন্ন উপজাতভেদে বৈশিষ্ট্য ভিন্ন।

বিন্নি (Binni), **নক্সা বিন্নি, লাল বিন্নি** : দানাবিন্যাস মধ্যম হালকা, দানায় বাদামি ছিটে দাগ আছে বলে নক্সা বিন্নি নামে পরিচিত। লাল বিন্নি লালচে খয়েরি। দানাবিন্যাস একই ধরনের।

দাড়িকাশাইল (Darika shail) : দানাবিন্যাস হালকা। বোঁটা লম্বা, গোড়ায় দানা কম। উপশাখা সরু, ছড়ানো।

বাঁশিরাজ (Banshi raj) : উপশাখার সংখ্যা বেশি। দানাবন্ধন ঘন, গোড়ার দিকে চিটা বেশি। ছড়ানো।

কাটারি ভোগ (Kataribhog) : উপশাখা লম্বা, সরু, দানাবিন্যাস ঘন। শীষ লম্বা।

কেলাডোমা (Keladoma) : দানা বিন্যাস মধ্যম হালকা, উপশাখা শক্ত, পরিপক্ব পর্যায়েও অনেকটা সবুজ থাকে।

বন্যধান (Wild rice), **বুরু ধান** : উপশাখায় দানাবিন্যাস খুবই ঘন, সবুজাভ খয়েরি রঙ। চিটা বেশি।

৯। স্থানীয় জাতের ধান শীষ/দানার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য (সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত)

বাদশাভোগ ও শুভরাজ ধান

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	**জাতের নাম**	
	বাদশাভোগ	শুভরাজ
দানার আকার	ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	সোনালি	খয়েরি সোনালি
শীষে দানা বিন্যাস	মধ্যম হালকা	মধ্যম ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	একটু কম
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

BANSDOC Library Dhaka

ভোগগান্ধিয়া ও শুঙধান (বোরো)

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	ভোগগান্ধিয়া	শুঙ ধান
দানার আকার	একটু ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	খড় বর্ণ	হালকা বড় বর্ণ
শীষে দানাবিন্যাস	হালকা	একটু ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	মধ্যম
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

উকুন মধু ও নয়ারাজ

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	উকুনে মধু	নয়ারাজ
দানার আকার	ছোট, গোলাকার	বড় ডিম্বাকার
দানার রঙ	ধূসর খয়েরি ছাপ	খয়েরি
শীষে দানাবিন্যাস	হালকা	মধ্যম ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

জিরাকাটারি ও শুভরাজ

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	জিরাকাটারি	শুভরাজ
দানার আকার	ছোট	বড়
দানার রঙ	সোনালি	খয়েরি সোনালি
শীষে দানাবিন্যাস	মধ্যম হালকা	মধ্যম ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

গন্ধরাজ ও কালোমেই

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	গন্ধরাজ	কালোমেই
দানার আকার	একটু ছোট	সামান্য বড়
দানার রঙ	কালচে	খয়েরি কালচে

শীষে দানাবিন্যাস	মধ্যম ঘন	মধ্যম হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

যশোয়া ও শীলকমল

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	যশোয়া	শীলকমল
দানার আকার	একটু ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	সোনালি খড় বর্ণ	খড় বর্ণ
শীষে দানাবিন্যাস	একটু হালকা	একটু ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

শুঙ কলম, কনকচুর ও সাপাহার

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম		
	শুংকলম	কনকচুর	সাপাহার
দানার আকার	ছোট, শুং আছে	মধ্যম, গোলাকার	মধ্যম ডিম্বাকার
দানার রঙ	হালকা খড় বর্ণ	ধূসর খয়েরি	খয়েরি
শীষে দানাবিন্যাস	হালকা	মধ্যম ঘন	মধ্যম ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	মধ্যম	মধ্যম
জাত	স্থানীয় (উপজাত)	স্থানীয়	স্থানীয়

যশোয়া ও নাসিমশাইল

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	যশোয়া	নাসিমশাইল
দানার আকার	একটু ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	সোনালি/খড় বর্ণ	খড় বর্ণ
শীষে দানাবিন্যাস	সামান্য হালকা	সামান্য ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

ঢেপা ও জটাকাটারি

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	ঢেপা	জটাকাটারি
দানার আকার	একটু বড়	একটু ছোট

দানার রঙ	খড় বর্ণ	সোনালি/খড় বর্ণ
শীষে দানাবিন্যাস	মধ্যম হালকা	মধ্যম ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	স্থানীয়

১০। আধুনিক উফশী জাতের বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশে চাষকৃত উচ্চ ফলনশীল ধানের জাতসমূহের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. ধানের পাতা ঘন সবুজ ও পুরু।
২. গাছে পাতা এমনভাবে সাজানো থাকে যেন, একটি পাতা আরেকটিকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে রাখে না।
৩. ধানের গাছ খাটো ও শক্ত গড়নের।
৪. অধিকতর হারে মাটি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করতে পারে।
৫. ধান পাকার সময়ও কিছু কিছু পাতা সবুজ থাকে।
৬. উৎপাদিত ধানের ওজন ও খড়ের ওজনের অনুপাত গড়ে প্রায় ১ঃ ১।
৭. রোগ, পোকা, খরা ও অতিরিক্ত ঠাণ্ডার কম-বেশি প্রতিরোধক।
৮. ধানের ফলন অপেক্ষাকৃত বেশি হয়ে থাকে।

১১। উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান, উৎপাদন মৌসুম ও ফলন

নাম	নম্বর	মৌসুম	ফলন (টন/হেক্টর)
চান্দিনা	বিআর ১	বোরো, আউশ	৪.৫ – ৬.৫
মালা	বিআর ২	বোরো, আউশ	৩.৫ – ৫.৫
বিপ্লব	বিআর ৩	বোরো, আউশ	৪.৫ – ৬.৫
ব্রিশাইল	বিআর ৪	রোপা আমন	৫.৫ – ৬.৫
দুলাভোগ	বিআর ৫	বোরো, আউশ	২.২ – ২.৮
বিআর ৬	আই আর ২৮	বোরো, আউশ	৩.০ – ৪.০
ব্রিবালাম	বিআর ৭	বোরো, আউশ	৩.৫ – ৪.৫
আশা	বিআর ৮	বোরো, আউশ	৪.৫ – ৫.৫
সুফলা	বিআর ৯	বোরো, আউশ	৩.৫ – ৪.৫
প্রগতি	বিআর ১০	রোপা আমন	৫.৫ – ৬.৫
মুক্তা	বিআর ১১	বোরো, আউশ	৫.৫ – ৬.৫
ময়না	বিআর ১২	বোরো, আউশ	৪.০ – ৫.০

গাজী	বিআর ১৪	বোরো , আউশ	৫.০ – ৬.৫
মোহিনী	বিআর ১৫	বোরো , আউশ	৪.০ – ৫.৫
শাহীবালাম	বিআর ১৬	বোরো , আউশ	৪.০ – ৬.০
হাসি	বিআর ১৭	বোরো	৪.৫ – ৫.৫
শাহজালাল	বিআর ১৮	বোরো	৫.০ – ৬.০
মঙ্গল	বিআর ১৯	রূপা আমন	৫.০ – ৬.০
নিজামী	বিআর ২০	বোরো , আউশ	৩.০ – ৪.০
নিয়ামত	বিআর ২১	বোরো , আউশ	৩.০ – ৪.০
কিরণ	বিআর ২২	রোপা আমন	৪ – ৫
দিশারী	বিআর ২৩	রোপা আমন	৩.৫ – ৫.৫
রহমত	বিআর ২৪	বোরো , আউশ	২.৫ – ৩
নয়াপাজাম	বিআর ২৫	রোপা আমন	৪ – ৫
শ্রাবণী	বিআর ২৬	বোরো , আউশ	৪ – ৪.৫
ব্রিধান ২৭	বিআর ২৭	আউশ	৩ – ৪
ব্রিধান ২৮	বিআর ২৮	বোরো	৪.৫ – ৫
ব্রিধান ২৯	বিআর ২৯	বোরো	৫ – ৫.৫
ব্রিধান ৩০	বিআর ৩০	রোপা আমন	৪ – ৪.৫
ব্রিধান ৩১	বিআর ৩১	রোপা আমন	৪.৫ – ৫.০
ব্রিধান ৩২	বিআর ৩২	রোপা আমন	৫ – ৬
ভরসা	বি এ ইউ ৬৩	আমন	৪.৫ – ৫.০
ইরাটম ২৮	ইরাটন ২৮	বোরো, আউশ	৪.৫ – ৫.৫
আইআর ৫	আইআর ৫	রোপা আমন	৬.০ – ৭.০
আইআর ৮	আইআর ৮	রোপা আমন	৩.৫ – ৬.৫
ইরিশাইল	আইআর ২০	রোপা আমন	৩.৫ – ৪.৫
বিনাশাইল	–	রোপা আমন	৩.৫ – ৪.৫
পূর্বাচী	চীনা ধান	বোরো, আউশ	৪.৫ – ৫.৫

১২। উফশী ধান জাতের পূর্ব বংশ

রোপা আমন ধান

জাত	কোড/ কৌলিক সারি	অনুমোদন সাল
চান্দিনা	বিআর ১ আইআর ৫৩২ –১ –১ – ১৭৬	১৯৭০
মালা	বিআর ২ আইআর ২৭২– ৪ –১– ১	১৯৭১
বিপ্লব	বিআর ৩ বিআর ২৭– ১০– ১	১৯৭৩
ব্রিশাইল	বিআর ৪ বিআর ৫১– ৯১– ৬	১৯৭৫
দুলাভোগ	বিআর ৫ প্রাকৃতিক	১৯৭৬
বি আর ৬	বিআর ৬, আই আর ২৮ আইআর ২০৬১– ২১৪– ৩– ৮ –২	১৯৭৪ – ১৭৭৬
ব্রিবালাম	বিআর ৭ আইআর ২০৫৩– ৮– ৭– ৩–১	১৯৭৪–১৯৭৬
আশা	বিআর ৮ বিআর ১৬৭–২–বি ৯	১৯৭১–১৯৭৮
সুফলা	বিআর ৯ বিআর ১৬৯–১–১	১৯৭১–১৯৭৮
প্রগতি	বিআর ১০	১৯৭০–১৯৮০
মুক্তা	বিআর ১১	১৯৭০–১৯৮০
ময়না	বিআর ১৬১–২ইবি–৫৮	১৯৮৩
গাজী	বিআর ১৪ বিআর ৩১৯–১	১৯৮৩
মোহিনী	বিআর ১৫ আই আর ২০৭১–১৯৯–৩–৬	১৯৮৩
শাহীবালাম	বিআর ১৬ আই আর ২৭৯৩–৮০–১	১৯৮৩
হাসি	বিআর ১৭ (ফিল) আর পি কে এন	১৯৭৮–১৯৮৫
শাহজালাল	বিআর ১৮ বিআর ৫৪১ বি–কে এন–২২–২	১৯৭৭–১৯৮৫
মঙ্গল	বিআর ১৯ বিআর ২৩৬০–২–৩–১–৯ এমআর ১	১৯৭৮–১৯৮৫
নিজামী	বিআর ২০ বিআর ২০১–১৯৩–১	১৯৭৩–১৯৮৬
নিয়ামত	বিআর ২১ বিআর ১৬৫৬–২২–১	১৯৭৮–১৯৮৬
কিরণ	বিআর ২২ বিআর ৫৩৯–১৭–৪–৩–৩–১	১৯৮১–১৯৮
দিশারী	বিআর ২৩ বিআর ২৯০–৩–৩–৫	১৯৮৮
রহমত	বিআর ২৪ বিআর ২৯০–৩–৩–৫	১৯৮১–১৯৯২
নয়াপাজাম	বিআর ২৫	১৯৯২

শ্রাবণী	বিআর ২৬ আইআর ৪৪৫–৯৫–৭০–২–২–৩	১৯৮৮–১৯৯৩
ব্রিধান ২৭	বিআর ১৮৯০–১০–২–১–১	১৯৭৮–১৯৯৪
ব্রিধান ২৮	বিআর ১৮৯০–১০–২–১–১	১৯৭৯–১৯৯৪
ব্রিধান ২৯	বিআর ৮০২–১১৮–৪–২৬	১৯৭৭–১৯৯৪
ব্রিধান ৩০	বিআর ৮৫০–২২–১–৪	১৯৭৮–১৯৯৪
ব্রিধান ৩১	বিআর ১৭২৫–১৩–৭–১–৬	১৯৮১–১৯৯৪
ব্রিধান ৩২	বিআর ৪৩৬৩–৩–৮–১–২–৪	১৯৯৪
আইআর ৫	–	১৯৬৬
আইআর ৮	–	১৯৬৯
ইরিশাইল	আইআর ২০	১৯৬৮
পূর্বাচী	–	১৯৭৫
ইরাটম ২৪	–	১৯৮৭
বিনাশাইল •	–	–
ভরসা	বাউ–৬৩	–
	বাউ–১৬	–

১৩। উফশী ধান জাতের প্রজননে ব্যবহৃত পূর্ব বংশের পরিচিতি

জাত	প্রজননে ব্যবহৃত পূর্ব বংশ		
চান্দিনা	পেটা টাইচুং নেটিভ–১	টিকেএম–৬	
মালা	সিপি–২৩১	এস এলও ১৭	সিগাডিস–এ
বিপ্লব	আই আর ৫০৬–১৩৩	লতিশাইল	–
ব্রিশাইল	আই আর ২০	আই আর ৫–১১৪–৩–১	
দুলাভোগ	বাদশাভোগ	স্থানীয় বোরো	(প্রাকৃতিক–সঙ্করায়ণ)
বিআর ৬	বিআর ৬	আই আর ২৮	আই আর ২০৬১–২১৪–৩–৮–২
ব্রিবালাম	বিআর ৭ আই আর ২০৫৩–৮৭–৩–১	–	–
আশা	আই আর ২৭২–৪–১–২ জে ১	আই আর ৩০৫—৩–১৭–১–৩	–

সুফলা	আই আর ২৭২–৪–১–২ জে ১	আই আর ৮	–
প্রগতি	আইআর ৫	আইআর ২০	
মুক্তা	আইআর ২০	আইআর ৫	–
ময়না	চান্দিনা (বিআর–১)	আইআর ৪২৫– ১– ৩– ৮– ৩	–
গাজী	আইআর ৫	বিপ্লব (বিআর ৩)	
মোহিনী	–	–	–
শাহীবালাম	–	–	–
হাসি	জিরাক (ইন্দোনেশিয়া)	আইআর ৮	–
শাহজালাল	পেলিটা ১–১ (ইন্দোনেশিয়া)	আইআর ১১০৮– ২	–
মঙ্গল	আইআর ২১৮০–২ (ইন্দানেশিয়া)	আইআর ২১৭৮–	–
নিজামী	আইআর ২৭২–১– ২ জে ১	আইআর ৫ (২৬৮)	–
নিয়ামত	সি ২২ (ফিলিপাইন)	আইইটি ১৪৪৪	–
কিরণ	নাইজারশাইল	বিআর ৫১– ৪৬– ৫	–
দিশারী	ডি– ২৯	ব্রিশাইল (বিআর ৪)	–
রহমত	সি ২২ (ফিলিপাইন)	আইআর ৯৭৫২–১৩৬– ২	–
নয়াপাজাম	পাজাম	আইআর ২৬	–
শ্রাবণী	আইআর ১৮৩৪৮– ৩৬– ৩– ৩০	আইআর ২৫৮৬০– ৬১– ৬১– ৩– ২	আইআর ৫৮
ব্রিধান ২৭	কে এন বি– ৩৬১– ১– ৮– ৬– ৭ (ইন্দোনেশিয়া)	সি ১৬৮ (ফিলিপাইন)	–
ব্রিধান ২৮	বিআর ৬	পূর্বাচী	–
ব্রিধান ২৯	বিজি ৯০–২ (শ্রীলংকা)	বিআর ৫১–৪৬–৫	–
ব্রিধান ৩০	বিআর ৪	আইআর ৪৬	–
ব্রিধান ৩১	বিআর ১১	এ আরমি ১০৫৫০ (ভারত)	–
ব্রিধান ৩২	বিঅর ৪	বিআর ২৬৬২–৩	–
আইআর ৫	পেটা	টোংকাইরোটান	–
আইআর ৮	ডিজিউজেন	পেটা	–
হরিশাইল	পেটা	টাইচংনেটিভ ১	টিকেএস ৬
পূর্বাচী	–		–
ইরাটম ২৪	–		–

উচ্চ ফলনশীল ধান জাতের বংশ পরিচয়

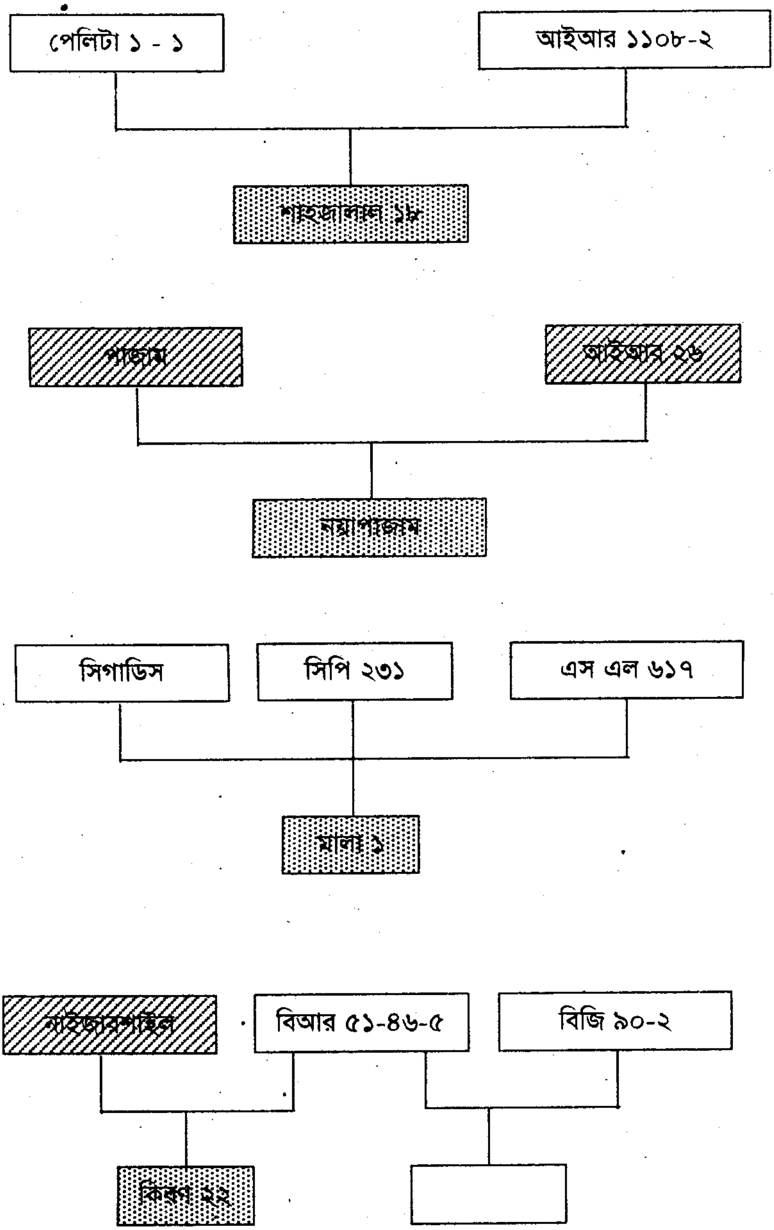

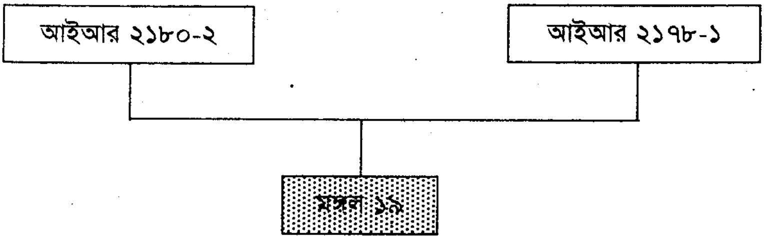

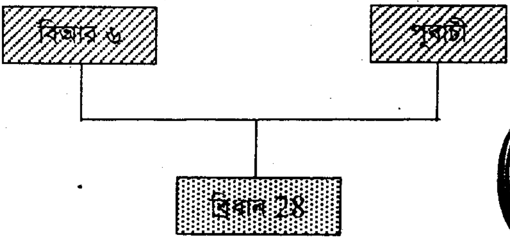

BANSDOC Library Dhaka

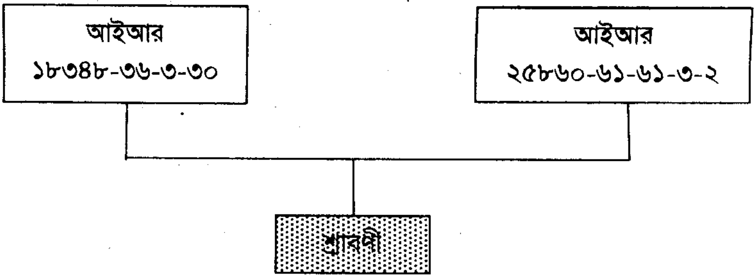

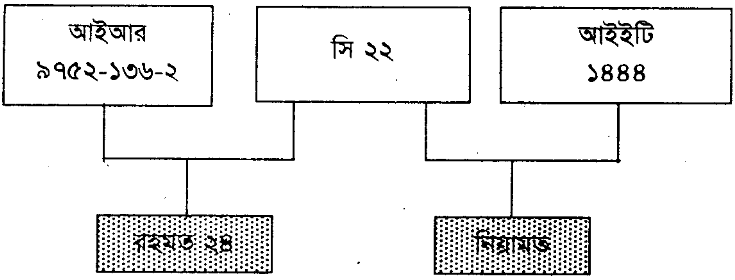

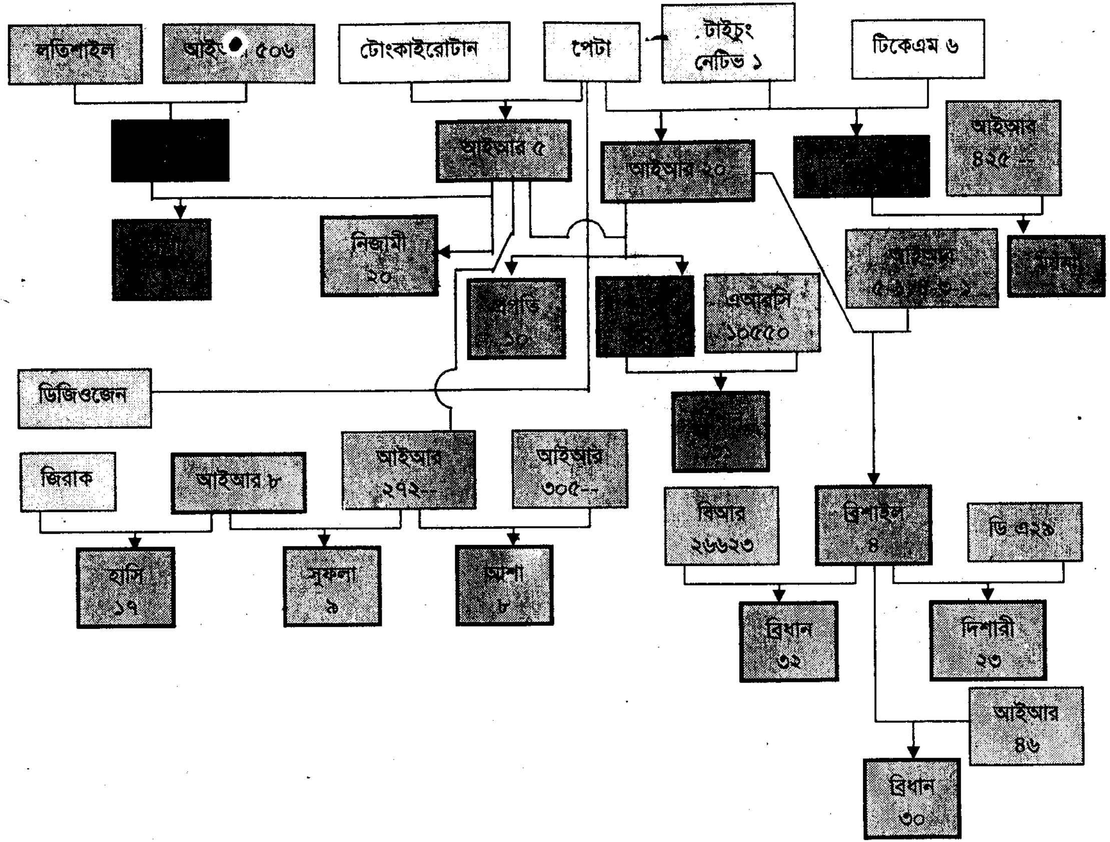
লতিশাইল
টোংকাইরোটান
পেটা
টাইচুং নেটিভ ১
টিকেএম ৬
আইআর ৫
আইআর ২০
আইআর ৪২৫ --
নিজামী ২০
এআরসি ১০৫৫০
ডিজিওজেন
জিরাক
আইআর ৮
আইআর ২৭২--
আইআর ৩০৫--
বিআর ২৬৬২৩
ব্রিশাইল ৪
ডি এ২৯
হাসি ১৭
সুফলা ৯
আশা ৮
ব্রিধান ৩২
দিশারী ২৩
আইআর ৪৬
ব্রিধান ৩০

১৪। উফশী ধান জাত

বাংলাদেশের অনুমোদিত উচ্চ ফলনশীল (উফশী) ধানের চাষ ব্যাপক উৎপাদনশীল হওয়ায় এসব জাতের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সংশ্লিষ্ট ধান জাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে উল্লেখ করা হলো। (সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত)

বিআর–১ (BR-1) **চন্দিনা**	কুশি মধ্যম প্রকৃতির, গাছ বেশি লম্বা নয়।
বিআর–২ (BR-2) **মালা**	কুশি একটু কম, গাছ উচুঁ।
বিআর–৩ (BR-3) **বিপ্লব**	কুশি বেশি, গাছ খাটো।
বিআর–৬ (BR-6)	গাছ মধ্যম লম্বাটে।
বিআর–৭ (BR-7) **ব্রিবালাম**	গাছ লম্বাটে, হালকা সবুজ।
বিআর-৮ (BR-8) **আশা**	গাছ ও কুশি মধ্যম।
বিআর–৯ (BR-9) **সুফলা**	গাছ মধ্যম লম্বা, শীষ বড়।
বিআর–১০ (BR-10) **প্রগতি**	শীষের চেয়ে নিশান পাতা উচুঁ সবুজ।
বিআর–১২ (BR-12) **ময়না**	গাছ মধ্যম, গোড়া নীল।
বিআর–১৪ (BR-14) **খাজী**	আগাম ফুল আসে, গাছ একটু ছড়ানো, দানায় শুঙ আছে।
বিআর–১৫ (BR-15) **মোহনী**	গাছ লম্বাটে, হালকা সবুজ।
বিআর–১৬ (BR-16) **শাহী বালাম**	কুশি বেশি গাছ ছড়ানো।
বিআর–১৭ (BR-17) **হাসি**	গাছ লম্বাটে।
বিআর–১৮ (BR-18) **শাহজালাল**	গাছ লম্বাটে, নিচু জমিতে বোনা যায়।
বিআর–১৯ (BR-19) **মঙ্গল**	গাছ লম্বাটে, কুশি বেশি।
ব্রিধান-২৮ (BRRI dhan-28)	গাছ মধ্যম উঁচু, খাড়া, কুশি বেশি।
ব্রিধান–৩০ (BRRI dhan-30)	গাছ উঁচু খাড়া, কুশি মধ্যম।
ব্রিধান–৩৬ (BRRI dhan-36)	গাছ খাটো, গাঢ়, সবুজ, কুশি ছড়ানো।
আই-আর-৮ (IR-8)	গাছ খাটো, কুশি বেশি।
আই-আর-৯ (IR-9)	গাছ লম্বাটে, নিশান পাতা ছোট।
আই-আর-৬৪ (IR-64)	কুশি বেশি ছড়ানো।
সঙ্কর ধান (Hybrid rice) **আলোক**	গাছ মধ্যম উঁচু, কুশি বেশি, গাছ সবুজ।

Dhaka

১৫। উফশী জাতের ধান দানার বৈশিষ্ট্য

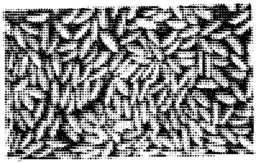

বিআর–৪ (BR-4)

১. ধান মধ্যম মোটা;
২. বর্ণ হালকা খড় বর্ণ;
৩. দানা সমরূপ সরু।

বিআর–৫ (BR-5)

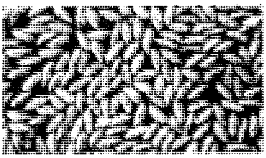

১. ধান মধ্যম ছোট;
২. দানা খড় বর্ণের খয়েরি আভাযুক্ত;
৩. দানা ডিম্বাকার।

বিআর–১১ (BR-11) মুক্তা

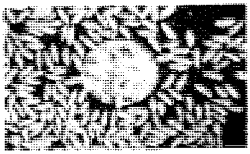

১. দানার আকার মধ্যম;
২. দানার বর্ণ খড় বর্ণ;
৩. ভ্রূণপ্রান্ত ক্রম সরু।

বিআর–১২ (BR-12) ময়না

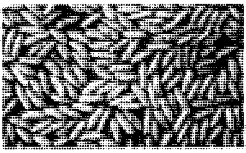

১. ধানের দানা মধ্যম সরু ও খড় বর্ণের;
২. ভ্রূণ প্রান্তের উপাঙ্গ স্পষ্ট।

বিআর–১৬ (BR-16)

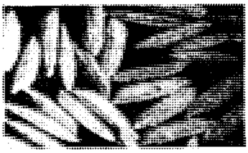

১. দানা উজ্জ্বল খড় বর্ণের;
২. ধান সরু লম্বাটে;
৩. দানার আকার মধ্যম।

বিআর–১৭ (BR-17) হাসি

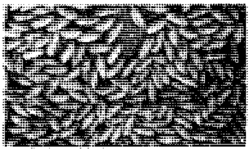

১. দানার আকার মধ্যম;
২. দানার বর্ণ হালকা খড় বর্ণ;
৩. দানার ভ্রূণপ্রান্ত ক্রম সরু।

বিআর–১৮ (BR-18)

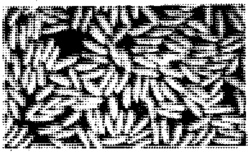

১. দানা সরু, লম্বা ও খড় বর্ণের;
২. সামান্য শুঙ থাকতে পারে।

বিআর–২২ (BR-22)

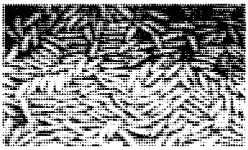

১. দানা মধ্যম সরু;
২. ভ্রূণ প্রান্তে উপাঙ্গে সামান্য ফাঁক আছে;
৩. লেজ প্রান্ত সামান্য বাঁকা।

বিআর–২৫ (BR-25)/পাজাম (Pajam)

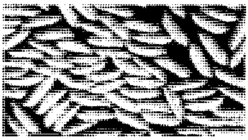

১. দানার রঙ খয়েরি লাল;
২. ভ্রূণ প্রান্তে দানার রঙ সামান্য হালকা;
৩. দানার আকার মধ্যম ছোট।

বিআর–২৬ (BR-26) শ্রাবণী

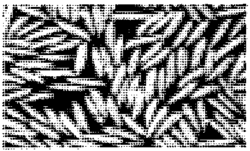

১. দানা সরু, লম্বা;
২. দানার শেষ প্রান্ত সামান্য বাঁকা;
৩. দানার রঙ উজ্জ্বল খড় বর্ণ।

ব্রিধান–২৯ (Brridhan-29)

১. দানা খড় বর্ণ;
২. ধান মধ্যম স্থূল;
৩. দানা কিছুটা লম্বাটে।

ব্রিধান-৩০ (Brridhan-30)

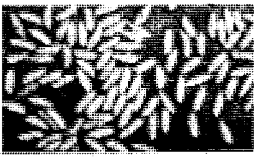

১. ধান মধ্যম ছোট;
২. দানা লালচে খড় বর্ণ;
৩. দানা সরু।

ব্রিধান–৩২ (Brridhan-32)

১. দানা উজ্জ্বল খড় বর্ণ;
২. ভ্রূণ প্রান্তের উপাঙ্গ স্পষ্ট;
৩. দানা মধ্যমাকার, লম্বাটে।

ব্রিধান–৩৪ (Brridhan-34)

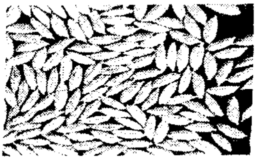

১. দানা ছোট;
২. লেজ প্রান্ত ক্রম সরু;
৩. দানার খড় বর্ণ।

বিধান–৩৭ (Brridhan-37)

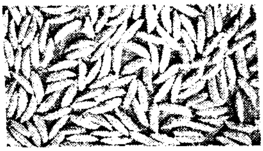

১. দানা সরু লম্বা;
২. দানা সামান্য বাঁকানো;
৩. দানা খড় বর্ণ।

ব্রিধান–৩৯ (Brridhan-39)

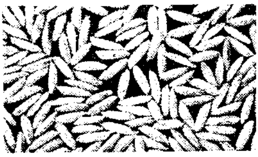

১. দানা সরু, লম্বাটে;
২. দানা মধ্যমাকার;
৩. দানা হালকা খড় বর্ণ।

পূর্বাচী (Purbachi) বা চায়না ইরি

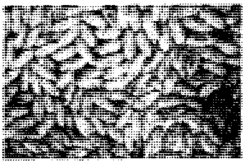

১. দানা মোটা ডিম্বাকার;
২. দানা খড় বর্ণ;
৩. ভ্রূণ উপাঙ্গ স্পষ্ট।

স্বর্ণা (Sharna)

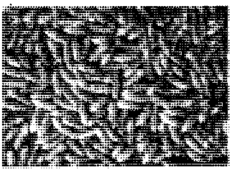

১. দানার বর্ণ সোনালি;
২. ভ্রূণ প্রান্তে দানার রঙ সামান্য হালকা;
৩. দানা মধ্যম ছোট।

ফিল কাটারী (Phil-Katari)

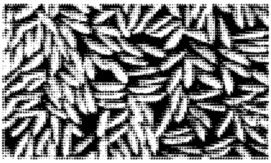

১. দানার রঙ উজ্জ্বল খড় বর্ণ থেকে সোনালি;
২. দানার লেজ প্রান্ত ক্রম সরু;
৩. দানা সরু লম্বাটে;
৪. দানা মধ্যম ছোট বা ছোট।

সঙ্কর ধান অমর শ্রী

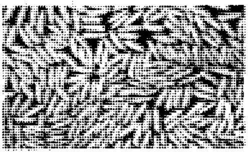

১. দানা খুব সরু লম্বা;
২. দানার লেজ প্রান্ত লম্বাটে বাঁকানো;
৩. দানার রঙ খড় বর্ণ।
৪. দানা মধ্যম আকারের।

সঙ্কর ধান – আর এফ-১ (RF-1, hybrid)

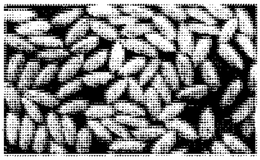

১. দানা মধ্যম মোটা;
২. ভ্রূণ উপাঙ্গ স্পষ্ট;
৩. দানা হালকা খড় বর্ণ।

সঙ্কর ধান – এইচ এফ এল এস-১ (HFLSC-1, hybrid)

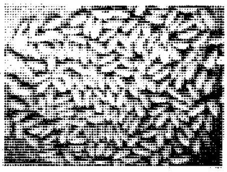

১. দানা ছোট;
২. দানা ডিম্বাকার;
৩. দানা উজ্জ্বল খড় বর্ণ।

সঙ্কর ধান সিএন-৬ (CN-SGC-6, hybrid)

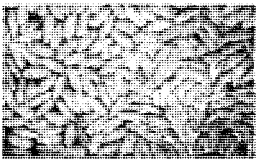

১. ধানের দানা মোটা;
২. দানা খড় বর্ণ;
৩. দানা অনেকটা ডিম্বাকার।

সঙ্কর ধান – এইচ এফ এল এস-৩ (HFLSC-3 hybrid

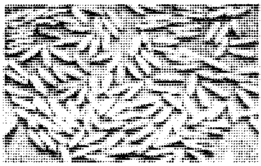

১. দানা মধ্যম সরু লম্বাটে;
২. দানার আকার মধ্যম;
৩. দানা খড় বর্ণ;
৪. তুষে ফাটল থাকতে পারে।

আই আর-৫০ (IR-50)

১. দানা সরু লম্বাটে;
২. দানার আকার মধ্যম;
৩. দানা হালকা খড় বর্ণ।

ইরাটম-২৮ (IRATOM-28), বিনা ধান

১. দানা মোটা;
২. আকৃতিতে সামান্য লম্বাটে;
৩. দানা খড় বর্ণ।

১৬। উফশী জাতের ধান ফসলের তুলনামূলক পার্থক্য

বিভিন্ন জাত : ফসলের পরিপক্বতা পর্যায়, গাছের উচ্চতা, কাঠামো, পল্লব ইত্যাদি বিবেচনায় প্রতিটি জাতই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যধারী - গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত রঙিন চিত্রে পর্যবেক্ষিত হতে পারে।

বিআর-১৯ এবং ব্রিধান-২৮

বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	বিআর-১৯ (মঙ্গল)	ব্রিধান-২৮
পরিপক্বতা	নাবী	আগাম
গাছের উচ্চতা	কম	বেশি
কুশি উৎপাদন	মধ্যম	বেশি

ব্রিআর-৯ (সুফলা) এবং বিআর-১২ (ময়না)

বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	বিআর-১৯ (সুফলা)	বিআর-২২ (ময়না)
গাছের উচ্চতা	বেশি	কম
ফলন	আগাম	কিছুটা নাবী
গাছের গোড়া	সবুজ	নীল

বিআর-৬ এবং বিআর-৭ (ব্রিবালাম)

বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	বিআর-৬	বিআর-৭ (ব্রিবালাম)
গাছের উচ্চতা	বেশি	কম
ফুল উৎপাদন	আগাম	নাবী
কুশি	বেশি	মধ্যম
গাছের কাঠামো	শক্ত	মধ্যম

হবিগঞ্জ-৪ এবং হবিগঞ্জ-৮

বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	HBJ.B. IV	HBJ. B. VIII
গাছের উচ্চতা	কিছুটা বেশি	কিছুটা কম
ফুল উৎপাদন	কিছুটা আগাম	কিছুটা নাবী
গাছের গড়ন	নরম	মধ্যম

বিআর-৩ বিপ্লব এবং বিআর-৬

বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	বিআর-৩ বিপ্লব	বিআর-৬
গাছের উচ্চতা	কম	বেশি
ফুল উৎপাদন	পরে	আগে
কুশি	বেশি	মধ্যম
গাছের গড়ন	শক্ত	মধ্যম

ব্রিধান-৩৫ এবং ব্রিধান-৩৬

বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	ব্রিধান-৩৫	ব্রিধান-৩৬
ফুল উৎপাদন	কিছুটা পরে	কিছুটা আগে
গাছের উচ্চতা	কিছুটা বেশি	কিছুটা কম
কুশি	মধ্যম	বেশি

বিআর-২ (মালা) এবং বিআর-১৮

বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	বিআর-২ (মালা)	বিআর-১৮
গাছের উচ্চতা	বেশি	কম
কুশি	বেশি	মধ্যম
পল্লব	বেশি	কম

ব্রিধান-২৮ এবং ব্রিধান-১৯

বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	ব্রিধান-২৮	ব্রিধান-২৯
ফুল উৎপাদন	আগে	পরে

গাছের উচ্চতা	কিছুটা বেশি	কিছুটা কম
কুশি	মধ্যম	বেশি
পাতা	গাঢ় সবুজ	সবুজ

১৭। উফশী/আধুনিক জাতের ধান শীষের তুলনামূলক পার্থক্য (সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত)

বিআর-১৪ (গাজী) এবং ব্রিধান-৩৯

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	**জাতের নাম**	
	বিআর-১৪ (গাজী)	ব্রিধান-৩৯
দানার আকার	বড়, শুঙ আছে	কিছুটা ছোট, ডিম্বাকার
দানার রঙ	খড় বর্ণ	সোনালী
শীষে দানাবন্ধন	মধ্যম ঘন	ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	একটু কম	একটু বেশি
জাত	আধুনিক	আধুনিক

বেগুনবীচি ও বাউ-২

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	**জাতের নাম**	
	বেগুন বীচি	বাউ-২
দানার আকার	ছোট	মধ্যম
দানার রঙ	সোনালি	ধূসর খয়েরি
শীষে দানাবিন্যাস	মধ্যম ঘন	কিছুটা হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	কম
জাত	স্থানীয়	আধুনিক

ব্রিধান-৩৯ ও সোনাশাইল

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	**জাতের নাম**	
	ব্রিধান-৩৯	সোনাশাইল
দানার আকার	একটু মোটা	একটু ছোট
দানার রঙ	উজ্জ্বল খড় বর্ণ	সোনালী
শীষে দানাবিন্যাস	ঘন	একটু হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	বেশি	একটু কম
জাত	আধুনিক	স্থানীয়

সোনাশাইল ও নয়াপাজাম

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	সোনাশাইল	নয়াপাজাম
দানার আকার	লম্বা ডিম্বাকার, একটু ছোট	একটু বড়, ডিম্বাকার
দানার রঙ	সোনালী	গাঢ় সোনালী
শীষে দানাবিন্যাস	একটু হালকা	মধ্যম ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	আধুনিক

যাদু ও ব্রিধান-৩২

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	যাদু	ব্রিধান-৩২
দানার আকার	ছোট	বড়
দানার রঙ	খড় বর্ণ	একটু গাঢ় খড় বর্ণ
শীষে দানাবিন্যাস	হালকা	ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	আধুনিক

ব্রিধান-৩০ এবং বিআর-১১ / মুক্তা

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	ব্রিধান-৩০	বিআর-১১ (মুক্তা)
দানার আকার	একটু ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	উজ্জ্বল খড় বর্ণ	খড় বর্ণ
শীষে দানাবিন্যাস	একটু হালকা	ঘন
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	স্থানীয়	আধুনিক

বিআর-৩ (বিপ্লব) ও ব্রিধান-৩০

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	জাতের নাম	
	বিআর-৩ (বিপ্লব)	ব্রিধান-৩৩
দানার আকার	সামান্য বড়	সামান্য ছোট
দানার রঙ	খড় বর্ণ	উজ্জ্বল খড় বর্ণ

শীষে দানাবিন্যাস	মধ্যম ঘন	মধ্যম হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	আধুনিক	আধুনিক

বিআর-১০ (প্রগতি) ও বিনা-১ ধান

শীষ/দানার বৈশিষ্ট্য	**জাতের নাম**	
	বিআর-১০ (প্রগতি)	বিনা-১
দানার আকার	একটু ছোট	একটু বড়
দানার রঙ	উজ্জ্বল খড় বর্ণ	হালকা সোনালি
শীষে দানাবিন্যাস	সামান্য হালকা	মধ্যম হালকা
দানার সংখ্যা/শীষ	কম	বেশি
জাত	আধুনিক	আধুনিক

১৮। উফশী ধান দানায় তুলনামূলক পার্থক্য (সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত)

ব্রিধান-৩৯ ও ব্রিধান-১২

ব্রিধান-৩১ : দানা মোটা, হালকা খড় বর্ণ।

বিআর-১২ : দানা সরু।

বিআর-১৪ বিআর-৭

বিআর-১৪ (গাজী) : দানা মধ্যম মোটা, শুঙ আছে।

বিআর-৭ (ব্রিবালাম) : দানা সরু, শুঙ নাই।

বিআর-৮ এবং বিআর-৯

বিআর-৮ : দানা একটু লম্বাটে, মধ্যম সরু।

বিআর-৯ (সুফলা) : দানা সরু, সামান্য শুঙ থাকতে পারে।

ব্রিধান-২৯ ব্রিধান-৩৪

ব্রিধান-২৯ : দানা সরু লম্বা।

ব্রিধান-৩৪ : দানা ছোট, প্রান্ত ক্রমসরু।

বিআর-৪ এবং ব্রিধান-৩৮

বিআর-৪ : দানা সরু, লম্বাটে, শুঙ থাকতে পারে।

ব্রিধান-৩৮ : দানা মধ্যম, লম্বাটে ডিম্বাকার।

বিআর-১০ (প্রগতি) এবং বিআর-৫

বিআর-১০ : দানা ডিম্বাকার।

বিআর-৫ : দানা মধ্যম সরু, লম্বাটে।

বিআর-১৮ এবং ব্রিধান-২৮

বিআর-১৮ : ভ্রূণ প্রান্ত ক্রম সরু, দানা সরু।

ব্রিধান-৩৮ : দানা খুব সরু, ২ থেকে ১টা শুং থাকতে পারে।

ব্রিধান-৩২ এবং ব্রিধান-৩৯

ব্রিধান-৩২ : দানা লম্বাটে, মধ্যম সরু।
ব্রিধান-৩৯ : দানা সরু মধ্যম লম্বাটে।

বিআর-১৭ এবং ব্রি-১৯

বিআর-১৭ : দানার মধ্যম মোটা, লম্বাটে, ডিম্বাকার।
বিআর-১৯ : দানা সরু, মধ্যম লম্বা।

১৯। ধানের উচ্চ ফলনশীল সম্ভাবনাময় সারি

বর্তমানে ধান গবেষণায় অতি উচ্চ বা সুপার জাত উদ্ভাবনের জন্য বহু সারি ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব সারি সরাসরি অনুমোদন দেওয়াসহ উচ্চ ফলনশীল কম্পোজিট জাত এবং সঙ্কর (hybrid) জাত উদ্ভাবনে সহায়ক হতে পারে। এসব সারির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে দেওয়া হলো এগুলোর প্রায় সবই উচ্চ ফলনশীল। এ সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজন করা হয়েছে।

১. IR-504048 : উঁচু, মধ্যম, আগাম।
২. BR736-R : মধ্যম উঁচু, আগাম।
৩. IR-62030-R : খাটো, অতি আগাম।
৪. BR-5877-21-23 ও IR-8 : IR-8 এর চেয়ে অন্যটি লম্বা ও আগাম।
৫. IR-628294 : খাটো, রোগপ্রবণ।
৬. BR-4828-54-4-1-4-9 : গড়ন দৃঢ়, কুশি বেশি, পল্লবিত।
৭. IR-58025-A : মধ্যম খাটো, আগাম পাকে।
৮. IR-54742-22-19-34 R : গাছ লম্বা, কিছুটা নাবী।
৯. AJAYA-R : মধ্যম খাটো, কুশি বেশি, আগাম।
১০. IR-46-R : মধ্যম খাটো, কুশি বেশি, আগাম।
১১. BRRI dhan-363.
১২. BR 4828-54-41-49.
১৩. IR-558388-2-3-2-3-R : গাছ লম্বা, নাবী।
১৪. IR-30404-R : খাটো, আগাম।
১৫. ব্রি-সুপার ধানের উদাহরণ : ফলন ৭ টন/হেক্টর পর্যন্ত।
১৬. থাই ধানের কৌলিক সারি : গাছ উচুঁ, কালচে, পাতা বড়, শীষ বড়।

চতুর্থ অধ্যায়

ধান জাতের ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য

১। উন্নত রোপা আমন ধান জাতের কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

জাত	গুছিতে কুশি বা শীষের সংখ্যা	শীষের দৈর্ঘ্য (সে.মি.)	প্রতি শীষে ধানের সংখ্যা
বিপ্লব ৩	১২– ১৫	১৭–২২	৯৫– ১০০
ব্রিশাইল ৪	১০– ১২	২০– ২৫	১২০–১৩০
দুলাভোগ ৫	৯– ১০	১৫– ২০	১৫৫– ১৬০
প্রগতি ১০	৯–১২	১৫–২২	১২০–১৪০
মুক্তা ১১	১০–১৩	১৭–২২	১১৫–১৩০
কিরণ ২২	৮– ১০	২৫– ৩০	১২০– ১৩০
দিশারী ২৩	৮– ১০	২৫– ৩০	১১০– ১২০
নয়া পাজাম ২৫	৭– ৮	২৫ – ২৮	১১০– ১২০
ব্রিধান ৩০	৮– ১০	২০–২৫	১১০–১২৫
ব্রিধান ৩১	৮– ১০	২০–২৫	১০০–১১০
ব্রিধান ৩২	১২–১৫	১৮–২১	১৬০–১৭০
আইআর ৫	১২– ১৪	১৫–১৯	১০৬–১৩০
ইরিশাইল আইআর– ২০	১৮– ২০	১৭–২০	১২০–১৪০
বিনাশাইল	১৩–১৪	২০–২২	১২৫–১৩৫

২। উন্নত রোপা আমন ধান জাতের ফলন বৈশিষ্ট্য

জাত	হাজার বীজের ওজন (গ্রাম)	ফলন (টন/হেক্টর)
বিপ্লব ৩	২৩– ২৫	৫.০–৫.৫
ব্রিশাইল ৪	২০–২৫	৫.৫– ৬.৫
দুলাভোগ ৫	১৭–২০	২.৫– ৩.৫
প্রগতি ১০	২২–৫৫	৫.৫– ৬.৫

মুক্তা ১১	২১- ২২	৫.৫- ৬.৫
কিরণ ২২	২২-২৩	৪.০- ৫.৫
দিশারী ২৩	২৫-২৭	৪.০- ৫.৫
নয়া পাজাম ২৫	২০-২২	৪.০- ৫.০
ব্রিধান ৩০	২০-২৩	৪.০- ৪.৫
ব্রিধান ৩১	২৪-২৬	৪.৫- ৫.৫
ব্রিধান ৩২	২২-২৪	৫.০- ৬.০
আইআর ৫		৫.৫- ৬.৫
ইরিশাইল আইআর- ২০		৪.০- ৪.৫
বিনাশাইল		৪.০- ৫.০

৩। উন্নত রোপা আমন ধান জাতের গাছের উচ্চতা ও জীবনকাল

জাত	গাছের উচ্চতা (সে.মি.)	ফলন (টন/হেক্টর)
বিপ্লব ৩	৯৫- ১০৫	১৩০- ১৪৫
ব্রিশাইল ৪	১২৫	১৪৫- ১৫০
দুলাভোগ ৫	১০৭- ১২৭	১৪৫- ১৫৫
প্রগতি ১০	১১৫- ১৩০	১৪৫- ১৫৫
মুক্তা ১১	১১৫- ১৩০	১৪০- ১৫৫
কিরণ ২২	১১০- ১২৫	১৩৫- ১৫৫
দিশারী ২৩	১১৫- ১৩০	১৩৫- ১৫৫
নয়া পাজাম ২৫	১৩৫- ১৪৫	১৩০- ১৪০
ব্রিধান ৩০	১১৫- ২৫	১৪০-১৫৫
ব্রিধান ৩১	১১০-১২৫	১৩৫-১৪৫
ব্রিধান ৩২	১১০-১২৫	১২০-১৩৫
আইআর ৫	১১০-১২০	১৩৫-১৪৫
ইরিশাইল	১২০-১২৫	১৩৫-১৪৫
বিনাশাইল	১১৫-১৩০	১২০-১৪৫

৪। উন্নত রোপা আমন ধান জাতের দানার বৈশিষ্ট্য

জাত	দানার বৈশিষ্ট্য
বিপ্লব ৩	মোটা, চালের পেটে সাদা দাগ
ব্রিশাইল ৪	মাঝারি
দুলাভোগ ৫	ছোট, গোলাকৃতি
প্রগতি ১০	মাঝারি
মুক্তা ১১	মাঝারি মোটা
কিরণ ২২	মাঝারি সরু, রঙ গাঢ়
দিশারী ২৩	ধান লম্বা, রঙ গাঢ়
নয়া পাজাম ২৫	মাঝারি সুরু
ব্রিধান ৩০	লম্বাটে মোটা, রঙ হাল্কা
ব্রিধান ৩১	মাঝারি মোটা, রঙ হাল্কা
ব্রিধান ৩২	মাঝারি মোটা
আইআর ৫	মাঝারি
ইরিশাইল আইআর ২০	মাঝারি
বিনাশাইল	সরু; রঙ উজ্জ্বল

৫। উন্নত ধান জাতের রোগ-পোকার সংক্রমণ বৈশিষ্ট্য

জাত	যেসব রোগ কম হয়	যেসব পোকায় কম ধরে
বিপ্লব ৩	খোলপোড়া রোগ	
ব্রিশাইল ৪	টুংরো ব্লাস্ট, পাতা পোড়া, কাণ্ড পচা,লালচে রেখা, খোলপোড়া, খোল পচা	হলুদ মাজরা পোকা
দুলাভোগ ৫	ব্লাস্ট	
প্রগতি ১০	টুংরো, লালচে রেখা, ব্লাস্ট ও বাকানি	হলুদ মাজরা
মুক্তা ১১	লালচে রেখা, বাকানি	হলুদ মাজরা
কিরণ ২২	টুংরো, পোড়া	হলুদ মাজরা
দিশারী ২৩	টুংরো, কাণ্ড পচা	সাদা পিঠ গাছ ফড়িং, সবুজ লাল ফড়িং
নয়া পাজাম ২৫	টুংরো, খোলা পোড়া, পাতা পোড়া, কাণ্ড পচা, ব্লাস্ট	সাদা পিঠ গাছ ফড়িং, পামরী পোকা
ব্রিধান ৩০	টুংরো, কাণ্ড পচা, পাতা পোড়া	

ব্রিধান ৩১	টুংরো, কাণ্ড পঁচা, পাতা পোড়া	বাদামি গাছ ফড়িং, পামরী পোকা
ব্রিধান ৩২	খোলপোড়া, পাতা, পোড়া, কাণ্ড পচা, টুংরো, ব্লাস্ট	
আইআর ৫	কাণ্ড পচা	
ইরিশাইল	টুংরো	মাজরা
বিনাশাইল	পাতা ফোস্কা, পাতা ঝলসানো, পাতার খোল পচা, কাণ্ড পচা, টুংরো	পামরী, মাজরা, গল মাছি।

৬। উন্নত রোপা আমন ধান জাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও চাষ এলাকা

জাত	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	পরীক্ষা ও চাষ এলাকা
বিপ্লব ৩	আলো নিরপেক্ষ	সমগ্র বাংলাদেশ
ব্রিশাইল ৪	চারা দ্রুত লম্বা হয় বলে আমন মৌসুমে আগাম লাগানো যায়	সমগ্র বাংলাদেশ
দুলাভোগ ৫	আলোক সংবেদনশীল	সমগ্র বাংলাদেশ
প্রগতি ১০	কিছুটা নিচু জমিতে বোনা যায় ধান : চাল = ৪০ : ২৯	সমগ্র বাংলাদেশ
মুক্তা ১১	কিছুটা নিচু জমিতে লাগানো যায় ধান : চাল = ৪০ : ২৯	সমগ্র বাংলাদেশ
কিরণ ২২	আলোক সংবেদনশীল নয়। শেষ সেপ্টেম্বর রোপণ করা যায়। চারা লম্বা (৩০–৩৫ সেন্টিমিটার)	সমগ্র বাংলাদেশ
দিশারী	আলোক সংবেদনশীল নয়। শেষ সেপ্টেম্বর রোপণ করা যায়। চারা লম্বা (৩০–৩৫ সেন্টিমিটার)	সমগ্র বাংলাদেশ
নয়াপাজাম ২৫	আলো নিরপেক্ষ	সমগ্র বাংলাদেশ
ব্রিধান ৩১	চারা লম্বা (৩০–৩৫ সেন্টিমিটার)	সমগ্র বাংলাদেশ
ব্রিধান ৩২	ডিগ পাতা খাড়া ও সবুজ	কুমিল্লা অঞ্চল
আইআর ৫	শ্রাবণের পর রোপণ করলে ফলন কমে যায়	সমগ্র বাংলাদেশ
ইরিশাইল আইআর ২০	আষাঢ় মাসে রোপণ ভালো	সমগ্র বাংলাদেশ
বিনাশাইল	বৃষ্টি নির্ভর চাষ সম্ভব	সমগ্র বাংলাদেশ

৭। উন্নত আউশ ধান জাতের কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

জাত	গুছিতে কুশির সংখ্যা	জীবনকাল (দিন)	প্রতি শীষে ধানের সংখ্যা	গাছের উচ্চতা (সেন্টিমিটার)
চান্দিনা	১৩-১৬	১১৫-১২৫	১০০-১২০	৭৫-৯০
মালা ২	১০-১৪	১২০-১২৫	৫০-৭০	১১০-১১২
বিপ্লব ৩	১০-১২	১২০-১৩০	৫০-১০০	৯৭-১০২
বিআর ৬	১০-১২	১০৫-১১০	৪০-৭০	৯৭-১০২
ব্রিবালাম ৭	৮-১০	১১৫-১৩০	১১০-১২০	১০৭-১৩২
আশা ৮	১০-১২	১২০-১২৫	১১০-১২০	১১৫-১২৫
সুফলা ৯	১০-১৩	১১৫-১২০	১০০-১০৫	১০৮-১২৮
ময়না ১২	১২-১৪	১২৫-১৩০	১২০-১২৫	৮০-১০৫
গাজী ১৪	১২-১৫	১১৫-১২৫	১২৫-১৩৫	৯৫-১২০
মোহিনী	১২-১৫	১২০-১২৫	৮০-৯৫	৮০-১০০
শাহীবালাম ১৬	১২-১৪	১২৫-১৩০	১৩৫-১৪০	৮০-১০০
নিজামী ২০	৮-১০	১১০-১১৫	১১০-১৩০	১১০-১২০
নিয়ামত ২১	৮-১০	৯৫-১০০	৯০-১০০	৯০-১০০
রহমত ২৪	১৩-১৫	১০০-১০৭	৫০-৭০	১০০-১০৫
শ্রাবণী ২৬	১২-১৩	১০৫-১২০	৬০-৭০	১১০-১২০
ব্রিধান ২৭	১০-১২	১১০-১১৫	৬০-৭০	১৩৫-১৪০
আইআর ৮	১৪-১৬	১২৫-১৩০	৭০-৮০	১০০-১২০
পূর্বাচী	১৫-১৬	১১০-১১৫	১১৫-১৩০	৮৫-৯০
ইরাটম ২৪	১২-১৫	১৩০-১৩৫	৯০-১১৫	৮০-১০০

৮। উন্নত বোরো ধান জাতের কুশির সংখ্যা ও ফলন

জাত	গুছিতে কুশির সংখ্যা	ফলন (টন/হেক্টর)
চান্দিনা ১	২০-২২	৪.৫-৫.৫
মালা ২	২০-২২	৪.৫-৫.৫
বিপ্লব ৩	২৩-২৫	৪.০-৫.৫
বিআর ৬	২১-২৩	৩.০-৩.৫
ব্রিবালাম ৭	২১-২৩	৩.৯-৪.৫
আশা ৮	২২-২৪	৪.০-৫.৫
সুফলা ৯	২২-২৪	৪.০-৪.৫

ময়না ১২	২২–২৩	৪.০–৪.৫
গাজী ১৪	২৩–২৫	৪.০–৪.৫
মোহিনী ১৫	২১–২৩	৪.০–৫.০
শাহীবালাম ১৬	২২–২৪	৪.০–৫.০
নিজামী ২০	২২–২৪	৩.০–৩.৫
নিয়ামত ২১	২২–২৬	৪.০–৫.০
রহমত ২৪	২১–১৭	৩.০–৩.৫
শ্রাবণী ২৬	২২–২৫	৪.০–৪.৫
ব্রিধান ২৭	৩২–৩৬	৩.০–৪.০
আইআর ৮	২৫–২৭	৪.০–৪৫
পূর্বাচী	২৪–২৬	৩.৫–৪০
ইরাটম ২৪	২৩–২৫	৩.৫–৪.০

৯। উন্নত বোরো ধান জাতের কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

জাত	গুছিতে কুশির সংখ্যা	জীবনকাল (দিন)	প্রতি শীষে ধানের সংখ্যা	গাছের উচ্চতা (সেন্টিমিটার)
চান্দিনা ১	১৫–১৭	১৪৫–১৫০	১২০–১৩০	৭৫–৯০
মালা ২	১০–১৩	১৫–১৬০	১৭০–২০০	১১০–১২৫
বিপ্লব ৩	১৫–১৮	১৬৫–১৭০	১১৫–১২৫	৯১–৯৭
বিআর ৬	৮–১০	১৩৫–১৪০	১০০–১১০	৯৭–১০২
ব্রি বালাম ৭	১০–১২	১৫০–১৫৫	১২৫–১৩০	১০৭–১৩২
আশা ৮	১১–১৩	১৫৫–১৬০	১১৭–১২০	১২০–১৩০
সুফলা ৯	১০–১৩	১৫০–১৫৫	১৩০–১৩৫	১০৮–১২৫
ময়না ১২	১০–১৪	১৬০–১৭৫	১২০–১৩০	৮০–১০৫
গাজী ১৪	১৫–১৭	১৫৫–১৬০	১৩০–১৩৫	৯৫–১০৫
মোহিনী ১৫	১২–১৩	১৫০–১৬৫	১১৮–১২৭	৮০–১০০
শাহীবালাম ১৬	১২–১৩	১৬০–১৬৫	১৪০–১৫০	৮০–১০০
হাসি ১৭	১০–১২	১৫০–১৫৫	১৩৫–১৪০	১১০–১৩০
শাহজালাল ১৮	১০–১২	১৬০–১৭০	১৩৫–১৪৫	১১০–১২০
মঙ্গল ১৯	১০–১২	১৬০১৭০	১৩০–১৩৫	১০৫–১১৩
ব্রিধান ২৮	১২–১৪	১৩৫–১৪০	১২৫–১৩০	৮৫–৯০

ব্রিধান ২৯	১২–১৪	১৫৫–১৬০	১১৫–১২০	৯০–৯৫
আইআর ৮	১৪–১৬	১৭০–১৭৫	১১৫–১২৫	১০০–১১০
পূর্বাচী	১৫–১৬	১৪০–১৫০	১১৫–১২০	৮৫–৯০
ইরাটম ২৪	১৩–১৫	১৫০–১৬০	১০০–১১০	৭৫–৮০

১০। উন্নত উফশী ব্যবস্থায় ধান জাতের ফলন বৈশিষ্ট্য

জাত	গুছিতে কুশির সংখ্যা	জীবনকাল (দিন)
চান্দিনা ১	২০–২২	৫.৫–৬.৫
মালা ২	২০–২২	৫.৫–৫.৬
বিপ্লব ৩	২৩–২৫	৫.৫–৬৫
বিআর ৬	২১–২৩	৩.৫–৪.৫
ব্রিবালাম ৭	২১–২৩	৪.০–৪.৫
আশা ৮	২২–২৪	৫.০–৫.৫
সুফলা ৯	১০–১৩	১৫০–১৫৫
ময়না ১২	২২–২৩	৪.৫–৫.৫
গাজী ১৪	২৩–২৫	৫.০–৬.০
মোহিনী ১৫	২১–২৩	৫.০–৫.৫
শাহীবালাম ১৬	২২–২৪	৫.০–৬.০
হাসি ১৭	২৩–২৫	৫.০–৬.০
শাহজালাল ১৮	২৩–২৫	৫.০–৬.০
মঙ্গল ১৯	২১–২৩	৫.০–৬.০
ব্রিধান ২৮	২১–২২	৪.৫–৫.০
ব্রিধান ২৯	২০–২২	৫.০–৫.৫
আইআর ৮	২৫–২৭	৫.৫–৬.০
পূর্বাচী	২৪–২৬	৪.৫–৫.৫
ইরাটম ২৪	২৩–২৫	৬.০–৬.৫

১১। উন্নত বোরো (আউশ) ধান জাতের সংক্রমণ বৈশিষ্ট্য

জাত	যেসব রোগ কম হয়	যেসব পোকা কম হয়	বিশেষ বৈশিষ্ট্য
চান্দিনা ১	টুংরো	হলদে মাজরা পোকা	
মালা ২	পাতা পোড়া, কাণ্ড পচা	—	মাড়াই করতে সময় বেশি লাগে
বিপ্লব ৩	খোল পোড়া	—	—

বিআর ৬	ব্লাস্ট, পাতা পোকা	সবুজ পাতা ফড়িং, সাদা পিঠ গাছ ফড়িং	—
ব্রিবালাম ৭	ব্লাস্ট	সাদা পিঠ গাছ ফড়িং	—
আশা ৮	লালচে রেখা, বাকানি	বাদামি গাছ ফড়িং	চালের পেট সাদা
সুফলা ৯	লালচে রেখা, বাকানি	—	চারা লম্বা (২০–২৫ সেন্টিমিটার)
ময়না ১২	টুংরো, পাতা পোড়া, লালচে রেখা, কাণ্ড পচা, ব্লাস্ট	পাতা মাছি, থ্রিপস	গাছের নিচের অংশ বেগুনি
গাজী ১৪	পাতা পোড়া, কাণ্ড পচা, ব্লাস্ট	থ্রিপস, পাতা মাছি পামরি, সাদা পিঠ গাছ ফড়িং	ছড়া বের হওয়ার পর ডিগ পাতা হেলে পড়ে, ধানে শুঙ আছে
মোহিনী ১৫	পাতা পোড়া, লালচে রেখা, কাণ্ড পচা	সবুজ পাতা ফড়িং	—
শাহীবালাম ১৬	পাতা পোড়া, কাণ্ড পচা, ব্লাস্ট	—	—
হাসি ১৭	খোলপচা, ব্লাস্ট কাণ্ড পচা	পামরি	হাওড় এলাকায় চাষের উপযোগী চারা লম্বা (২৫–৩০ সেন্টিমিটার)
শাহজালাল ১৮	খোলা পচা, কাণ্ড পচা	বাদামি গাছ ফড়িং, সবুজ পাতা ফড়িং	ডিগ পাতা ছোট, চওড়া
মঙ্গল ১৯	খোলা পচা, কাণ্ড পচা	–	ডিগ পাতা হেলানো চারা লম্বা (২০–২৫ সেন্টিমিটার)
ব্রিধান ২৮	ব্লাস্ট	—	শুধু বোরো মৌসুমের জন্য
ব্রিধান ২৯	ব্লাস্ট	—	শুধু বোরো মৌসুমের জন্য
আইআর ৮	বাকানি	—	পাতা কিছুটা ছড়ানো
পুর্বাচী	—	—	পাতা কিছুটা ছড়ানো
ইরাটম ২৪	—	মাজরা, পাতা শোষক	—

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের ধান জাতের বিবরণ

বাংলাদেশে চাষকৃত অনেকগুলো জাতের ধানের বিস্তারিত বিবরণ পরিহার করে জনপ্রিয় ও উচ্চ ফলনশীল ধান জাতের বর্ণনা আলোচনা করা হলো।

১। চান্দিনা (বিআর ১)

চান্দিনা ১৯৭০ সালে বোরো ও আউশ মৌসুমে চাষ করার জন্য অনুমোদন লাভ করে।

বংশ পরিচয় : আইআর ২৬২–২৪–৩ এবং টিকে এম ৬ এ দুটি বিদেশী ধানের মধ্যে সঙ্করায়ন করে চান্দিনা হতে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ ধানটির কৌলিক সারির নম্বর আইআর ৫৩২–১–১–১৭৬।

গাছের বৈশিষ্ট্য : চান্দিনা ধান গাছের উচ্চতা ৯০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। পাতা ছোট, পুরু ও খাড়া, গাছের সব অংশই সবুজ। বোরো মৌসুমে প্রতি গুছিতে গড়ে ১২–১৫টি এবং আউশ মৌসুমে রোপা চাষে ১৩টি ছড়া হয়। প্রতি ছড়ায় রোপা আউশে ১০০–১১০টি ধান ও বোরোতে ১১০–১২০টি ধান হয়ে থাকে।

জীবনকাল : বোরো মৌসুমে বীজ বোনা থেকে ধান পাকা পর্যন্ত ১৪৫–১৫৫ দিন সময় লাগে। রোপা আউশ ধানের ক্ষেত্রে এ সময়সীমা ১১৫–১২৫ দিন।

ফলন : বোরো মৌসুমে এ ধানের ফলন হেক্টর প্রতি ৫.৫ টন এবং আউশ মৌসুমে রোপা চাষে ৪.৫ টন পর্যন্ত হতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই : এ ধান হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। তবে এ ধানে গলমাছির আক্রমণ তুলনামূলকভাবে বেশি হয়।

২। বিপ্লব (বিআর ৩)

বোরো, আউশ ও আমন–এ তিন মৌসুমেই চাষ করার জন্য ১৯৭৩ সালে এ জাত অনুমোদন লাভ করে।

বংশ পরিচয় : বিদেশী ধান আইআর ৫০৬–১৩৩–১ এবং দেশী ধান লতিশাইলের মধ্যে সঙ্করায়ন করে বিপ্লব উদ্ভাবন করা হয়। এ ধানের কৌলিক সারির নম্বর বিআর ২৭–১০–১।

গাছের বৈশিষ্ট্য : বিপ্লব খাটো আকৃতির উফশী ধান। এর পাতা খাড়া, খসখসে এবং গাঢ় সবুজ। এর উচ্চতা আউশ ও আমন মৌসুমে ১০০ সেন্টিমিটার এবং বোরো মৌসুমে ৯৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

বোরো মৌসুমে ১৫-১৮টি, আউশ মৌসুমে ১০-১২টি এবং আমন মৌসুমে ১২-১৫টি কুশি বের হয়। প্রতিটি ছড়ায় বোরো মৌসুমে ১১৫-১২৫টি এবং আউশ ও আমন মৌসুমে ৯০-১০০টি ধান হয়ে থাকে। চাল মোটা, পেটে সাদা দাগ আছে।

জীবনকাল : বোরো মৌসুমে জীবনকাল ১৭০ দিন, আউশ মৌসুমে ১৩০ দিন এবং রোপা আমন মৌসুমে ১৪৫ দিন।

ফলন : উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে বিপ্লব বোরো মৌসুমে হেক্টর প্রতি ৬.৫ টন এবং আউশ ও আমন মৌসুমে ৫.৫ টন ফলন দিতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই : এ ধান ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধ করতে পারে। খোলপোড়া রোগ সহনশীলতা রয়েছে।

৩। মুক্তা (বিআর ১১)

১৯৮০ সালে মুক্তা সারাদেশে আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

বংশ পরিচয় : ১৯৭০ সালে আইআর ২০ এবং আইআর ৫-৪৭-২ জাতের মধ্যে সঙ্করায়ন করে মুক্তা ধান উদ্ভাবন করা হয়। এ ধানের কৌলিক সারির নম্বর বিআর ৫২-৮৭-১ এইচআর ৮৮।

গাছের বৈশিষ্ট্য : মুক্তার পাতা ঘন সবুজ হয় ও খাড়া থাকে। মাত্র ৩০ দিনেই এর চারা গড়ে প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা হতে পারে। যার ফলে যেসব জমিতে ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার পানি জমে থাকে সেসব জমিতে এর চারা রোপণ করা যায়। মুক্তার চারা ভাদ্রের মাঝামাঝি (৩০ আগস্ট) পর্যন্ত রোপণ করা যায়।

জীবনকাল : মুক্তার জীবনকাল বপন থেকে পাকা পর্যন্ত ১৪৫ দিন। সাধারণত শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে বীজ বপন করলে কার্তিক মাসের প্রথম দিকেই এ ধানে ছড়া বের হয় এবং অগ্রহায়ণের প্রথম দিকে ধান পাকে।

ফলন : উপযুক্ত পরিচর্যায় মুক্তা হেক্টর প্রতি ৬.৫ টন ফলন দেয়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই : এ ধান হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ সহ্য করতে পারে।

৪। গাজী (বিআর ১৪)

১৯৮৩ সালে উদ্ভাবিত গাজী বোরো ও আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

বংশ পরিচয় : আইআর ৫ (ডি) ও বিপ্লব (বিআর ৩) জাতের ধানের মধ্যে সঙ্করায়ন করে গাজী ধান উদ্ভাবন করা হয়। এর কৌলিক সারির নম্বর বিআর ৩১৯-১ এইচআর ২৮।

গাছের বৈশিষ্ট্য : গাছের উচ্চতা ১২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে।

গাছের কাণ্ড ও পাতা সবুজ ও খাড়া। ছড়ার উপরিভাগের ধানে ছোট ছোট শুঙ দেখা যায়। চাল মাঝারি মোটা ও সাদা।

জীবনকাল : এ ধানের জীবনকাল বোরো মৌসুমে ১৬০ দিন ও আউশ মৌসুমে ১২০ দিন।

ফলন : উপযুক্ত পরিচর্যা বোরো মৌসুমে হেক্টর প্রতি ৬.০ টন ও আউশ মৌসুমে ৫.৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই : এ ধান ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এবং পাতাপোড়া ও টুংরো রোগ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়া সাদা-পিঠ গাছফড়িং- এর আক্রমণ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারে।

৫। কিরণ (বিআর ২২)

১৯৮৮ সালে উদ্ভাবিত কিরণ রোপা আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। এটি একটি আলোক-সংবেদনশীল নাবী জাত।

বংশ পরিচয় : এ ধান নাইজারশাইল ও বিআর ৫১-৪৬-৫ এর মধ্যে সঙ্করায়ন করে উদ্ভাবন করা হয়েছে। কিরণের বংশগতি ধারার সংখ্যা বিআর ৫৩৯-১৭- ৪- ৩- ৩- ১।

গাছের বৈশিষ্ট্য : গাছের সকল অংশ সবুজ থাকে। এক মাসের চারার উচ্চতা ৩০ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার এবং পাকার সময় গাছের উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার হতে পারে।

প্রতি গাছে ৮ থেকে ১০টি কুশি হয় এবং শীষ ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। প্রতি শীষে ১২০ থেকে ১৩০টি ধান হয় এবং ১,০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২২ থেকে ২৩ গ্রাম। ধান খড়ের রঙের চেয়ে কিছুটা গাঢ়। চাল মাঝারি চিকন, রঙ সাদা। শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে শ্রাবণের শেষ সময়ে রোপণের জন্য ৩০ দিন বয়সী এবং আশ্বিনের মাঝামাঝি রোপণের জন্য ৪০ থেকে ৪৫ দিন বয়সী চারা ব্যবহার করা উচিত।

জীবনকাল : আশ্বিনের মাঝামাঝি (আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ সময় পর্যন্ত) চারা রোপণ করা যায়। জীবনকাল সাধারণভাবে ১৫০ দিন এবং নাবীতে সাধারণের চেয়ে ১৫ থেকে ২০ দিন কম হয়। এ কারণে এটি দেশের বন্যাপীড়িত জমিতে নাবী আমনের জাত হিসেবে বিশেষভাবে উপযোগী।

ফলন : শ্রাবণের শেষ পর্যন্ত রোপণ করলে ফলন হেক্টর প্রতি ৫.০ টন, আর দেরিতে রোপণ করলে ফলন হেক্টর প্রতি ৪.০ টন পর্যন্ত হতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই : টুংরো, পাতাপোড়া ও খোলপোড়া রোগ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারে। হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণের প্রতি এ ধান সহনশীল।

৬। দিশারী (বিআর ২৩)

১৯৮৮ সালে উদ্ভাবিত দিশারী রোপা আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

বংশ পরিচয় : ডিএ ২৯ ও বিআর ৪ (ব্রিশাইল) এর মধ্যে সঙ্করায়ন করে দিশারী উদ্ভাবন করা হয়েছে। দিশারীর বংশগতি ধারার সংখ্যা বিআর ৭১৬- ৭ -২- ১- ১।

গাছের বৈশিষ্ট্য : এজাত আলোক-সংবেদনশীল। এক মাস বয়সের চারার উচ্চতা ৩৫ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার এবং ধান পাকার সময় গাছের উচ্চতা ১২০ সেন্টিমিটার হয়। প্রতি গাছে ৮ থেকে ১০টি কুশি হয়। শীষ ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। প্রতি

শীযে ১১০ থেকে ১২০টি ধান এবং ১,০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৬ গ্রাম পর্যন্ত হয়। চাল লম্বা, চিকন ও সাদা। শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে শ্রাবণের শেষ সময়ে রোপণের জন্য ৩০ দিন বয়সী এবং আশ্বিনের মাঝামাঝি রোপণের জন্য ৪০ থেকে ৪৫ দিন বয়সী চারা ব্যবহার করা উচিত।

জীবনকাল : জীবনকাল সাধারণভাবে ১৫০ দিন এবং নাবীতে সাধারণের চেয়ে ১৫ থেকে ২০ দিন কম হয়। এ কারণে এটি দেশের বন্যা পীড়িত জমিতে নাবী আমনের জাত হিসেবে বিশেষভাবে উপযোগী।

ফলন : শ্রাবণের শেষে রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ৫.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে। আর দেরিতে, রোপণ করলে হেক্টর প্রতি ৩.৫ টন পর্যন্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই : এ ধান পাতাপোড়া ও খোলপোড়া রোগ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারে ; ব্লাস্ট ও টুংরো রোগেও সহনশীল। এ ধান সাদা-পিঠ গাছফড়িং- এর আক্রমণ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারে। এ ছাড়া জলমগ্নতা সহ্য করার ক্ষমতাও এর কিছুটা আছে।

৭। নয়াপাজাম (বিআর ২৫)

এ জাতটি ১৯৯২ সালে অনুমোদন লাভ করে।

বংশ পরিচয় : পাজাম ও আইআর ২৬ এর মধ্যে সঙ্করায়ন করে নয়াপাজাম উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতটি বংশগতি ধারার সংখ্যা বিআর ৪২৫– ১৮৯– ৬– ১– ২– ১– ১–।

গাছের বৈশিষ্ট্য : এক মাসের চারার উচ্চতা ৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রতি গাছে ৭ থেকে ৮টি কুশি হয় এবং ২৫ থেকে ২৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রতি শীষে ১১০ থেকে ১২০টি পর্যন্ত ধান হয় এবং ১,০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২১ গ্রাম।

জীবনকাল : এ ধানের জীবনকাল ১৩৫ দিন।

ফলন : হেক্টর প্রতি ৪.৫ টন ফলন হতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই : এ ধান ব্লাস্ট রোগ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারে। এছাড়া পামরী পোকার আক্রমণ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারে।

৮। শ্রাবণী (বিআর ২৬)

১৯৯৩ সালে জাতটি কেবল রোপা আউশ মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

বংশপরিচয় : আইআর ১৮৩৪৮–৩৬–৩–৩, আইআর ২৫৮৬৩–৩–২ এবং আইআর ৫৮ এ তিনটি সারির সমন্বয়ে সঙ্করায়নের মাধ্যমে শ্রাবণীর উদ্ভাবন করা হয়। এ জাতের বংশগতি ধারা হচ্ছে আইআর ৪৪৫৯৫–৭০–২–২–৩। আর্ন্তজাতিক ধান পরীক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে উক্ত সারিটি ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে আসে।

গাছের বৈশিষ্ট্য : শ্রাবণী জাতের পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। ধানের শীষ ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। প্রতি শীষে ধানের সংখ্যা ১৬০

থেকে ১৬৫টি এবং ১,০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ১৭ গ্রাম। পাকা ধানের রঙ হালকা সোনালি, চালের রঙ সাদা। এ জাতের বিশেযত্ব হচ্ছে, এর চাল লম্বা ও সরু।

জীবনকাল : স্বাভাবিক অবস্থায় শ্রাবণী ১১৫ দিনে পাকে।

ফলন : হেক্টর প্রতি ৪.০ টন ফলন দেয়।

পোকামাকড় ও রোগবালাই : এ ধান সাদা-পিঠ গাছফড়িং-এর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। সবুজ পাতাফড়িং ও বাদামি গাছফড়িং-এর আক্রমণ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারে। এ ধান ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

৯। ব্রিধান -২৮

১. বিধান-২৮ একটি স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন (আগাম) বোরো মৌসুমের জাত।
২. বিআর ৬ এবং পূর্বাচী জাতের মধ্যে সঙ্করায়ণ পূর্বক ধাপে ধাপে বাছাই ও যাচাই-এর মাধ্যমে বিআর ৬০-১-২-৩-৪-৫ কৌলিক সারিটি প্রাপ্ত।
৩. বোরো মৌসুমে ভালো ফলন দেয়ায় ১৯৯৪ সালে এটিকে ব্রিধান-২৮ নামে ছাড় করা হয়েছে।
৪. যেসব এলাকায় বোরো ফসলের পর রোপা আউশ বা পাঠ চাষ করা হয় সেসব এলাকার জন্য এজাতটি বিশেষ উপযোগী।
৫. কাণ্ড ও পাতা ঘন সবুজ এবং খাড়া বিধায় সমানভাবে সূর্যের আলো পায়।
৬. পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার।
৭. কাণ্ড শক্ত বলে গাছ হেলে পড়ে না।
৮. রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।
৯. ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধশীল।
১০. বীজ বপন থেকে ধান পাকা পর্যন্ত, ১৩৫ থেকে ১৪০ দিন।
১১. ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে।
১২. ধানের রঙ ফিকে সোনালি।
১৩. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২২ গ্রাম।
১৪. ফলন হেক্টর প্রতি ৫ মেট্রিক টন-এর অধিক।
১৫. চাল মাঝারি চিকন ও স্বচ্ছ-সাদা।

সংক্ষিপ্ত চাষ পদ্ধতি

১. সেচ সুবিধাযুক্ত দোআঁশ, কাদা ও পলি দোআঁশ জমি এ জাত চাষের উপযোগী।
২. অগ্রহায়ণ মাস বীজতলা করার উপযুক্ত সময়। তবে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি ব্রিধান-২৮-এর বীজ বপন করে ৩০ থেকে ৩৫ দিনের চারা রোপণ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
৩. এক হেক্টর জমি রোপণ করতে প্রায় ২৫ কেজি বীজের প্রয়োজন।

৪. প্রতি বর্গমিটার কাদাময় বীজতলায় ১০০ গ্রাম বীজ অঙ্কুরিত অবস্থায় বপন করতে হয়।

৫. জমিতে ২০ সেন্টিমিটার পর পর সারি করে রোপণ করতে হয়। প্রতি সারিতে ১৫ সেন্টিমিটার পর পর প্রতি গোছায় ২টি চারা রোপণ করতে হয়।

সার প্রয়োগ

১. প্রতি হেক্টর জমিতে সাধারণত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ বা মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো—

ইউরিয়া	২২০ কেজি
টিএসপি	১২০ কেজি
এমপি	৮৫ কেজি
জিপসাম	৬০ কেজি
দস্তা	১০ কেজি

২. ইউরিয়া ছাড়া অন্য সব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

৩. ইউরিয়া সার সমান তিনভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত সময়ে তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম কিস্তি : রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে

দ্বিতীয় কিস্তি : রোপণের ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে

তৃতীয় কিস্তি : রোপণের ৪০ থেকে ৫০ দিনের মধ্যে

৪. জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার নিড়ানি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

পানি সেচ

১. এ জাতের চারা রোপণের পর অন্তত ৩০দিন জমিতে ছিপছিপে পানি রাখা ভালো।

২. ধানগাছে কাইচথোড় হওয়া থেকে ধানের দুধ হওয়া পর্যন্ত সময়ে পানির প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকে। এসময়ে জমিতে ৭ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পানি রাখা দরকার।

ফসল কর্তন ও বীজ সংরক্ষণ

১. এই জাতের ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে। কাজেই ফসল টাকার জন্য জমিতে গিয়ে ধান পরীক্ষা করতে হয়।

২. শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত হওয়া ফসল কর্তনের উপযুক্ত সময়।

৩. বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য ধান পাকার সাথে সাথে কেটে মাড়াই করে শুকিয়ে নেয়া দরকার।

৪. যে জমির ধানে মিশ্রণ নেই, ভালোভাবে পেকেছে, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় নাই সে জমির ধান বীজ হিসেবে রাখা যায়।

১০। ব্রিধান-২৯

১. ব্রিধান-২৯ একটি মাঝারি জীবনকালসম্পন্ন বোরো মৌসুমের জাত। বিজি ৯০-২ এবং বিআর ৫১-৪৬-৫ কৌলিক সারি দুটির মধ্যে সঙ্করায়ব করে বিআর ৮০২-১১৮-৪-২ কৌলিক সারিটি প্রাপ্ত। এই সারিটি যেসব এলাকায় বা একফসলী হিসেবে শুধু বোরো চাষ হয় সেসব এলাকার জন্য এ জাতটি বিশেষ উপযোগী।
২. কাণ্ড ও পাতা ঘন সবুজ এবং খাড়া।
৩. পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯০ থেকে ৯৫ সেন্টিমিটার।
৪. কাণ্ড শক্ত বলে গাছ হেলে পড়ে না।
৫. রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।
৬. পাতাপোড়া ও খোলপোড়া রোগ মধ্যম প্রতিরোধশীল।
৭. জীবনকাল স্বাভাবিক অবস্থায় ১৫৫ থেকে ১৬০ দিন।
৮. ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে।
৯. ধানের রঙ ফিকে সোনালি।
১০. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২০ গ্রাম।
১১. ফলন হেক্টর প্রতি ৫ টন।
১২. চাল মাঝারি চিকন ও স্বচ্ছ সাদা।

সংক্ষিপ্ত চাষ বৈশিষ্ট্য

১. সেচ সুবিধাযুক্ত দোআঁশ, কাদা ও পলি দোআঁশ জমি এ জাত চাষের উপযোগী।
২. অগ্রহায়ণ মাস বীজতলা করার উপযুক্ত সময়। তবে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে ব্রিধান-২৯ এর বীজ বপন করে ৪০ থেকে ৪৫ দিনের চারা রোপণ করলে বেশি ফলন পাওয়া যাবে।
৩. প্রতি বর্গমিটার কাদাময় বীজতলায় ১০০ গ্রাম বীজ অঙ্কুরিত অবস্থায় বপন করতে হয়।
৪. জমিতে ২০ সেন্টিমিটার পর পর সারি করে প্রতি সারিতে ১৫ সেন্টিমিটার পর পর প্রতি গোছায় ২টি চারা রোপণ করতে হয়।
৫. বীজ হার ২৫ কেজি/হেক্টর।
৬. পোকা দমনের জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা। যেমন— আলোর ফাঁদ ব্যবহার, ডালপালা পুতে পোকাখেকো পাখি বসতে দিতে হয়।

সার প্রয়োগ

১. প্রতি হেক্টর জমিতে সাধারণত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ বা মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো—

ইউরিয়া	২৭০ কেজি
টিএসপি	১৩০ কেজি
মিউরিয়েট অব পটাশ	১২০ কেজি
জিপসাম	৭০ কেজি
দস্তা	১০ কেজি

২. ইউরিয়া ছাড়া অন্য সব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিঠিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

৩. ইউরিয়া সার সমান তিনভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত সময়ে তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম কিস্তি : রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে

দ্বিতীয় কিস্তি : ৩০ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে

তৃতীয় কিস্তি : রোপণের ৫০ থেকে ৫৫ দিনের মধ্যে

৪. জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার সমভাবে ছিটানোর পর নিড়ানী দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

৫. ইউরিয়া প্রয়োগের সময় জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়। আগাছা পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। চারা রোপণের পর ৩০ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন।

পানি সেচ

১. এ জাতের চারা রোপণের পর অন্তত ৩০ দিন জমিতে বেশি পানি না রেখে ছিপছিপে পানি রাখা ভালো। তাতে গাছে প্রচুর কুশি হয়।

২. ধানগাছে কাইচথোড় হওয়া থেকে ধানের দুধ হওয়া পর্যন্ত সময়ে পানির প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকে। এ সময়ে জমিতে ৭ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পানি রাখা দরকার।

৩. ধানের চাল শক্ত হওয়া শুরু হলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হয়।

ফসল কর্তন ও বীজ সংরক্ষণ

১. এ জাতের ধান পেকে গেলেও সবুজ থাকে। কাজেই ফসল কাটার জন্য জমিতে গিয়ে ধান পরীক্ষা করতে হয়।

২. শীষের ৮০% ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ এবং শীষের নিচের অংশে ২০% ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে তখনই ফসল কর্তনের উপযুক্ত সময়।

৩. বোরো মৌসুমে ধান কাটার সময়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য ধান পাকার সাথে সাথেই কেটে মাড়াই করে শুকিয়ে নেয়া দরকার।

৪. বীজ হিসেবে রাখার ধান কেটে আনার সাথে সাথে মাড়াই করে ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে বীজে পানির পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগে কমিয়ে আনতে হয়। ধান মাড়াই ও শুকানোর সময় যেন অন্য ধান মিশে না যায়।

১১। ব্রিধান-৩০

১. ব্রিধান-৩০ একটি উচ্চ ফলনশীল (উফশী) আমন মৌসুমের জাত। আইআর ২০৫৮-৭৮-১-৩-২-৩ এবং বিআর.৪ জাতের মধ্যে সঙ্করায়ব ও বাছাই-এর মাধ্যমে বিআর ৮৫০-২২-১-৪ কৌলিক সারিটি প্রাপ্ত ১৯৯৪ সালে ব্রিধান ৩০ নামে ছাড় করা হয়েছে।

২. ব্রিধান ৩০-এর চারা ও গাছের উচ্চতা মুক্তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি হওয়ায় রোপণের জন্য সুবিধাজনক।

৩. কাণ্ড ও পাতা ঘন সবুজ এবং খাড়া বিধায় সমানভাবে সূর্যের আলো পায়।
৪. একমাস বয়সের চারার উচ্চতা ৩৫ সেন্টিমিটার।
৫. পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১২০ সেন্টিমিটার।
৬. কাণ্ড শক্ত বলে গাছ হেলে পড়ে না।
৭. রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।
৮. টুংরো, কাণ্ডপচা ও পাতাপোড়া রোগ মোটামুটি প্রতিরোধশীল।
৯. বীজ বপন থেকে ধান পাকা পর্যন্ত ১৪৫ দিন।
১০. ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে।
১১. পাকা ধানের রঙ সোনালি।
১২. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২২ গ্রাম।
১৩. ফলন হেক্টর প্রতি ৫ টন।
১৪. চাল লম্বাটে, মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ–সাদা।

সংক্ষিপ্ত চাষ বৈশিষ্ট্য

১. বন্যামুক্ত এলাকায় দোআঁশ, কাদা ও পলি দোআঁশ জমি এ জাত চাষের উপযোগী।
২. আষাঢ়ের শুরু থেকে শ্রাবণের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ব্রিধান ৩০–এর বীজ বপন করে ৩০ দিনের চারা রোপণ করা যায়। আষাঢ়ের মাঝামাঝি বীজ বপন করে ৩০ দিনের চারা রোপণ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়। দেরিতে বপন বা রোপণ করলে ফলন হ্রাস পায়।
৩. এক হেক্টর জমি রোপণ করতে প্রায় ২৫ কেজি বীজের চারা প্রয়োজন।
৪. প্রতি বর্গমিটার কাদাময় বীজতলায় ১০০ গ্রাম বীজ বপন করতে হয়।
৫. জমিতে ২০ সেন্টিমিটার পর পর সারি করে রোপণ করতে হয়।
৬. প্রতি সারিতে ১৫ সেন্টিমিটার পর পর প্রতি গোছায় ২টি চারা রোপণ করতে হয়।
৭. জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়।
৮. ভালো ফলন পেতে হলে ভালো বীজ যথাসময়ে বপন এবং রোপণ যেমন জরুরি তেমনি প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার ও ফসল পরিচর্যা দরকার।
৯. ফসল খরা কবলিত হলে সম্পূরক সেচ দিতে হয়।

সার প্রয়োগ

১. জমির উর্বরতাভেদে সারের মাত্রা ভিন্নতর। তবে প্রতি হেক্টর জমিতে সাধারণত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ বা মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো—

ইউরিয়া	১৮০ কেজি
টিএসপি	১০০ কেজি
এমপি	৭০ কেজি
জিপসাম	৬০ কেজি
দস্তা	১০ কেজি (যেসব জমিতে দস্তার অভাব আছে)

২. ইউরিয়া ছাড়া অন্য সব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

৩. ইউরিয়া সার সমান তিনভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত সময়ে তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম কিস্তি : রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে

দ্বিতীয় কিস্তি : রোপণের ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে

তৃতীয় কিস্তি : রোপণের ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে

৪. জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার সমভাবে ছিটানোর পর নিড়ানি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

৫. ইউরিয়া প্রয়োগের সময় জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়। ধানের জমিতে আগাছার ফলে ধান গাছের বৃদ্ধির বাধাপ্রাপ্ত হয়। আগাছা পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। চারা রোপণের পর ৩০ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন।

ফসল কর্তন ও বীজ সংরক্ষণ

১. এ জাতের ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে। শীষের ৮০% ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ফসল কাটতে হয়।

২. বীজ ধান শুকানোর পর ঠাণ্ডা করে পরিষ্কার এবং নিশ্ছিদ্র মাটির পাত্রে বা ড্রামে ভরাট করে পাত্রের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে অথবা পলিথিনের লাইনযুক্ত ভালো বস্তায় রেখে মুখ বেঁধে শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হয়।

৩. সংরক্ষিত বীজ ভালো আছে কি–না তা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং প্রয়োজনে রোদে দিতে হয়।

১২। ব্রিধান–৩১

১. ব্রিধান–৩১ একটি উচ্চ ফলনশীল আমন মৌসুমের জাত।

২. বিআর–১১ এবং এআরসি ১০৫৫০ জাতের মধ্যে সঙ্করায়ণ করে ১৯৯৪ সালে এটিকে ব্রিধান–৩১ নামে ছাড় করা হয়েছে।

৩. ব্রিধান–৩১ কিছুটা আগাম ও বাদামি গাছফড়িং আক্রমণ প্রতিরোধশীল। এ গাছ সতেজ এবং পাতাগুলো একটু চওড়া।

৪. কাণ্ড ও পাতা ঘন সবুজ এবং খাড়া।

৫. একমাস বয়সের চারার উচ্চতা ৩০ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার।

৬. পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৫ সেন্টিমিটার।

৭. কাণ্ড শক্ত বলে গাছ হেলে পড়ে না।

৮. রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।

৯. খোলপোড়া ও পাতাপোড়া রোগ প্রতিরোধশীল। এছাড়া পামরী পোকার আক্রমণ কম হয়।

১০. জীবনকাল স্বাভাবিকভাবে ১৪০ দিন।

১১. ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে।

১২. শীষ লম্বা এবং ধানের গাঁথুনি বেশ ঘন।

১৩. পাকা ধানের রঙ ফিকে সোনালি।

১৪. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৫ গ্রাম।

১৫. ফলন হেক্টর প্রতি ৫ টন–এর অধিক।

১৬. চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ–সাদা।

১৭. আমিষ (প্রোটিন) এবং এমাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৮.৯ এবং ২৬.৫ ভাগ।

সংক্ষিপ্ত চাষ বৈশিষ্ট্য

১. বন্যামুক্ত এলাকায় দোআঁশ, কাদা ও পলি দোআঁশ জমি এ জাত চাষের উপযোগী।

২. আষাঢ়ের শুরু থেকে শ্রাবণের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বিধ্রান–৩১–এর বীজ বপন করে ৩০দিনের চারা শ্রাবণের শুরু থেকে ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোপণ করা যায়।

৩. প্রতি বর্গমিটার কাদাময় বীজতলায় ১০০ গ্রাম বীজ অঙ্কুরিত অবস্থায় বপন করতে হয়।

৪. এ চারা ২০ সেন্টিমিটার পর পর সারিতে রোপণ করতে হয়। প্রতি সারিতে ১৫ সেন্টিমিটার পর পর প্রতি গোছায় ২টি চারা, বীজ হার ২৫ কেজি/হেক্টর প্রতি।

সার প্রয়োগ

১. জমির উর্বরতাভেদে সারের মাত্রা ভিন্নতর। তবে প্রতি হেক্টর জমিতে সাধারণত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ বা মাত্রা উল্লেখ করা হলো—

ইউরিয়া	১৮০ কেজি
টিএসপি	১০০ কেজি
এমপি	৭০ কেজি
জিপসাম	৬০ কেজি
দস্তা	১০ কেজি

২. ইউরিয়া ছাড়া অন্য সব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিঁটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

৩. ইউরিয়া সার সমান তিনভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত সময়ে তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম কিস্তি : রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে

দ্বিতীয় কিস্তি : রোপণের ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে

তৃতীয় কিস্তি : রোপণের ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে।

১৩। ব্রিধান - ৩২

১. ব্রিধান–৩২ একটি উচ্চ ফলনশীল (উফশী) আমন মৌসুমের স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন (আগাম) জাত এটি উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় বিআর–৪ এবং বিআর–২৬৬২ দ্বয়ের মধ্যে সঙ্করায়নপূর্বক বাছাইয়ের মাধ্যমে বিআর ৪৩৬৩–৩–৮–১–২–৪ কৌলিক সারিটি প্রাপ্ত। সারিটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ভালো ফলন দেয়ায় ১৯৯৪ সালে এটিকে ব্রিধান–৩২ নামে ছাড় করা হয়েছে।

২. ব্রিধান–৩২ কিছুটা আগাম ও পাতাপোড়া রোগের আক্রমণ প্রতিরোধশীল।

৩. এ জাতের কাণ্ড ও পাতা হাল্কা সবুজ।

৪. ডিগপাতা খাড়া।

৫. ধান পাকার পরেও সবুজ থাকে।

৬. একমাস বয়সের চারার উচ্চতা ৩০ থেকে ৩৫ সেন্টিমিটার।

৭. পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১২০ সেন্টিমিটার।

৮. রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।

৯. ব্রিধান–৩২ পাতাপোড়া রোগে প্রতিরোধশীল।

১০. ব্লাস্ট, খোলপোড়া ও টুংরো রোগ মোটামুটি প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে।

১১. জীবনকাল (বীজ বপন থেকে ধান পাকা পর্যন্ত) স্বাভাবিক অবস্থায় ১২৫ থেকে ১৩০ দিন।

১২. ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে।

১৩. শীষ লম্বা।

১৪. ধানের গাঁথুনি বেশ ঘন।

১৫. প্রতি শীষে ধানের সংখ্যা গড়ে ১৬০টি।

১৬. পাকা ধানের রঙ সোনালি।

১৭. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২২ গ্রাম।

১৮. ফলন হেক্টর প্রতি ৫ টন–এর অধিক।

১৯. চাল মাঝারি মোটা ও স্বচ্ছ–সাদা।

২০. ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু।

২১. আমিষ (প্রোটিন) এবং এমাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৭.০ এবং ২৬.৩ ভাগ।

সংক্ষিপ্ত চাষ বৈশিষ্ট্য

১. ব্রিধান–৩২–এর চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী আমন জাতের মতই।

২. বন্যামুক্ত এলাকায় দোআঁশ, কাদা ও পলি–দোআঁশ জমি এ জাত চাষের উপযোগী।

৩. চারা শ্রাবণের শুরু থেকে ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোপণ করা যায়। তবে আষাঢ়ের মাঝামাঝি বীজ বপন করে ৩০ দিনের চারা রোপণ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়। দেরিতে বপন বা রোপণ করলে ফলন হ্রাস পায়।

৪. এক হেক্টর জমি রোপণ করতে প্রায় ২৫ কেজি বীজের প্রয়োজন।

৫. প্রতি বর্গমিটার কাদাময় বীজতলায় ১০০ গ্রাম বীজ অঙ্কুরিত অবস্থায় বপন করতে হয়।

৬. এই চারা ২০ সেন্টিমিটার পর পর সারিতে রোপণ করতে হয়। প্রতি সারিতে প্রতিটি গোছায় ২টি চারা রোপণ করতে হয়।

৭. জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হয়।

৮. ফসল খরা কবলিত হলে সম্পূরক সেচ দিতে হয়।

৯. ধানের চাল শক্ত হওয়া শুরু হলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হয়।

সার প্রয়োগ ও আগাছা দমন

১. জমির উর্বরতাভেদে সারের মাত্রা ভিন্নতর। তবে প্রতি হেক্টর জমিতে সাধারণত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ বা মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো—

ইউরিয়া	১৫০ কেজি
টিএসপি	১০০ কেজি
এমপি	৭০ কেজি
জিপসাম	৬০ কেজি
দস্তা	১০ কেজি (যেসব জমিতে দস্তার অভাব আছে)।

২. ইউরিয়া ছাড়া অন্য সব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

৩. ইউরিয়া সার সমান তিনভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত সময়ে তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম কিস্তি : রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে

দ্বিতীয় কিস্তি : রোপণের ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে

তৃতীয় কিস্তি : রোপণের ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে

৪. জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার সমভাবে ছিটানোর পর নিড়ানি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

৫. ইউরিয়া প্রয়োগের সময় জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়।

৬. ধানের জমিতে আগাছার ফলে ধান গাছের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে ফলন কমে যায়।

৭. আগাছা পোকা-মাকড় ও রোগবালাইরে আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। চারা রোপণের পর ৩০ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন।

ফসল কর্তন ও বীজ সংরক্ষণ

১. এ জাতের ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে। কাজেই ফসল কাটার জন্য জমিতে গিয়ে ধান পরীক্ষা করতে হয়।

২. শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ এবং শীষের নিচের অংশে শতকরা ২০ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে তখনই ফসল কর্তনের উপর্যুক্ত সময়।

৩. ধান কাটা বিলম্ব হলে শীষকাটা লেদাপোকার আক্রমণ হতে পারে। ধানের রঙ বিবর্ণ হয়।

৪. যে জমির ধানে মিশ্রণ নেই, ভালোভাবে পেকেছে, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয়নি সে জমির ধান বীজ হিসেবে রাখা যায়।

৫. বীজ হিসেবে রাখার ধান কেটে আনার সাথে সাথে মাড়াই করে ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। ধান মাড়াই ও শুকানোর সময় যেনো অন্য ধান মিশে না যায়।

৬. বীজ ধান শুকানোর পর ঠাণ্ডা করে পরিষ্কার পাত্রের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হয়।

৭. সংরক্ষিত বীজ ভালো আছে কি-না তা মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখতে হয় এবং প্রয়োজনে রোদে দিতে হয়।

১৪। ব্রিধান - ৩৩

১. ব্রিধান-৩৩ একটি উচ্চ ফলনশীল (উফশী) স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন (আগাম) আমন মৌসুমের জাত।

২. উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় বিজি-৩৮৮ এবং বিজি ৩৬৭-৪ দ্বয়ের মধ্যে সঙ্করায়ণপূর্বক যাচাই এর মাধ্যমে বিজি-৮৫০-২ কৌলিক সারিটি প্রাপ্ত।

৩. এই সারিটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ভালো ফলন দেয়ায় ১৯৯৭ সালে এটিকে ব্রিধান-৩৩ নামে ছাড় করা হয়েছে।

৪. এ জাতটি আগাম বিধায় এর ফলন কর্তনের পর একই জমিতে গম অথবা অন্যান্য রবিশস্য চাষের জন্য পর্যাপ্ত সময় থাকবে।

৫. ব্রিধান-৩৩ জাতটি ব্রিধান-৩২-এর চেয়ে ১০ দিন আগাম।

৬. সাদা-পিঠ গাছফড়িং পোকার আক্রমণ প্রতিরোধশীল।

৭. এ জাতের পাতাগুলো একটু চওড়া।

৮. ডিগপাতার আগার দিক থেকে ২-৩ সেন্টিমিটার নিচে কোচকানো ভাজ আছে।

৯. কাণ্ড ও পাতা ঘন সবুজ এবং খাড়া বিধায় সমানভাবে সূর্যের আলোয় পায় বলে অধিক শর্করা তৈরি করতে পারে।

১০. একমাস বয়সের চারার উচ্চতা ২৮ সেন্টিমিটার।

১১. পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১০ সেন্টিমিটার।

১২. কাণ্ড শক্ত বলে গাছ হেলে পড়ে না।

১৩. রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।

১৪. পাতাপোড়া রোগ এবং সাদা-পিঠ গাছফড়িং পোকার আক্রমণ প্রতিরোধশীল।

১৫. বীজ বপন থেকে ধান পাকা পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ১১৮ দিন জীবনকাল।

১৬. ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে।

১৭. পাকা ধানের রঙ ফিকে সোনালি।

১৮. ধানের খোসায় ভাঁজে ভাঁজে হাল্কা বাদামি রঙ আছে।
১৯. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৫ গ্রাম।
২০. উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাতের ফলন হেক্টর প্রতি ৫ টন–এর অধিক।
২১. চাল সাদা, খাটো, মোটা এবং চালের মাঝখানে সাদাটে দাগ থাকে। ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু। আমিষ (প্রোটিন) এবং এমাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৮.৭ এবং ২৬.৭ ভাগ।

সংক্ষিপ্ত চাষ বৈশিষ্ট্য

১. বিধ্রান–৩৩ চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী আমন জাতের মতোই।
২. বন্যামুক্ত এলাকায় দোআঁশ, কাদা ও পলি–দোআঁশ জমি এ জাত চাষের উপযোগী।
৩. ব্রিধান–৩১–এর বীজ বপন করে ৩০দিনের চারা শ্রাবণের শুরু থেকে ভাদ্রের মাঝামাঝি পর্যন্ত রোপণ করা যায়। তবে আষাঢ়ের মাঝামাঝি বীজ বপন করে ৩০দিনের চারা রোপণ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
৪. এক হেক্টর জমি রোপণ করতে প্রায় ২৫ কেজি বীজের প্রয়োজন।
৫. প্রতি বর্গমিটার কাদাময় বীজতলায় ১০০ গ্রাম বীজ অঙ্কুরিত অবস্থায় বপন করতে হয়।
৬. এ চারা ২০ সেন্টিমিটার পর পর সারিতে রোপণ করতে হয়। প্রতি সারিতে ১৫ সেন্টিমিটার পর পর প্রতি গোছায় ২টি চারা রোপণ করতে হয়।
৭. জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়।

সার প্রয়োগ ও আগাছা দমন

১. জমির উর্বরতাভেদে সারের মাত্রা ভিন্নতর। তবে প্রতি হেক্টর জমিতে সাধারণত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ বা মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো—

ইউরিয়া	১৫০ কেজি
টিএসপি	১০০ কেজি
এমপি	৭০ কেজি
জিপসাম	৬০ কেজি
দস্তা	১০ কেজি (যেসব জমিতে দস্তার অভাব আছে)।

২. ইউরিয়া ছাড়া অন্য সব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।
৩. ইউরিয়া সার সমান তিনভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত সময়ে তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম কিস্তি : ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে
দ্বিতীয় কিস্তি : রোপণের ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে
তৃতীয় কিস্তি : রোপণের ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে

৪. জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার সমভাবে ছিটানোর পর নিড়ানি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।
৫. ইউরিয়া প্রয়োগের সময় জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়।
৬. ধানের জমিতে আগাছার ফলে ধান গাছের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে ফলন কমে যায়।
৭. আগাছা পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে।
৮. চারা রোপণের পর ৩০ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন।
৯. এসময় জমি আগাছামুক্ত না রাখলে ফলন কমে যায়।

ফসল কর্তন ও বীজ সংরক্ষণ

১. এ জাতের ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে। কাজেই ফসল কাটার জন্য জমিতে গিয়ে ধান পরীক্ষা করতে হয়।
২. শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ এবং শীষের নিচের অংশে শতকরা ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে তখনই ফসল কর্তনের উপযুক্ত সময়।
৩. ধান কাটা বিলম্ব হলে ধান ঝরে পড়তে পারে এবং ধানের শীষ কাটা লেদাপোকার আক্রমণ হতে পারে। উপরন্তু ধানের রঙ বিবর্ণ হয়। সেজন্য ধান পাকার সাথে সাথেই কেটে মাড়াই করে শুকিয়ে নেয়া দরকার।
৪. যে জমির ধানে মিশ্রণ নেই, ভালোভাবে পেকেছে, রোগ ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ হয়নি এবং আগাছামুক্ত সে জমির ধান বীজ হিসেবে রাখা যায়।

১৫। ব্রিধান-৩৪

১. ব্রিধান-৩৪ বাংলাদেশের যশোর অঞ্চল থেকে সংগ্রহকৃত খাসকানি নামক একটি জাত থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি ১৯৯৭ ইং সনে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক সুগন্ধি জাত হিসেবে সারা দেশে রোপা আমন মৌসুমে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।
২. ব্রিধান-৩৪ একটি সুগন্ধি আলোক-সংবেদনশীল ধানের জাত।
৩. গাছের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবুজ।
৪. এক মাসের চারার উচ্চতা গড়ে ৪২ সেন্টিমিটার। এবং
৫. পূর্ণবয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১১৭ সেন্টিমিটার।
৬. কুশির সংখ্যা গড়ে ১০টি।
৭. জীবনকাল ১২৮ থেকে ১৩৫ দিন।
৮. কালোজিরা ধানের মতো ছোট।
৯. ঘ্রাণ কালোজিরার কাছাকাছি।
১০. পাকা ধানের খোসা উজ্জ্বল খড় বর্ণের।
১১. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ১০.৭ গ্রাম।
১২. ফলন হেক্টর প্রতি ২.৫-৩ টন।

১৩. এ জাতের ধানের পাতাপোড়া ও খোলপোড়া রোগের মাঝারি প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে।
১৪. চাল ছোট সরু, স্বচ্ছ ও সাদা।
১৫. চালের আমিষ ও এমাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৮.৬ ও ২৩.৫ ভাগ।

সংক্ষিপ্ত চাষ বৈশিষ্ট্য

১. এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য সনাতন রোপা আমন ধানের মতোই।
২. বন্যামুক্ত মাঝামাঝি উঁচু, বেলে-দোআঁশ জমি এ জাত চাষের উপযোগী।
৩. আষাঢ়ের মাঝামাঝি বীজতলা তৈরি করার সবচেয়ে ভালো সময়। তবে জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।
৪. বীজের পরিমাণ হেক্টর প্রতি ২০ কেজি।
৫. বীজতলায় আগাছা, পোকামাকড় ও রোগবালাই দেখা দিলে তা দমন করা একান্ত দরকার।
৬. চারা রোপণের উত্তম সময় শ্রাবণের মাঝামাঝি। এ সময়ে চারার বয়স হয় ৩০ দিনের মতো।
৭. চারা রোপণের জন্য সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার ও গুছি থেকে গুছির দূরত্ব ১৫ সেন্টিমিটার রাখতে হয়। প্রতি গুছিতে ২-৩টি চারা রোপণ করাই যথেষ্ট। তবে দেরিতে লাগালে প্রতি গুছিতে ৪-৫টি চারা রোপণ করা দরকার।
৮. ফসল খরা কবলিত হলে সম্পূরক সেচ দিতে হয়।
৯. ধানের চাল শক্ত হওয়া শুরু হলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হয়।

সার প্রয়োগ, আগাছ ও বালাই দমন

১. ভালো ফলনের জন্য সুষম সার ব্যবহার অপরিহার্য। তবে জমির উর্বরতাভেদে সারের মাত্রা কম বেশি হতে পারে। সাধারণত ব্রিধান-৩৪ এ সারের মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো—

ইউরিয়া	১৩৫ কেজি হেক্টর
টিএসপি	৮৫ কেজি হেক্টর
এমপি	৩৫ কেজি হেক্টর

২. ইউরিয়া সার ছাড়া অন্য সব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভালো করে মিশিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া সার চারার বাড়তির বিভিন্ন পর্যায়ে দুই কিস্তিতে সমানভাবে নিম্নলিখিত সময়ে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম কিস্তি : রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিন পর, এবং
দ্বিতীয় বা শেষ কিস্তি : রোপণের ৩০ থেকে ৩৫ দিন পর।

৩. ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগের পর হাত দিয়ে বা নিড়ানি যন্ত্রের সাহায্যে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে পারলে ভালো ফল আশা করা যায়। সেজন্য ইউরিয়া প্রয়োগের পরপরই আগাছা দমনের পরামর্শ দেয়া হয় যাতে করে আগাছা দমনের সাথে সারও মাটিতে মিশানো যায়।

৪. চারা রোপণের পর ৩০ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন। এ সময়ের মধ্যে আগাছা দমন না করলে যে ক্ষতি হয় পরবর্তীতে সারা মৌসুমে জমি ও আগাছা মুক্ত রেখেও তা পূরণ করা যায় না।

৫. সাধারণত যেসব পোকার উপদ্রব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলো হচ্ছে মাজরা, পামরি, চুঙ্গি, পাতামোড়ানো, সবুজ পাতা ফড়িং, বাদামি গাছফড়িং ও গান্ধী পোকা।

৬. পোকা দমনের জন্য সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা যেমন আলোর ফাঁদ ব্যবহার, জমিতে ডালপালা পুঁতে পোকাখেঁকো পাখির সাহায্যে নেয়া এবং প্রয়োজনে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শক্রমে কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফসল কর্তন ও বীজ সংরক্ষণ

১. শীর্ষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ এবং শীষের নিচের অংশে শতকরা ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে তখনই ফসল কর্তনের উপযুক্ত সময়।

২. যে জমির ধানের মিশ্রণ নেই, ভালোভাবে পেকেছে, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয়নি এবং আগাছামুক্ত সে জমির ধান বীজ হিসেবে রাখা যায়।

৩. ধান কাটার পর পরই মাড়াইয়ের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জায়গা বেছে নিতে হয়।

৪. বীজ ধান মাড়াই করার পর অন্ততপক্ষে ৪ থেকে ৫ বার রোদে শুকিয়ে বীজে পানির পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগে কমিয়ে আনতে হয়।

৫. ধান মাড়াই ও শুকানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেনো অন্য ধান মিশে না যায়।

৬. দাঁত দিয়ে বীজ কাটলে যদি কটকট শব্দ করে তাহলে বুঝতে হয় বীজ ঠিকমতো শুকিয়েছে।

৭. বীজ ভালোভাবে শুকানোর পর ঠাণ্ডা করে পরিচ্ছন্ন ও নিছিদ্র মাটির পাত্রে বা ড্রামে ভরে মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হয়।

৮. মাঝে মাঝে পাত্র খুলে বীজধান ভালো আছে কি-না দেখতে হয়।

৯. কোনো পোকায় আক্রান্ত হলে সাথে সাথে রোদে শুকাতে হয় এবং পুনরায় রেখে মুখ বন্ধ করে রাখতে হয়।

১৬। ব্রিধান-৩৫

১. ব্রিধান-৩৫ একটি মাঝারি জীবনকালসম্পন্ন বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী বোরো মৌসুমের জাত।

২. এটি উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় বিআর ২৬-৭-৪-১ এবং এআরসি ১৪৫২৯ কৌলিক সারিদ্বয়ের মধ্যে সঙ্করায়ণপূর্বক ধাপে ধাপে বাছাই ও যাচাই-এর মাধ্যমে বিআর-১৬৭৪-১৫-৪-১-৩-১-জে-২ কৌলিক সারিটি প্রাপ্ত।

৩. এ সারিটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বোরো মৌসুমে ভালো ফলন দেয়ায় ১৯৯৮ সালে এটিকে ব্রিধান ৩৫ নামে ছাড় করা হয়েছে।

৪. যেসব এলাকায় বাদামি গাছ ফড়িংয়ের আক্রমণ হয় সেসব এলাকার জন্য এ জাতটি বিশেষ উপযোগী।
৫. ব্রিধান-৩৫ একটি উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাত।
৬. কাণ্ড ও পাতা ঘন সবুজ ও খাড়া।
৭. পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৫ সেন্টিমিটার।
৮. কাণ্ড শক্ত বলে গাছ হেলে পড়ে না।
৯. রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।
১০. বাদামি গাছফড়িং প্রতিরোধী।
১১. পাতাপোড়া, খোলপচা, খোল ঝলসানো এবং ব্লাস্ট রোগে মোটামুটি প্রতিরোধশীল।
১২. জীবনকাল স্বাভাবিক অবস্থায় ১৫০ থেকে ১৫৫ দিন।
১৩. ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে।
১৪. ধানের রঙ ফিকে সোনালি এবং আকার ছোট ও মোটা।
১৫. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২০ গ্রাম।
১৬. ফলন হেক্টর প্রতি ৫ টন-এর অধিক।
১৭. চাল ছোট, মোটা ও স্বচ্ছ-সাদা।
১৮. ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু।
১৯. আমিষ (প্রোটিন) এমাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৭.৫ এবং ২৪.২ ভাগ।

চাষ বৈশিষ্ট্য

১. সেচ সুবিধাযুক্ত দোআঁশ, কাদা ও পলি-দোআঁশ জমি এ জাত চাষের উপযোগী।
২. পুরো অগ্রহায়ণ মাসই বীজতলা করার উপযুক্ত সময়। তবে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহে ব্রিধান-৩৫ এর বীজ বপন করে ৪০ থেকে ৪৫ দিনের চারা রোপণ করলে বেশি ফলন পাওয়া যাবে।
৩. এক হেক্টর জমি রোপণ করতে প্রায় ২৫ কেজি বীজের প্রয়োজন।
৪. প্রতি বর্গমিটার কাদাময় বীজতলায় ১০০ গ্রাম বীজ অঙ্কুরিত অবস্থায় বপন করতে হয়।
৫. এ চারা ২০ সেন্টিমিটার পর পর সারিতে রোপণ করতে হয়। প্রতি সারিতে ১৫ সেন্টিমিটার পর পর এবং প্রতি গোছায় দুটি চারা ব্যবহার করলেই যথেষ্ট।

সার প্রয়োগ ও আগাছা দমন

১. জমির উর্বরতাভেদে সারের মাত্রা ভিন্নতর। তবে প্রতি হেক্টর জমিতে সাধারণত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ বা মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো—

ইউরিয়া	২৭০ কেজি
টিএসপি	১৩০ কেজি
এমপি	১২০ কেজি
জিপসাম	৭০ কেজি
দস্তা	১০ কেজি (যেসব জমিতে দস্তার অভাব আছে)

২. ইউরিয়া ছাড়া অন্য সব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

৩. ইউরিয়া সার সমান তিনভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত সময়ে তিন কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম কিস্তি : রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে

দ্বিতীয় কিস্তি : রোপণের ৩০ থেকে ৪০ দিনের মধ্যে

তৃতীয় কিস্তি : রোপণের ৫০ থেকে ৫৫ দিনের মধ্যে

৪. জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার সমভাবে ছিটানোর পর হাতড়িয়ে বা নিড়ানি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

৫. ইউরিয়া প্রয়োগের সময় জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়।

৬. ধানের জমিতে আগাছার ফলে ধান গাছের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং পরিণামে ফলন কমে যায়।

৭. আগাছা পোকা মাকড় ও রোগ বালাইয়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। চারা রোপণের পর ৩০ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন।

পানি সেচ

১. এ জাতের চারা রোপণের পর অন্তত ৩০দিন জমিতে বেশি পানি না রেখে ছিপছিপে পানি রাখা ভালো। তাতে গাছে প্রচুর কুশি হয়।

২. ধানগাছে কাঁইচ থোড় হওয়া থেকে ধানের দুধ হওয়া পর্যন্ত সময়ে পানির প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকে। এ সময়ে জমিতে ৭ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পানি রাখা দরকার।

৩. ধানের চাল শক্ত হওয়া শুরু হলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হয়।

ফসল কর্তন ও বীজ সংরক্ষণ

১. এ জাতের ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে। কাজেই ফসল কাটার জন্য জমিতে গিয়ে ধান পরীক্ষা করতে হয়।

২. শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ফসল কাটতে হয়।

১৭। ব্রিধান-৩৬

১. ব্রিধান-৩৬ একটি স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন (আগাম) বোরো মৌসুমের শীত সহনশীল জাত।

২. এটি উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় আইআর-৬৪ এবং আইআর-৩৫২৯৩-১২৫-৩-২-৩ এর মধ্যে সঙ্করায়নপূর্বক বাছাই এর মাধ্যমে আইআর ৫৪৭৯১-১৯-২-৩ কৌলিক সারিটি বোরো মৌসুমে ভালো ফলন দেয়ায় ১৯৯৮ সালে এটিকে ব্রিধান-৩৬ নামে ছাড় করা হয়েছে। যেসব এলাকায় আগাম জাতের চাহিদা আছে অথবা বোরো ফসলের পর রোপা আউশ বা পাট চাষ করা হয় সেসব এলাকার জন্য এ জাতটি বিশেষ উপযোগী।

৩. ব্রিধান-৩৬ একটি উচ্চফলনশীল (উফশী) জাত।

৪. কাণ্ড ও পাতা ঘন সবুজ এবং খাড়া।
৫. পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ৮৫ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার।
৬. কাণ্ড শক্ত বলে গাছ হেলে পড়ে না।
৭. রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।
৮. ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধশীল।
৯. জীবনকাল ১৩৫ থেকে ১৪০ দিন।
১০. ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে।
১১. ধানের রঙ ফিকে সোনালি।
১২. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২০ গ্রাম।
১৩. ফলন হেক্টর প্রতি ৫টন-এর অধিক।
১৪. চাল লম্বা সরু ও স্বচ্ছ-সাদা।

সংক্ষিপ্ত চাষ পদ্ধতি

১. ব্রিধান-৩৬-এর চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো জাতের মতোই।
২. সেচ সুবিধাযুক্ত দোআঁশ, কাদা ও পলি-দোআঁশ জমি এ জাত চাষের উপযোগী।
৩. পুরো অগ্রহায়ণ মাসই বীজতলা করার উপযুক্ত সময়। তবে অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি ব্রিধান-৩৬-এর বীজ বপন করে ৩০ থেকে ৩৫ দিনের চারা রোপণ করলে বেশি ফলন পাওয়া যাবে।
৪. এক হেক্টর জমি রোপণ করতে প্রায় ২৫ কেজি বীজের প্রয়োজন।
৫. প্রতি বর্গমিটার কাদাময় বীজতলায় ১০০ গ্রাম বীজ অঙ্কুরিত অবস্থায় বপন করতে হয়।
৬. এ চারা ১৫ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর পর সারিতে রোপণ করতে হয়।
৭. জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়

সার প্রয়োগ

১. জমি উর্বরতাভেদে সারের মাত্রা ভিন্নতর। তবে প্রতি হেক্টর জমিতে সাধারণত বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো—

ইউরিয়া	২২০ কেজি
টিএসপি	১২০ কেজি
এমপি	৮৫ কেজি
জিপসাম	৬০ কেজি
দস্তা	১০ কেজি (যেসব জমিতে দস্তার অভাব আছে)।

২. ইউরিয়া ছাড়া অন্য সব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

৩. ইউরিয়া সার সমান তিনভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত সময়ে তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম কিস্তি : রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে

দ্বিতীয় কিস্তি : রোপণের ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে

তৃতীয় কিস্তি : রোপণের ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে।

৪. জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার সমভাবে ছিটানোর পর হাতড়িয়ে বা নিড়ানী দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া প্রয়োগের সময় জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়।

পানি সেচ

১. এ জাতের চারা রোপণের পর অন্তত ৩০ দিন জমিতে বেশি পানি না রেখে ছিপছিপে পানি রাখা ভালো। তাতে গাছে প্রচুর কুশি হয়।

২. ধানগাছে কাইচথোড় হওয়া থেকে ধানের দুধ হওয়া পর্যন্ত সময় পানির প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকে। এ সময়ে জমিতে ৩ থেকে ৪ ইঞ্চি পানি রাখা দরকার।

৩. শীষের অগ্রভাগের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ এবং শীষের নিচের অংশে শতকরা ২০ ভাগ ধানের চাল আংশিক শক্ত ও স্বচ্ছ হলে তখনই ফসল কর্তনের উপযুক্ত সময়।

৪. বোরো মৌসুমে ধান কাটার সময়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে। সেজন্য ধান পাকার সাথে সাথেই কেটে মাড়াই করে শুকিয়ে নেয়া দরকার।

৫. যে জমির ধানে মিশ্রণ নেই, ভালোভাবে পেকেছে, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয়নি এবং আগাছামুক্ত সে জমির ধান বীজ হিসেবে রাখা যায়।

১৮। ব্রিধান-৩৭

১. ব্রিধান-৩৭ রোপা আমন মৌসুমের একটি সুগন্ধী জাত।

২. এ ধানকে উচ্চ ফলনশীল কাটারিভোগও বলা যায়।

৩. এটি উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় বিআর-৫ এবং বাসমতি (ডি) জাতের মধ্যে সঙ্করায়নপূর্বক ধাপে ধাপে বাছাই ও যাচাইয়ের মাধ্যমে বিআর-৪৩৮৪-২টি-২-২-এইচআর-৩ কৌলিক সারিটি নির্বাচন করা হয়।

৪. এ সারিটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভালো ফলন দেয়ায় ১৯৯৮ সালে এটিকে ব্রিধান-৩৭ নামে ছাড় করা হয়েছে।

৫. এ জাতটি বন্যাপ্রবণ, জোয়ার ভাটা এবং লবণাক্ত অঞ্চল ছাড়া সারা দেশে চাষাবাদ করা যায়।

৬. ব্রিধান-৩৭-এর গাছ প্রচলিত কাটারিভোগ ধানের চেয়ে ১০-১৫ সেন্টিমিটার খাটো ও অনেক মজবুত এবং ৫ থেকে ৭ দিন নাবী।

৭. পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১২০ থেকে ১২৫ সেন্টিমিটার।

৮. কাণ্ড মোটামুটি শক্ত বলে স্বাভাবিক আবহাওয়ায় গাছ হেলে পড়ে না।

৯. এ ধানের শীষ দেখতে খুব সুন্দর।
১০. শীষে ধানের গাঁথুনি খুব ঘন।
১১. শীষের আগায় ২ থেকে ৪টা ধান পুষ্ট নাও হতে পারে।
১২. ধানের শেষ প্রান্ত কিঞ্চিৎ বাঁকা এবং অগ্রভাগে সূচালো থেকে ছোট শুঙ থাকে।
১৩. রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়। ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধশীল।
১৪. বীজ বোনা থেকে ধান পাকা পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ১৩৫ থেকে ১৪০ দিন জাতটি আলোক–সংবেদনশীল।
১৫. ধানের রঙ ফিকে সোনালি।
১৬. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ১৬ গ্রাম।
১৭. ফলন হেক্টর প্রতি ৩.৫ থেকে ৪.০ টন।
১৮. চাল মাঝারি চিকন ও স্বচ্ছ–সাদা এবং ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু, ঠিক কাটারিভোগের মতো।
১৯. প্রোটিন এবং এমাইলোজের পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৮.৫ এবং ২৪.০ ভাগ।

সংক্ষিপ্ত চাষ বৈশিষ্ট্য

১. বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধ হয় না, সহজেই পানি নিষ্কাশন করা যায় এবং গাছপালায় ছায়া কম পড়ে এমন জমি ব্রিধান–৩৭ চাষাবাদের জন্য উপযোগী।
২. দোআঁশ, কাদা ও পলি দোআঁশ জমি এ ধান চাষের উপযোগী।
৩. পুরো জুলাই মাস এ ধানের বীজ বপন করার সময়। তবে জুলাই মাসের মাঝামাঝিতে বীজ বপন করে ২৫ থেকে ৩০ দিনের চারা রোপণ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
৪. চারা রোপণের সময় সারি থেকে সারির দূরত্ব থাকবে ২০ × ১৫ সেন্টিমিটার।
৫. জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়।

সার প্রয়োগ

১. মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার প্রয়োগ করা উচিত। জৈব সার দেয়া জমিতে অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সার দিতে হয়। জমির উর্বরতাভেদে সারের মাত্রা ভিন্নতর। সাধারণত প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো—

ইউরিয়া	১৫০ কেজি
টিএসপি	১০০ কেজি
এমপি	৭০ কেজি
জিপসাম	৬০ কেজি
দস্তা	১০ কেজি

২. ইউরিয়া ছাড়া অন্য সব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

৩. ইউরিয়া সার সমান তিনভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত সময়ে তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম কিস্তি : রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে

দ্বিতীয় কিস্তি : রোপণের ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে

তৃতীয় কিস্তি : রোপণের ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে।

৪. জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার সমভাবে ছিটানোর পর নিড়ানী দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। এ সময় নিড়ানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইউরিয়া প্রয়োগের সময় জমি আগাছামুক্ত না রাখলে এর উপদ্রব বেড়ে যাবে।

সেচ পানি

১. এই জাতের চারা রোপণের পর অন্তত ৩০ দিন জমিতে বেশি পানি না রেখে ছিপছিপে পানি রাখা ভালো। তাতে গাছে প্রচুর কুশি হয়।

২. ধানগাছে কাইচথোড় হওয়া থেকে ধানের দুধ হওয়া পর্যন্ত সময়ে পানির প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকে। এ সময় জমিতে ৭ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পানি রাখা দরকার।

৩. ধানের চাল শক্ত হওয়া শুরু হলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হয়।

৪. এ ধান আলোক-সংবেদনশীল হওয়ায় নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে ফুল ফোটে। তাই এ সময় সম্ভাব্য খরা থেকে বাঁচার জন্য সম্পূরক সেঁচের ব্যবস্থা নিতে হয়।

ফসল কর্তন

১. এ জাতের ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে। কাজেই ফসল কাটার জন্য জমিতে গিয়ে ধান পরীক্ষা করতে হয়।

২. শীষের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে তখনই ফসল কর্তনের উপযুক্ত সময়।

৩. ধান কাটা বিলম্ব হলে পাখির উপদ্রব, শীষকাটা লেদাপোকার আক্রমণ এবং ধানের রঙ বিবর্ণ ইত্যাদি দুর্বিপাক ঘটে ও ফলন কমে যায়।

৪. মিশ্রণ নেই, রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয়নি এবং আগাছামুক্ত জমির ধান বীজ হিসেবে রাখা যায়।

১৯। ব্রিধান-৩৮

ব্রিধান-৩৮ রোপা আমন মৌসুমের একটি সুগন্ধী জাত। এ ধানকে উচ্চফলনশীল বাসমতি (ডি) ও বলা যায়। এটি উদ্ভাবন প্রক্রিয়ায় বিআর-৫ এবং বাসমতি (ডি) জাতের মধ্যে সঙ্করায়ণপূর্বক ধাপে ধাপে বাছাই ও যাচাই এর মাধ্যমে বিআর-৪৩৮৪-২ বি-২-২-৪ কৌলিক সারিটি নির্বাচন করা হয়। এই সারিটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভালো ফলাফল দেয়ায় ১৯৯৮ সালে এটিকে ব্রিধান-৩৮ নামে ছাড় করা হয়েছে।

বৈশিষ্ট্য

১. ব্রিধান-৩৮-এর গাছ বাসমতি (ডি) ধানের চেয়ে ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার খাটো ও অনেক মজবুত।

২. পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১২৫ থেকে ১৩০ সেন্টিমিটার।
৩. কাণ্ড মোটামুটি শক্ত বলে স্বাভাবিক আবহাওয়ায় গাছ হেলে পড়ে না।
৪. এ ধানের শীষে ধানের গাঁথুনি একটু পাতলা।
৫. ধানের শেষপ্রান্ত কিঞ্চিৎ বাঁকা এবং অগ্রভাগে লম্বা শুঙ থাকে।
৬. রোগ ও পোকার আক্রমণ কম হয়।
৭. ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো।
৮. জীবনকাল (বীজ বপন থেকে ধান পাকা পর্যন্ত) স্বাভাবিক অবস্থায় ১৩৫ থেকে ১৪০ দিন। এ জাতটি আলোক-সংবেদনশীল।
৯. ধানের রঙ ফিকে সোনালি।
১০. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২২ গ্রাম।
১১. ফলন হেক্টর প্রতি ৩.৫ থেকে ৪.০ টন।
১২. চাল লম্বা ও চিকন এবং স্বচ্ছ-সাদা।
১৩. ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু, ঠিক বাসমতি (ডি)-এর মতো।
১৪. প্রোটিন এবং এ্যামাইলোজ এর পরিমাণ যথাক্রমে শতকরা ৮.০ এবং ২৩.৮ ভাগ।
১৫. আন্তর্জাতিক মানের এ চাল দিয়ে বাংলাদেশ সুগন্ধী চাল রপ্তানি বাজারে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়।

BANSDOC Library Dhaka

সংক্ষিপ্ত চাষ বৈশিষ্ট্য

১. বৃষ্টির পানিতে জলাবদ্ধ হয় না, সহজেই পানি নিষ্কাশন করা যায় এবং গাছপালায় ছায়া কম পড়ে এমন জমি ব্রিধান-৩৮ চাষাবাদের জন্য উপযোগী।
২. দোআঁশ, কাদা ও পলি-দোআঁশ জমি এ ধান চাষের উপযোগী।
৩. পুরো জুলাই মাস এ ধানের বীজ বপন করার সময়। তবে জুলাই মাসের মাঝামাঝিতে বীজ বপন করে ২৫ থেকে ৩০ দিনের চারা রোপণ করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।
৪. চারা রোপণের সময় সারি থেকে সারির দূরত্ব থাকবে ২০ × ১৫ সেন্টিমিটার।

সার প্রয়োগ

১. মাটির উর্বরতা সংরক্ষণের জন্য হেক্টর প্রতি ৫ টন জৈব সার প্রয়োগ করা উচিত। জৈব সার দেয়া জমিতে অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সার দিতে হয়। জমির উর্বরতাভেদে সারের মাত্রা ভিন্নতর। সাধারণত হেক্টর প্রতি প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ বা মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো—

ইউরিয়া	১৫০ কেজি
টিএসপি	১০০ কেজি
এপি	৭০ কেজি
জিপসাম	৬০ কেজি
দস্তা	১০ কেজি (যেসব জমিতে দস্তার অভাব আছে)

২. ইউরিয়া ছাড়া অন্য সব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

৩. ইউরিয়া সার সমান তিনভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত সময়ে তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম কিস্তি : রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে

দ্বিতীয় কিস্তি : রোপণের ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে

তৃতীয় কিস্তি : রোপণের ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে।

৪. জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার সমভাবে ছিটানোর পর নিড়ানি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। এ সময় নিড়ানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ ইউরিয়া প্রয়োগের সময় জমি আগাছামুক্ত না রাখলে আগাছার উপদ্রব বেড়ে যাবে।

পানি সেচ

১. এ জাতের চারা রোপণের পর অন্তত ৩০ দিন জমিতে বেশি পানি না রেখে ছিপছিপে পানি রাখা ভালো।

২. ধানগাছে কাঁইচথোড় হওয়া থেকে ধানের দুধ হওয়া পর্যন্ত সময়ে পানির প্রয়োজনীয়তা বেশি থাকে। এ সময়ে জমিতে ৭ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পানি রাখা দরকার।

৩. ধানের চাল শক্ত হওয়া শুরু হলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হয়।

৪. এ ধান আলোক-সংবেদনশীল হওয়ায় নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহে ফুল ফোটে। তাই এ সময় সম্ভাব্য খরা থেকে বাঁচার জন্য সম্পূরক সেচের ব্যবস্থা নিতে হয়।

ফসল কর্তন

১. এ জাতের ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে। কাজেই ফসল কাটার জন্য জমিতে গিয়ে ধান পরীক্ষা করতে হয়।

২. শীষের শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে তখনই ফসল কর্তনের উপযুক্ত সময়।

৩. ধান কাটা বিলম্ব হলে পাখির উপদ্রব, শীষকাটা লেদাপোকার আক্রমণ, ধানের রঙ বিবর্ণ হওয়া ইত্যাদি দুর্বিপাক ঘটে ও ফলন কমে যায়।

২০। ব্রিধান-৩৯

১. ব্রিধান-৩৯ একটি ফলনশীল (উফশী) আমন মৌসুমের স্বল্প জীবনকালসম্পন্ন (আগাম) জাত।

২. এটি প্রক্রিয়ায় বিআর ১১৮৫-২বি-৫৬-২-১-১, বিআর ১৬৭৪-২৮-৩-১-১ ও বি আর ২৫৫৮-৭-৩-২-২ কৌলিক সারিগুলোর মধ্যে সঙ্করায়ণপূর্বক বাছাই এর মাধ্যমে বিআর ৫৯৬৯-৩-২ কৌলিক সারিটি উদ্ভাবিত হয়।

৩. এ সারিটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আমন মৌসুমে ভালো ফলাফল দেয়ায় ১৯৯৯ ব্রিধান ৩৯ নামে ছাড় করা হয়েছে।

৪. ব্রিধান-৩৯ এর কাণ্ড শক্ত তাই ঢলে পড়া প্রতিরোধ করতে পারে।

৫. এ জাতের কাণ্ড ও পাতা সবুজ।
৬. ডিগপাতা খাড়া ও স্বাভাবিকের চেয়ে চওড়া।
৭. ধান পাকার পরেও সবুজ থাকে।
৮. একমাস বয়সের চারার উচ্চতা ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার।
৯. পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৫ সেন্টিমিটার।
১০. ব্রিধান-৩৯ পাতাপোড়া ও টুংরো রোগ প্রতিরোধসম্পন্ন।
১১. এ ধানের জীবনকাল স্বাভাবিক অবস্থায় ১২০ থেকে ১২৫ দিন।
১২. পাকা ধানের রঙ সোনালি সাদা।
১৩. ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২২ গ্রাম।
১৪. ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৫ টন।
১৫. চাল লম্বা ও চিকন এবং স্বচ্ছ-সাদা।

চাষ পদ্ধতি

১. বন্যামুক্ত এলাকায় দোআঁশ, কাদা ও পলি-দোআঁশ জমি এ জাত চাষের উপযোগী।
২. আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে শ্রাবণের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ব্রিধান-৩৯-এর বীজ বপন করে ২৫ দিনের চারা রোপণ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।
৩. এক হেক্টর জমি রোপণ করতে প্রায় ২০ থেকে ২৫ কেজি বীজের প্রয়োজন।
৪. প্রতি বর্গমিটার কাদাময় বীজতলায় ১০০ গ্রাম বীজ অঙ্কুরিত অবস্থায় বপণ করতে হয়।
৫. সারি থেকে সারি ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে এবং প্রতি সারিতে ১৫ সেন্টিমিটার পর পর গোছা প্রতি ২টি করে চারা ব্যবহার করা উচিত।
৬. জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়।
৭. ধানের চাল শক্ত হওয়া শুরু হলেই জমি থেকে পানি সরিয়ে দিতে হয়।
৮. এ জাত আলোক-সংবেদনশীলতা নেই এবং ব্রিধান-৩২-এর চেয়ে ৮ থেকে ১০ দিন আগাম। জমি ভেদে আষাঢ়ের ১৫ তারিখে বীজ বপন করে ২০ থেকে ২৫ দিনের চারা রোপণ করলে কার্তিকের ১৫ তারিখে ফসল কর্তন করা যায়। ফলে সে জমিতে সঠিক সময়ে গম, ডাল, সরিষা, কলাই ইত্যাদি রবিশস্য বপন করা যায়।
৯. সাধারণত প্রতি হেক্টর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ বা মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো—

ইউরিয়া	১৫০ কেজি
এমপি	১৭০ কেজি
টিএসপি	১০০ কেজি
জিপসাম	৬০ কেজি
দস্তা	১০ কেজি (যেসব জমিতে দস্তার অভাব আছে)।

১০. ইউরিয়া ছাড়া অন্য সব সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ছিটিয়ে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

১১. ইউরিয়া সার সমান তিনভাগে ভাগ করে নিম্নোক্ত সময়ে তিন কিস্তিতে উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

প্রথম কিস্তি : রোপণের ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে

দ্বিতীয় কিস্তি : রোপণের ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে

তৃতীয় কিস্তি : রোপণের ৪০ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে।

১২. জমিতে ছিপছিপে পানি থাকা অবস্থায় ইউরিয়া সার সমভাবে ছিটানোর পর হাত দিয়ে বা নিড়ানি দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। ইউরিয়া প্রয়োগের সময় জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়।

ফসল কর্তন

১. এ জাতের ধান পেকে গেলেও গাছ সবুজ থাকে। কাজেই ফসল কাটার জন্য জমিতে গিয়ে ধান পরীক্ষা করতে হয়।

২. শীষের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে তখনই ফসল কর্তনের উপযুক্ত সময়।

২১। বিনাধান-৫

১. এটি একটি উচ্চ ফলনশীল ও ভালো গুণাগুণ সম্পন্ন বোরো জাত।

২. চারার উচ্চতা অন্যান্য উফশী বোরো জাতের চারা অপেক্ষা বেশি বলে শীতকালে রোপা লাগানোর সুবিধা হয়।

৩. বোরোর অন্যান্য জাত অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে লম্বা।

৪. পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১০ থেকে ১১৫ সেন্টিমিটার।

৫. গাছ লম্বা বিধায় বেশি পরিমাণ খড় পাওয়া যায়।

৬. বিআর-২৯ অপেক্ষা ৫ থেকে ৭ দিন আগে পাকে।

৭. বীজ বপন হতে কাটা পর্যন্ত এর জীবনকাল ১৫০ থেকে ১৫৫ দিন।

৮. গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫ থেকে ৬ টন। যথোপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টর প্রতি ৭ টনের অধিক ফলন দেয়।

৯. এ জাত বিভিন্ন রোগ যথা— পাতাপোড়া, খোলপচা ইত্যাদি রোগ তুলনামূলকভাবে প্রতিরোধ করতে পারে।

১০. মাজরাপোকা, সবুজ পাতাফড়িং বাদামি গাছফড়িং ইত্যাদি পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে এ জাতে বেশি।

১১. এ জাতের ধান ও চাল মাঝারি লম্বা ও সরু।

২২। বিনাধান - ৬

১. এটি একটি উচ্চ ফলনশীল ও ভালো গুণাগুণ সম্পন্ন বোরো ধানের জাত।

২. চারার উচ্চতা অন্যান্য উফশী বোরো জাতের চারা অপেক্ষা বেশি বলে শীতকালে রোপা লাগানোর সুবিধা হয়।

৩. বোরো ধানের অন্যান্য জাত অপেক্ষা তুলামূলকভাবে লম্বা।

৪. পূর্ণবয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৫ থেকে ১২০ সেন্টিমিটার।

৫. গাছ লম্বা বিধায় বেশি পরিমাণ খড় পাওয়া যায়।

৬. বীজ বপন হতে কাটা পর্যন্ত এর জীবনকাল ১৬০ থেকে ১৬৫ দিন।

৭. গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৫.৫ থেকে ৬.৫ টন (একর প্রতি ২.২ থেকে ২.৫ টন বা ৬০ থেকে ৭০ মন) যথোপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টর প্রতি ৮ টনের (একর প্রতি ৩.২ টন বা ৮৫ মন) অধিক ফলন দেয়।

৮. এ জাত বিভিন্ন রোগ যথা— পাতাপোড়া, খোলপোড়া, খোলপচা ইত্যাদি রোগ তুলনামূলকভাবে প্রতিরোধ করতে পারে।

৯. মাজরা পোকা, সবুজ পাতাফড়িং, বাদামি গাছফড়িং ইত্যাদি পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে এ জাতে বেশি।

১০. এ জাতের ধান ও চাউল মাঝারি মোটা।

সংক্ষিপ্ত চাষাবাদ বৈশিষ্ট্য

১. বিনাধান–৫ এবং বিনাধান–৬–এর চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল বোরো জাতের মতই। নিম্নে এ জাত দুটির চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বিবরণ দেয়া হলো।

২. চাষ উপযোগী জমি।

৩. বেলে দোআঁশ, দোআঁশ এবং এটেল–দোআঁশ জমি এ জাত দুটি চাষের উপযোগী।

৪. **পরিবেশ** উপযোগিতা।

৫. লবণাক্ত এলাকা ছাড়া দেশের প্রায় সব এলাকাতেই জাত দুটির চাষাবাদ করলে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব।

বীজ বাছাই ও শোধন

উপযুক্ত ফলন নিশ্চিত করতে হলে পুষ্ট ও রোগবালাইমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হয়। বপনের পূর্বে বীজ শোধন করা ভালো। বীজ শোধনের জন্য প্রতি ১০ কেজি বীজে ২৫ গ্রাম ভাইটাভ্যাক্স–২০০ ব্যবহার করলে ভালো হয়।

বীজের হার

প্রতি হেক্টর জমি চাষের জন্য ২৫ থেকে ৩০ কেজি।

বীজতলা তৈরি

ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু করে ৩য় সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ তলায় বীজ ফেলার উপযুক্ত সময়। ১০ কেজি বীজ ৫ শতাংশ বা ২০০ বর্গ মিটার বীজতলায় ফেলা যায়।

রোপণ পদ্ধতি

১. জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত ৪০ থেকে ৪৫ দিন বয়সের চারা সারি করে প্রতি গোছায় ৩/৪টি চারা রোপণ করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। সারি হতে সারির দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার এবং সারিতে এক গোছা হতে অন্য গোছা দূরত্ব ১৫ সেন্টিমিটার বজায় রেখে রোপণ করলে ভালো হয়।

সার প্রয়োগ

বীজতলার জন্য	প্রতি হেক্টরে
ইউরিয়া (কেজি)	১২৫ থেকে ১৫০
টিএসপি (কেজি)	৮৫ থেকে ১০০
এমপি (কেজি)	৬৫ থেকে ৭৫

রোপা ক্ষেতের জন্য	প্রতি হেক্টরে
ইউরিয়া (কেজি)	২১৫
টিএসপি (কেজি)	১৮০
এমপি (কেজি)	১০০

২. রোপা জমি তৈরি শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ পরিমাণ টিএসপি এবং এমপি জমিতে প্রয়োগ করে ভালোভাবে মই দিয়ে মিশিয়ে দিতে হয়।

৩. জমি তৈরির সময় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার প্রয়োজন নেই।

৪. সম্পূর্ণ পরিমাণ ইউরিয়ার এক চতুর্থাংশ চারা রোপণের ৭ থেকে ১০ দিন পর, অর্ধেক পরিমাণ ২৫ থেকে ৩০ দিন পর এবং বাকি এক চতুর্থাংশ ৫০ থেকে ৫৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হয়।

৫. অনুর্বর জমিতে সালফার এবং জিংক হেক্টর প্রতি যথাক্রমে ২০ কেজি ও ৪ কেজি (একর প্রতি ৮ কেজি ও ১.৬ কেজি) দেয়া যেতে পারে।

৬. ইউরিয়া প্রয়োগের সময় জমিতে ৫ থেকে ৭ সেন্টিমিটার পানি রাখা এবং আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন।

পরিচর্যা

১. ধানের এ জাত দুটির পরিচর্যা অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল বোরো জাতের মতোই।

২. চারা রোপণের পর আগাছা দেখা দিলে নিড়ানি যন্ত্র বা হাতের সাহায্যে আগাছা পরিষ্কার এবং মাটি নরম করতে হয়।

৩. ধানে থোড় আসার সময় ৫ থেকে ৭ সেন্টিমিটার পানি নিশ্চিত করতে হয়।

৪. ধান পাকার ১০ থেকে ১২ দিন আগে জমির পানি শুকিয়ে ফেলতে হয়।

রোগবালাই ও পেকামাকড় দমন

১. এ জাত দুটির রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনামূলক-ভাবে বেশি।

২. রোগবালাই দেখা দিলে যেমন পাতা পঁচার জন্য কপার অক্সি-ক্লোরাইড বা কুপ্রাভিট ৫০ ডাব্লিউপি এবং খোল পচার জন্য হোমাই ৮০ ডব্লিউপি বা টিল্ট একর প্রতি ১ থেকে ১.২ কেজি হারে ১০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে থোড় আসার সময় বা তারপর পরই স্প্রে করা যেতে পারে।

৩. ব্লাস্ট রোগ দমনের জন্য হিনাসান-৫০ ইসি বা টপসিন মিথাইল ৮০০ মিলিলিটার ৬০০ থেকে ১০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১ হেক্টর জমিতে স্প্রে করা যেতে পারে।

৪. এছাড়া জমিতে মাজরা পোকা, পাতাশোষক পোকা, ফড়িং বা অন্যান্য কীট-পতঙ্গের আক্রমণ হলে বাসুডিন-১০ জি (দানাদার) একর প্রতি সাত কেজি ছিটিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে বা ডাইমেক্রন-১০০ ইসি (তরল) ১০ সিসি পরিমাণ ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ২০০ বর্গমিটার (৫ শতাংশ) জমিতে স্প্রে করা যেতে পারে।

অসুবিধা

গাছ লম্বা বিধায় ধান পাকার সময় বেশি বাতাস বা ঝড়ে গাছ নুয়ে পড়তে পারে এজন্য ফসল পাকার সময় জমিতে পানি জমে না থাকা ভালো। এছাড়া ফসলের সময় বেশি লাগে বলে যেসব জমিতে আউশ আবাদ করা হয় সেসব জমিতে এ জাত দুটি চাষাবাদ না করা ভালো।

২৩। বিনাশাইল

বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবিত বিনাশাইল রোপা আমন মৌসুমে সারা দেশে চাষাবাদ করার জন্য ১৯৮৭ সালে অনুমোদন লাভ করে।

বংশ পরিচয় : ১৯৭৩ সালে দেশী ধান নাইজারশাইলে গামা রশ্মি প্রয়োগের মাধ্যমে বংশগতি ধারায় স্থায়ী পরিবর্তন আনয়ন করে এ জাতের উদ্ভাবন করা হয়েছে।

গাছের বৈশিষ্ট্য : ধান সরু ও উজ্জ্বল রঙের, চাল সাদা।

জীবনকাল : বিনাশাইলের জীবনকাল স্বাভাবিক সময়ে ১৪০ দিন এবং নাবী রোপা চাষে ১৩০ দিন।

ফলন : হেক্টর প্রতি ৫.০ টন এবং নাবী রোপায় ৪.০ টন।

পোকামাকড় ও রোগবালাই : এ ধান পাতাফোস্কা, পাতা ঝলসানো, পাতার খোলপচা ও কাণ্ডপচা ইত্যাদি রোগ মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারে।

২৪। পূর্বাচী

১৯৬৮ সালে পূর্বাচী বোরো মৌসুমে চাষ করার জন্য অনুমোদন লাভ করে। এটি আউশ মৌসুমেও চাষ করা হয়।

বংশ পরিচয় : পূর্বাচী গণচীনের ধান। সে দেশে এর নাম ছিলো চেনচুআই। আমাদের দেশে এটি চীনা ধান বা চীনা বোরো নামেও পরিচিত।

গাছের বৈশিষ্ট্য : ধানগাছ ৮৬ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। পাতা কিছুটা ছড়ানো এবং অপেক্ষাকৃত সবুজ। প্রতি গোছাতে ১৫ থেকে ১৬টি কুশি হয়। প্রতি কুশিতে ধানের ছড়ার সংখ্যা গড়ে ১২টি এবং ছড়ায় গড়ে ১১৫টি ধান হয়। চাল মোটা।

জীবনকাল : বোরো মৌসুমে ধান বোনা হতে পাকা পর্যন্ত ১৫০ দিন ও আউশ মৌসুমে ১১৫ দিন সময় লাগে।

ফলন : বোরো মৌসুমে হেক্টর প্রতি ৪.৫ টন ও আউশে ৩.৫ টন ফলন দিতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই : এ জাতের ধানে সবরকম রোগবালাই এবং পামরী পোকা, মাজরা পোকা এবং গলমাছির আক্রমণ হয়।

সঙ্করের (F_1) আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য

শিকড় সতেজ হয় : সঙ্কর ধানের একটি সরল মূলমন্ত্র গঠনের ক্ষমতা রয়েছে। এ ধানের মূলতন্ত্রের পরিমাণ ও গুণগত মান প্রচলিত জাতের চেয়ে উত্তম। প্রায় সকল উত্তম সঙ্কর ধানের জাত মূলের গভীরতা, মূলাঞ্চলের প্রশস্থতা গাছ প্রতি অস্থানিক মূলের সংখ্যা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যসমূহের জন্য উত্তম সঙ্করসাবল্য প্রদর্শন করে।

সবল কুশি উৎপাদন ক্ষমতা : গাছের অঙ্গজ পর্যায়ে দ্রুত বৃদ্ধি এবং বের না হওয়া পর্যন্ত তা ধরে রাখাই F_1 সঙ্কর ধানের বৈশিষ্ট্য। রোপণের ৩৭ দিন পর Shan-You 2 সঙ্কর জাতটি যেখানে ১১টি কুশি উৎপাদন করে সেখানে সাধারণ জাতটি (Gui-Zhao 2) প্রতি গোছায় ৮টি কুশি প্রদান করে।

বড় শীষ এবং ভারি দানা : চীনে যে সঙ্কর জাতটি শীর্ষস্থানে তাতে ছড়া প্রতি গড়ে প্রায় ১৫০টি দানা পাওয়া গেছে ; যার ১০০০ দানার ওজন ২৮ গ্রাম।

F_1 সঙ্করের **শারীরবৃত্তীয় উৎকৃষ্টতা**

শিকড়ের কার্যকারিতা : গাছের কুশি অবস্থা থেকে ছড়া বের হওয়া অবস্থা পর্যন্ত পর্যায়ে সঙ্কর জাতের শিকড়ের কার্যকারিতা এর তিনটি প্রজনক সারির চেয়ে বেশি, বিশেষ করে থোড় (booting) পর্যায়ে তা আরো বেশি হয়। সক্রিয় কুশি উৎপাদন প্রচলিত জাত থেকে বেশি হয়।

সালোকসংশ্লেষীয় এলাকা : সঙ্কর জাতের ধানে আগাম বৃদ্ধির পর্যায়ে সবুজ পাতার এলাকা দ্রুত বাড়ে। সাধারণ সঙ্কর জাতের ধানে সবুজ পাতার এলাকা পরিমাণ এর প্রজনক সারির চেয়ে বেশি হয়।

শ্বসন মাত্রা : শ্বসন মাত্রার জন্য সঙ্করসাবল্য সুস্পষ্টভাবে ঋণাত্মক। মধ্যবর্তী ও শেষ বৃদ্ধি পর্যায়ে সঙ্কর জাতে শ্বসন মাত্রা প্রচলিত জাতগুলোর তুলনায় ৫.৬% থেকে ২৭.১% কম।

সালোকসংশ্লেষীয় দক্ষতা : সঙ্করায়নে প্রজনকের সংখ্যা বৃদ্ধির পর্যায় এবং চাষাবাদের অবস্থার উপর সঙ্কর জাতের সালোকসংশ্লেষীয় কর্মদক্ষতা নির্ভরশীল। তবে কুশির বৃদ্ধি পর্যায়ে সঙ্কর জাতের এ কর্মদক্ষতা এর প্রজনকসমূহের চেয়ে বেশি দেখা যায়। এ বৃদ্ধির সাথে সবুজ পাতার এলাকা বৃদ্ধি পায়, ফলে উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদসমষ্টি দ্রুত প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

আত্মীকরণকৃত দ্রব্যের বন্টন : সঙ্কর ধান বেশি করে আত্মীকরণকৃত দ্রব্যাদিই জমা করে এবং পাতা ও পত্রাবরণ থেকে এসব দ্রব্যাদি পরিবহন করে। সম্পূর্ণ ছড়া পর্যায়ে সঙ্কর জাতের উপরের দিকের তিনটি পাতার শুষ্ক ওজন সাধারণ জাতের চেয়ে ৭০% বেশি হয়। সম্পূর্ণ ছড়া পর্যায়ে সঙ্কর জাতের পাতার আয়তনের প্রতি এককের শুষ্ক ওজন সাধারণ জাতের তুলনায় ১৩.৫% বেশি হয়।

সঙ্কর জাতে দানা ও খড়ের অনুপাত রেস্টোরার (restorer) সারি বা সাধারণ জাতের তুলনায় বেশি হয়।

F_1 সঙ্করের ফলনের উৎকৃষ্টতা

ধানের সঙ্কর জাত প্রচলিত বিশুদ্ধসারির জাতসমূহের চেয়ে ৩০% বেশি ফলন দিয়ে থাকে। চীনের দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশসমূহে আবাদকৃত সঙ্কর ধানের ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৫ মেট্রিক টন যা স্থানীয় জাতগুলোর ফলনের চেয়ে ২০% বেশি।

১৯৮১-১৯৮৬ পর্যন্ত IRRI-তে আবাদকৃত যাচাই জাতের বিপরীতে অনেকগুলো সঙ্কর জাতের ফলনের তুলনামূলক মূল্যায়ন করা হয়েছে। এসমস্ত সঙ্কর জাতের গড় ফলন সর্বোত্তম যাচাই জাতের চেয়ে ১৬% বেশি।

ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া, মালয়েশিয়া এবং ভিয়েতনামে অসংখ্য পরীক্ষণাধীন সঙ্কর জাতের গড় ফলন বৃদ্ধির হার যাচাই জাতের চেয়ে ৮.২৩% বেশি।

F_1 সঙ্কর ধান ও যাচাই জাতের ধানের তুলনামূলক ফলন, ১৯৮০-১৯৯২

দেশের নাম	সঙ্কর জাতসমূহের ফলন (টন/হেঃ)		যাচাই জাতের তুলনায় শতকরা	
	ব্যাপ্তি	গড়	ব্যাপ্তি	গড়
ভারত	৩.৩-৯.৮	৬.২	৯১-১৪৩	১১৬
ইন্দোনেশিয়া	৪.১-৮.৯	৬.২	১০৩-১৭০	১২২
কোরিয়া	৮.১-১২.১	৯.১	৯৭-১৪২	১২১
মালয়েশিয়া	৪.২-৫.০	৪.৭	৮৯-১২৭	১০৮
ফিলিপাইন	৪.৮-৭.৪	৫.৪	৯২-১৩৩	১১৪
ভিয়েতনাম	৪.৬-৭.৬	৫.৮	১০০-১৪৩	১২৩

শুধু ১৯৯৩ সালে ভিয়েতনামের উত্তর উঞ্চলের প্রদেশসমূহে ৪০,০০০ হেক্টর জমিতে সঙ্কর জাতের ধানের আবাদ হয়েছিলো যা থেকে ১,০০,০০০ টন বেশি ফলন পাওয়া গেছে।

সাইটোপ্লাজমীয় পু-বন্ধ্যাত্ব (Cytoplasmic male sterility)

ধান গাছ একটি প্রকৃত স্বপরাগায়িত উদ্ভিদ, সঙ্কর জাত উদ্ভাবনের জন্য একটি কার্যকর পুং বন্ধ্যা থাকতে হয় যেনো প্রচুর বীজ উৎপাদন করা যায়। বাণিজ্যিকভাবে ধানের সঙ্কর তৈরিতে সাইটোপ্লাজমীয় কৌলিক পুং বন্ধ্যাত্ব সিস্টেম (CMS)-এর ব্যবহারের সুফল জানা গেছে। CMS এবং উর্বরতা পুনঃস্থাপক (fertility restoration) সিস্টেমসমূহের জ্ঞান দিয়ে উদ্ভিদ সফলভাবে F_1 সঙ্কর জাত উদ্ভাবন করা যায়।

তিন সারির ধারণা

সঙ্কর জাত উদ্ভাবনে তিন ধরনের সারির ব্যবহার হয়েছে।

যেমন : ১. সাইটোপ্লাজমীয় কৌলিক পুং বন্ধ্যা সারি (CMS line/A line)

২. পুং বন্ধ্যাত্ব সংরক্ষণকারী সারি (maintainer line/B line)

৩. উর্বরতা পুনঃস্থাপক সারি (restorer line/R line)

সিএমএস সারি (CMS line/A line)

CMS সারি বলতে বিশেষ প্রজনন সারি বোঝায় যার পরাগধানী অস্বাভাবিক। এসব পরাগধানীতে কোনো পরাগ রেণু থাকে না বা থাকলেও তা অপরিণত অবস্থায় ঝরে পড়ে ফলে স্বপরাগায়নের মাধ্যমে (selfing) এসব সারিতে কোনো বীজ উৎপন্ন হয় না। একটি কাঙ্ক্ষিত CMS সারির স্বাভাবিক গর্ভাশয় এবং ভাল কৃষিতাত্ত্বিক গুণাবলীসহ নিচের বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়।

১. **স্থায়ী পুং বন্ধ্যাত্ব** (Stable male sterility) : পুং বন্ধ্যাত্ব (MS) এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে পরাগরেণুর বন্ধ্যাত্ব অক্ষুণ্ন রেখে সঞ্চারিত (inherited) হয়। পরিবেশের অবস্থা, এই বন্ধ্যাত্ব পরিবর্তিত হয় না।

২. **সহজ উর্বরতা পুনঃস্থাপন** (Easy restoration) : প্রস্তাবিত একটি ভাল পুং বন্ধ্যাত্ব (MS) পদ্ধতির ব্যাপক উর্বরতা পুনরুদ্ধার আওতা থাকতে হয় যেনো ভাল সঙ্করা পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৩. **ফুলের গঠন ও ফুল ধারণ ক্ষমতা ভাল :** CMS সারিতে স্বাভাবিকভাবে ফুল ফুটবে এবং পুং প্রজনকের সাথে CMS সারিতে একই সময়ে ফুল ফুটবে। CMS সারির ফুলের গর্ভমুণ্ড পুর্ণভাবে বিকশিত হয় এবং তা ফুল ফোটার সময় ও তার পরে কিছুটা বের হয়ে (exerted) আসবে। ধানের গ্লুম অনেকক্ষণ খুলে থাকবে এবং গ্লুম দুটি চওড়া কোণে যুক্ত থাকবে।

বন্ধ্যাত্ব সংরক্ষণকারী সারি (Maintainer line/B line)

B লইন হলো একটি সুনির্দিষ্ট পরাগায়ক জাত যা সংশ্লিষ্ট CMS সারির পরাগায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়। B সারির অনুপস্থিতিতে CMS সারি রক্ষা বা প্রজন্মান্তর (generation to generatio)–এর বীজ বর্ধন করা সম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে CMS সারি ও B সারি যমজ বলে মনে করা যেতে পারে। একটি বা দুটি বৈশিষ্ট্য ছাড়া এরা কৌলিক দিক থেকে একই রকম (isogenic)।

সিএমএস (CMS) সারি ও তার সংরক্ষণকারী সারির মধ্য পার্থক্য

বৈশিষ্ট্য	CMS সারি (A line)	সংরক্ষণকারী সারি (B line)
কুশি উৎপাদন ক্ষমতা	সবল, দীর্ঘস্থায়ী	—
শীষ বের হবার তারিখ	B সারির চেয়ে CMS সারিতে ৩ থেকে ৫ দিন পরে ছড়া আসে	—
ছড়া	খর্বাকৃতির মাঝারি উচ্চতার	ছড়া বর্ধিত
ফুল ফোটার প্রকৃতি	ফুল ফোটার সময় বিলম্বিত হয়, স্থায়িত্বকাল দীর্ঘ	ফুল ফোটার সময় এক সাথেও নির্দিষ্ট এবং গ্লুম খুলে রাখার সময় সংক্ষিপ্ত
পরাগধানীর আকার	সরু, পাতলা, সাদা বা হলুদাভ	বেশ মোটা ও ভরাট ভাবযুক্ত।
পরাগ রেণু	অনিয়মিত আকৃতির, I-KI দ্রবণে রঙ নেয় না ; গোলাকার, I-KI দ্রবণে রঙ নেয় না ; গোলাকার, I-KI দ্রবণে হালকা নীল রঙ নেয়	গোলাকার এবং I-KI দ্রবণে গাঢ় নীল রঙ ধারণ করে
উর্বরতা	স্বপরাগায়ন হয় না	স্বাভাবিক

উর্বরতা পুনঃস্থাপক সারি (Restorer line/ R line)

R সারি হলো একটি পরাগায়ক জাত যার দ্বারা CMS সারিকে পরাগায়ন করে F_1 সঙ্করসমূহে তৈরি করা হয়। F_1 সঙ্করসমূহের উর্বরতা স্বাভাবিক এবং এরা স্বপরাগায়নের (selfing) মাধ্যমে বীজ উৎপন্ন করে।

বৈশিষ্ট্য

ক. প্রবল উর্বরতা প্রদান বা পুনঃস্থাপক ক্ষমতা ;

খ. উৎকৃষ্ট কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয় ;

গ. CMS সারির তুলনায় R সারির গাছের উচ্চতা বেশি হয়। এর জীবনকাল CMS সারির সমান বা কিছুটা বেশি হয়।

ঘ. পরাগধানী পূর্ণ বিকশিত হয় (well-developed)।

সারির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক

যখন তিনটি সারিই বর্তমান থাকে তখনই শুধু বেশি পরিমাণে F_1 সঙ্কর উৎপাদন করা সম্ভব। প্রতি বছর CMS সারির বীজ বর্ধনের জন্য বিচ্ছিন্ন প্লটে A সারি B সারির সাথে একান্তরভাবে সারিতে রোপণ করা হয়। অন্য একটি আলাদা প্লটে F_1 সঙ্কর বীজ উৎপাদনের জন্য CMS সারি R সারির সাথে একান্তরভাবে রোপণ করা হয়।

পুং বন্ধ্যাত্ব ও উর্বরতা পুনঃস্থাপনের জেনেটিক কৌশল

বাণিজ্যিক উৎপাদনে ব্যবহৃত পুং বন্ধ্যাত্ব সারিই CMS–এর অন্তর্ভুক্ত। এ পদ্ধতিতে সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস উর্বরতা (fertility) নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকট (dominant) নিউক্লিয়ার জিন (R), পুং বন্ধ্যা সাইটোপ্লাজম সমৃদ্ধ গাছের উর্বরতা পুনঃস্থাপন করতে পারে। CMS সারি, পুং বন্ধ্যাত্ব সংরক্ষণকারী সারি, উর্বরতা পুনঃস্থাপক বা পুনঃস্থাপনকারী সারি এবং F_1 সঙ্করের জেনোটাইপ (genotype) হলো যথাক্রমে S (rr), N (rr), N(RR) বা S(RR) এবং S(Rr)।

CMS সারি শ্রেণিকরণ

সঙ্কর ধান নিয়ে গবেষণার বিস্তার লাভের সাথে সাথে অনেক পুং বন্ধ্যাত্ব উদ্ভব ঘটেছে। এসব CMS সারিকে বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা যায়।

কৌলিক বৈশিষ্ট্যভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

বন্ধ্যাত্ব প্রদানকারী জিনসমূহের কৌলিক আচরণের উপর ভিত্তি করে CMS সারিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় :

১. রেণু–উদ্ভিদীয় (Sporophytic)

২. জননকোষদ্ভিদীয় (Gametophytic)

রেণু–উদ্ভিদীয় পুংবন্ধ্যাত্ব : এ পদ্ধতিতে পরাগ রেণুর বন্ধ্যাত্ব বা উর্বরতা গাছের জেনোটাইপ দিয়ে নির্ধারিত হয় এবং বন্ধ্যাত্ব নির্ধারণে পরাগ রেণুর জেনোটাইপের নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই।

জননকোষদ্ভিদীয় পুং বন্ধ্যাত্ব : এ পদ্ধতিতে পরাগ রেণুসমূহের উর্বরতা সরাসরি পরাগ রেণু–এর জেনোটাইপ নির্ধারিত হয় এবং এখানে রেণু–উদ্ভিদ–এর জেনোটাইপ–এর কোনো ভূমিকা নেই। পরাগ রেণুর নিউক্লিয়াসের জিন R এবং r দিয়ে যথাক্রমে উর্বরতা ও বন্ধ্যাত্ব প্রদর্শিত হয়।

পুনঃস্থাপক এবং সংরক্ষক সারিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

পুনঃস্থাপক এবং সংরক্ষকের মধ্যে সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে প্রচলিত CMS সারিগুলো মূলত তিন গ্রুপে ভাগ করা যায়। গ্রুপ-১ WA ধরন, গ্রুপ-২ Hong-Lien ধরন এবং গ্রুপ-৩ BT ধরন।

WA ধরনের CMS সারিসমূহ : Wild abortive rice (WA) কে মাতৃ প্রজনক এবং আগাম পরিপক্ব Indica জাতসমূহকে পুং প্রজনক ধরে ফিরতি সঙ্করায়নের (back cross) মাধ্যমে WA ধরনের CMS সারিসমূহের উদ্ভব করা হয়।

Hong-Lien **ধরনের** CMS সারিসমূহ : লাল শুঙযুক্ত (red-awaned) বুনো জাতকে মাতৃপ্রজনক এবং আগামপরিপক্ব লম্বা ইন্ডিকা জাতকে আবর্তিত পুং প্রজনক (recurrent male parent) ধরে ফিরতি সঙ্করায়নের মাধ্যমে Hong-Lien type CMS সারিসমূহের উদ্ভব হয়েছে।

BT ধরনের CMS **সারিসমূহ :** CMS সারি Taichung 65 কিছু japonica CMS সারি, যেখানে BT-C থেকে বন্ধ্যা সাইটোপ্লাজম স্থানান্তর করা হয়েছে এবং japonica ধান Tian I-এর CMS সারিসমূহ BT ধরনের অন্তর্ভুক্ত।

জাপান ও চীনের অধিকাংশ *japonica* জাতসমূহ BT ধরনের উৎকৃষ্ট সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে। *japonica* ধানের বিদ্যমান পুনঃস্থাপক সারিসমূহের পুনস্থাপনকারী জিন মূলত *indica* জাতগুলো থেকে প্রাপ্ত।

বন্ধ্যা পরাগ রেণুর গঠনভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ

সাধারণত পুংরেণু গঠনের যে কোনো পর্যায়ে যে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে ধানে পুং বন্ধ্যাত্ব আসে। রেণু কোষ থেকে পুংরেণু তৈরি হওয়ার কৌশলে বাধাপ্রাপ্ত হলে পরাগ-মুক্ত ধরনের (pollen free type) পুং বন্ধ্যাত্ব দেখা দেয়, অপরদিকে পুংরেণুর বিকাশে এবং পরাগ রেণুর পরিপক্বতার কৌশলে কোনো অসুবিধা হলে নানা ধরনের পরাগ পাতনের (pollen abortion) সৃষ্টি হয়।

সঙ্কর ধান প্রজনন পদ্ধতি

সঙ্কর ধান প্রজনন পদ্ধতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

১. তিন সারি প্রজনন পর্যায়

২. সঙ্করসাবল্য মূল্যায়ন পর্যায়

ত্রিসারি বা তিন সারি প্রজনন

মূল নার্সারি

প্রজননের উদ্দেশ্য অনুযায়ী তিন সারির প্রজনকসমূহ এবং কৃষিতাত্ত্বিক ও জৈবিক গুণাবলীসম্পন্ন জার্মপ্লাজমসমূহ সঙ্করায়ণের জন্য রোঁপণ করা হয়।

CMS সারি এবং এদের সংরক্ষণকারী সারিসমূহ বিচ্ছিন্ন (isolated) প্লটে লাগাতে হয়। অন্যান্য জার্মপ্লাজমসমূহের প্রতিটির ১০ থেকে ২০টি গাছ প্লটে বা পাত্রে লাগানো হয়।

যাচাই সঙ্করায়ণ নার্সারি

F_1 সঙ্করসমূহের উর্বরতা শনাক্ত করা এবং পুনস্থাপক ও সংরক্ষক সারিকে বাছাই (Screen) করাই হলো যাচাই সঙ্করায়ণের উদ্দেশ্য। সাধারণত প্রত্যেক ক্রস সংযোগের জন্য ১০ থেকে ২০টি গাছ এক বা দু'সারিতে লাগানো হয়। প্রত্যেক ১০ থেকে ২০টি সঙ্কর সংযোগের পর একটি করে যাচাই জাত (check vareity) রোপণ করা হয়।

কোনো সুনির্দিষ্ট F_1 সংযোগে উর্বরতা পুনস্থাপিত এবং তুলনামূলকভাবে উত্তম গুণাবলী থাকলে আদি CMS সারির সাথে পুনঃযাচাই সঙ্করায়ণের মাধ্যমে এর পুং প্রজনককে পুনঃস্থাপক সারি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

পুনঃযাচাই সঙ্করায়ণ নার্সারি

পুনরায় পুংপ্রজনকের পুনস্থাপনের ক্ষমতা নির্ণয় করার জন্য পুনঃযাচাই সঙ্করায়ণ নার্সারিতে আদর্শ বাণিজ্যিক জাতের সাথে প্রত্যেক ক্রয় সংযোগের ১০০টি গাছ লাগানো হয়। এ নার্সারিতে F_1 –এর সঙ্করসাবল্যের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রদত্ত F_1টি যদি পুনরায় স্বাভাবিক বীজ উৎপাদন করে তবে এর পুং প্রজনককে উর্বরতা পুনঃস্থাপক সারি হিসেবে নিশ্চিত করা হয়।

পশ্চাৎ সঙ্করায়ণ নার্সারি

একটি সর্বোত্তম CMS সারি এবং এর সংরক্ষক সারি তৈরি করতে বন্ধ্যা সঙ্কর উদ্ভিদ এবং আবর্তিত পুং উদ্ভিদসমূহকে পশ্চাৎ সঙ্করায়ণ নার্সারিতে পাশাপাশি জোড়ায় জোড়ায় লাগাতে হয়। প্রজনকদ্বয়ের মধ্যকার সম্পর্কের দূরত্ব এবং প্রজননকারীর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরপর ৪ থেকে ৬ প্রজন্ম পর্যন্ত পশ্চাৎ সঙ্করায়ণ চালিয়ে যেতে হয়।

সঙ্করসাবল্যের মূল্যায়ন

নার্সারিতে সমন্বয় ক্ষমতা মূল্যায়ন

বিভিন্ন CMS এবং পুনস্থাপক সারির সঙ্করায়ণের উদ্ভূত সঙ্কর সংযোগসমূহ সমন্বয় ক্ষমতা মূল্যায়ন নার্সারিতে লাগানো হয়। এখান থেকে উৎকৃষ্টতম CMS এবং পুনস্থাপক নির্বাচন করা যায়।

ফলন পরীক্ষা

নির্বাচিত সম্ভাবনাময় সঙ্কর সংযোগসমূহকে প্রতিরূপ ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করা হয়। এ পরীক্ষায় ৩ থেকে ৪টি প্রতিরূপ (replication) ব্যবহার করা হয় এবং প্লটের আকার ২০ বর্গমিটার এর বেশি হয়। এক্ষেত্রেও কোনো একটি আদর্শ বাণিজ্যিক জাত বা স্থানীয় শীর্ষ সঙ্কর জাতকে control হিসেবে রাখা হয়।

আঞ্চলিক পরীক্ষা (Regional trial)

প্রত্যেক প্রজনন কেন্দ্র থেকে সুপারিশকৃত প্রতিশ্রুতিশীল সঙ্করসমূহকে আঞ্চলিক পরীক্ষার মাধ্যমে এদের উচ্চ ফলনশীলতার সামর্থ্য এবং বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়ার সাথে এদের অভিযোজন (adaptability) ক্ষমতার মূল্যায়ন করা হয়। সংগৃহীত উপাত্ত (data) সঠিক এবং নিখুঁত হতে হয়। আঞ্চলিক পরীক্ষার সাথে সাথে কৃষকের মাঠেও পরীক্ষা চালাতে হয়।

ভাল সঙ্কর সংযোগের জন্য প্রজনক নির্বাচন

ধানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সঙ্করসাবল্য ব্যবহারের জন্য সঙ্কর সংযোগ তৈরিতে প্রজনকের নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এজন্য নিচের ৫টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ।

কৌলিক বিভিন্নতা : সঙ্করসাবল্য ঘটানোর ভিত্তি হলো কৌলিক বিভিন্নতা। একটি নির্দিষ্ট সীমার ভিতর দুই প্রজনকের মধ্যে কৌলিক বিভিন্নতা যতো বেশি হয়, সঙ্করসাবল্যও ততো প্রবল হয়। এখানে কৌলিক বিভিন্নতা বলতে প্রজনক দুটির আলাদা ecotype–এর বা ভিন্ন উপপ্রজাতির (sub-species) হওয়া বোঝায়।

পরিপূরক বৈশিষ্ট্য : উভয় প্রজনকের ভাল গুণসমূহ F_1 এ প্রবিষ্ট করাতে পারলে অবশ্যই সেই F_1 টি, উত্তম প্রজনক সঙ্করসাবল্য প্রদর্শন করবে। উদাহরণস্বরূপ Shan You 6 সঙ্কর জাতটির মাতৃ–প্রজনক হলো যথাক্রমে Zhen-Shan 97A এবং IR 20। আগাম জাত, কুশি গজানোর ক্ষমতা দুর্বল, ১০০০ দানার ওজন বেশি। অপরদিকে পিতৃ প্রজনক হলো (BLB) প্রতিরোধী, নাবীজাত, কুশি গজানোর ক্ষমতা বেশি এবং দানার ওজন কিছুটা কম। যাহোক, সৃষ্ট F_1 সঙ্কর blast এবং BLB উভয়ই প্রতিরোধী, বর্ধনকাল দুই প্রজনকের গড়ের চেয়ে কিছুটা বেশি, কুশি গজানোর ক্ষমতা ভাল এবং দানার ওজনও গড়ের উপরে (above-average)।

সম্মিলন ক্ষমতা (Combining ability) : নতুন CMS পুনঃস্থাপক সারি উদ্ভব হওয়ার পর সঙ্করায়ণের জন্য অন্যভাবে প্রজনক নির্বাচন এড়াতে উদ্ভাবিত সারিসমূহের সমন্বয় ক্ষমতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। যেসমস্ত প্রজনকের কুশি গজানোর ক্ষমতা, গাছ প্রতি ছড়ার সংখ্যা, ছড়া প্রতি পুষ্ট দানার সংখ্যা, ১০০০ দানার ওজন এবং গাছ প্রতি দানার ওজন ইত্যাদি গুণাবলীর সাধারণ সমন্বয় ক্ষমতা বেশি সেগুলো নির্বাচন করতে হয়।

সঞ্চারণ ক্ষমতা (Heritability) : উচ্চ সঞ্চারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈশিষ্ট্য বলতে এর মূল্য অংশ যে প্রজনকে কর্তৃক বংশানুসারিত (inherited) হয় এবং পরিবেশ দ্বারা স্বল্প প্রভাবিত হয় তা নির্দেশ করে। উৎপাদনশীল শীষ গাছ প্রতি দানার ওজন, কুশি গজানোর ক্ষমতা ইত্যাদি দুর্বল সঙ্কারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ; জীবনকাল, পাকা ধানের % এবং ১০০০ দানার ওজন সবল সঞ্চারণক্ষম।

বেশি ফলন দেয়ার ক্ষমতা : একটি সঙ্কর ধানের জাত তখনই ভাল ফলন দেবে যখন এর এক বা উভয় প্রজনক উচ্চ ফলন দেয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়।

ভাল দানার জন্য সঙ্কর ধানের প্রজনন

উত্তম গুণসম্পন্ন দানার প্রচলিত ধানের জাতগুলোর ফলন কম। সঙ্কর ধানের প্রজনকে উচ্চ ফলনের সাথে দ্রুত ভাল গুণসম্পন্ন দানার সমন্বয় ঘটানোর সুবিধা রয়েছে। তবে F_1 গাছে উৎপন্ন ধানের দানার মধ্যে কিছু কিছু গুণপ্রদানকারী বৈশিষ্ট্যের কৌলিক পৃথকীকরণ পরিলক্ষিত হয়, কারণ F_1 গাছ থেকে সংগৃহীত বীজ হলো F_2 প্রজন্মের বীজ।

শীষ ধান পুনরুদ্ধার (Head rice recovery) : সঙ্কর ধানে শীষ ধান পুরুদ্ধার উত্তম প্রজনকের চেয়ে কম বা বেশি হতে পারে। তাই বিচক্ষণভাবে প্রজনকসমূহ নির্বাচনের মাধ্যমে অধিক শীষ ধান পুনরুদ্ধারসম্পন্ন সঙ্কর জাত পাওয়া যেতে পারে।

চক–সদৃশ্যতা এবং সস্য–স্বচ্ছতা : বাজারে গ্রহণযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে দানার চক–সদৃশ্যতা এবং সস্য–স্বচ্ছতা উল্লেখযোগ্য। দানার চক–সদৃশ্যতা শীষধান পুনরুদ্ধার এর মতোই কৌলিক বৈশিষ্ট্য সঙ্কর জাতে ভাল দানা পেতে হলে এদের প্রজনকদ্বয় চক সদৃশ্যতা মুক্ত হয়

অথবা তাদের মধ্যে খুব কম পরিমাণে চক-সদৃশ্যতা থাকবে। F_2 দানায় সস্য-স্বচ্ছতার পৃথকীকরণের কারণে চালের বাজারে এর গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দেয়।

সুগন্ধ (Aroma) : ধানের সুগন্ধ প্রছন্ন জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুগন্ধযুক্ত A সারি (aromatic A line)-এর সাথে সুগন্ধহীন পুনস্থাপক সারির সঙ্করায়ণ বা এর বিপরীত ক্রমে (vice versa) (A x R, R x A) খুব অল্প পরিমাণ F_2 দানায় সুগন্ধ পাওয়া যায়।

CMS সারি এবং এর সংরক্ষক সারির প্রজনন

ধানের CMS সারি প্রজননের জন্য প্রথম প্রয়োজন পুং বন্ধ্যা গাছ এবং এ বন্ধ্যাত্ব সঞ্চারণক্ষম হতে হয়। দ্বিতীয়ত এ বন্ধ্যাত্ব স্থায়ী এবং একই পদ্ধতিতে এর সংরক্ষক সারির উদ্ভাবন হতে হয়। পুং বন্ধ্যা গাছের প্রকৃতি (type) এবং উৎপত্তিতে (origin) বিভিন্নতা রয়েছে সেহেতু এদের বন্ধ্যাত্বের স্থায়ীত্বের পদ্ধতিও একরকম নয় এবং তাদের বন্ধ্যাত্বের স্থায়িত্বের পথে অসুবিধার মাত্রাও ভিন্ন রকম। CMS সারি এবং সংরক্ষক সারির উদ্ভাবনের তিনটি উপায় আছে :

১. সরাসরি বিদ্যমান CMS সারি এবং এর ব্যবহার করা ;
২. বিদ্যমান CMS সারি থেকে বন্ধ্যা সাইটোপ্লাজম নতুন জাতে স্থানান্তর করা ;
৩. নতুন বন্ধ্যা সাইটোপ্লাজম দিয়ে CMS সারি সৃষ্টি করা।

বিদ্যমান CMS সারিতে প্রবর্তন

CMS সারি প্রজনন কর্মসূচির মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক এবং কার্যকর উপায় হলো বিদ্যমান সারিসমূহকে প্রবর্তন করা এবং এদের মধ্যে থেকে এমন সব উৎকৃষ্ট সারি খুঁজে বের করা যা স্থানীয় পরিবেশে বা এলাকায় সরাসরি ব্যবহারের উপযোগী।

অভিযোজিতা পর্যবেক্ষণ

প্রবর্তিত CMS সারিসমূহের এবং তাদের সংরক্ষক সারিসমূহের বীজ স্বাভাবিক আবাদ মৌসুমে বপন করা হয় এবং পরবর্তীতে গোছা প্রতি একটি চারা পাশাপাশিভাবে রোপণ করা হয়। অভিযোজিতা পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে বৃদ্ধি সচেজতা, অভিন্নতা, কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, রোগবালাই ও কীটপতঙ্গ প্রতিরোধীতা ও ফুল ফোটার ধরন উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে চীনে ব্যবহৃত CMS সারিসমূহের বৈশিষ্ট্য (উদাহরণস্বরূপ)

CMS সারির নাম	সাইটোপ্লাজমের প্রকার	নিউক্লিয়াসের জাত	উৎস প্রকার	কৌলিক ধরন
V 20 A	MS বুনো ধান (WA)	V20	ইন্ডিকা	রেণুদ্ভিদীয়
Zhen-Shan 97A	MS বুনো ধান (WA)	Zhen-Shan-97	ইন্ডিকা	রেণুদ্ভিদীয়
Zhi A	MS বুনো ধান (WA)	Gang-Zhi-Zhan	ইন্ডিকা	রেণুদ্ভিদীয়
Li-Ming-A	Chinsurah Boro II	Li-Ming	জাপেনিকা	জনন-কোষদ্ভিদীয়
Liu-Qian-Zin A	Chinsurah Boro II	Li-Qian-Xin	জাপেনিকা	জনন-কোষদ্ভিদীয়

D-Shan-A	Dissi	Zhen-Shan 97	ইন্ডিকা	রেণুভিদীয়
Zin-Si-Ai A	লালশুংবিশিষ্ট বুনো ধান	Qin-Si-Ai	ইন্ডিকা	জনন-কোষভিদীয়
You-I A	ইন্দোনেশিয়া 6	Xie-Qing-Zao	ইন্ডিকা	রেণুভিদীয়

পুং বন্ধ্যাত্ব পরিদর্শন

ছড়া বের হওয়ার পর নিম্নলিখিত পদ্ধতি ব্যবহার করে পুং বন্ধ্যাত্ব সনাক্ত করা হয়।

চাক্ষুষ পর্যবেক্ষণ : ফুল ফোটার সময় বা কয়েক ঘণ্টা পরে খালি চোখে সরাসরি পুং বন্ধ্যা গাছের পরাগধানীর ভরাটভাব (plumpness) এবং রঙ পরীক্ষা করতে হয়। যেসব ধানগাছের পরাগধানী ফেটে যায় তাদের পুং বন্ধ্যাত্ব সন্তোষজনক নয় বলে বিবেচিত হয়।

ছড়া ব্যাগ দিয়ে আবৃতকরণ : যখন পুং বন্ধ্যা গাছে ছড়া বের হওয়া শুরু হয় কিন্তু এদের পুষ্পিকাগুলো (floret) তখনো ফোটেনি, সেক্ষেত্রে ছড়াগুলোকে স্বপ্রজননের জন্য মসৃণ উজ্জ্বল (glossy) ব্যাগ দিয়ে ঢাকাতে হয়। সাধারণত গাছ প্রতি ২টি ছড়াকে ঢাকাতে হয়।

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ : বিভিন্ন ছড়ার বিভিন্ন অংশ থেকে পরাগধানীর নমুনা সংগ্রহপূর্বক স্লাইড-এর উপর পিষে এক ফোটা I-KI দ্রবণ দিয়ে হাল্কা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করা হয়। স্বাভাবিক উর্বর পরাগরেণু গোলক আকৃতি (spherical) এবং I-KI দ্রবণে ঘন নীল (dark blue) রঙ নেয়।

CMS সারির উৎসের স্থানান্তর

নতুন CMS সারি তৈরিতে CMS উৎস স্থানান্তর একটি কার্যকরী, সুবিধাজনক ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এ পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল নিম্নোক্ত ধাপগুলোতে প্রদান করা হয়।

যাচাই সঙ্করায়ণ : আকাঙ্ক্ষিত জাত বা প্রজনন সারিসমূহ নির্বাচন করতে হয় এবং প্রত্যেকটি গাছকে আলাদাভাবে একটি বিদ্যমান CMS সারির সাথে জোড়া বেঁধে সঙ্করায়ণ করতে হয়।

বন্ধ্যাত্ব সনাক্তকরণ (Sterility identification) : প্রত্যেক সংযোগের F_1 গাছসমূহ এর পুং প্রজনকের সাথে পাশাপাশি জন্মানো হয়। যখন ছড়া বের হওয়া শুরু হয়, তখন প্রত্যেক সংযোগের F_1 পুং বন্ধ্যা গাছ পাওয়ার হাত (ferquency) এবং এর পুং বন্ধ্যাত্বের মাত্রা (degree) সম্পর্কে সতর্ক পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করতে হয়।

পুনঃপুন ফিরতি সঙ্করায়ণ (Successive back crossing) : যেসব সংযোগের F_1 সঙ্কর সম্পূর্ণভাবে পুং বন্ধ্যাত্ব প্রদর্শন করে এবং পুষ্পায়ন স্বভাব উত্তম, তাদেরকে নির্বাচিত করে ক্রমাগত তাদের,মূলগুলোকে পুং প্রজনকের সাথে ফিরতি সঙ্করায়ন করা হয়।

নিউক্লিয়াস প্রতিস্থাপন ক্রস : নতুন বন্ধ্যা সাইটোপ্লাজমের উৎস ব্যবহার করে CMS সারির প্রজনকে তিন প্রকার ক্রস (cross) ব্যবহার করা হয় :

আন্তঃপ্রজাতি ক্রস : এক্ষেত্রে বুনো প্রজাতির ধানের সাথে *Oryza glaberrima*-এর বিভিন্ন জাত ও উপজাতসমূহের সঙ্করায়ণ এবং সেগুলোর জাতের সাথে *Oryza sativa*-এর জাতসমূহের সঙ্করায়ণ করা হয়।

আন্তঃউপপ্রজাতি ক্রস (Interspecific cross) : *indica* এবং *japonica*-র মধ্যে সঙ্করায়ণ এ গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু *indica* এবং *japonica*-এর মধ্যে সম্পর্ক কিছুটা দূরবর্তী (distant) সেহেতু এদের থেকে সৃষ্ট কিছু সংযোগে (combination) পুং বন্ধ্যাত্ব আশা করা যায়।

আন্তঃজাত ক্রস (Intervarietal cross) : শুধু দূর সম্পর্কিত *indica* ধানের জাতসমূহের মধ্যে এ সঙ্করায়ণ কার্যকরভাবে করা যায়। সাধারণত এ ধরনের সঙ্করায়ণে পুং-বন্ধ্যা গাছ পাওয়ার সম্ভাবনা ইন্ডিকা × জাপোনিকা ক্রসের চেয়ে কিছুটা কম। এ ধরনের আন্তঃজাত ক্রসের মাধ্যমে G ধানের CMS সারি উদ্ভূত হয়েছে।

প্রজনন পদ্ধতি

উপরে বর্ণিত সঙ্করায়ণের মাধ্যমে CMS সারি প্রজনন কৌশল আর CMS সারি স্থানান্তরের পদ্ধতি একই রকমের, কিন্তু সঙ্করায়ণের জন্য সৃষ্ট স্ত্রী বন্ধ্যাত্ব এবং ক্রোমোজোমীয় বন্ধ্যাত্বের প্রতি মনোযোগ দিতে হয়। ক্রোমোজোমীয় বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে পর পর পশ্চাৎ সঙ্করায়ণের সৃষ্ট সঙ্করসমূহে উর্বরতা ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হয় এবং স্ত্রী বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে সঙ্কর-অনুর্বরতা (cross-infertility) দেখা দেয়।

উচ্চ বহিঃসঙ্করায়ণ CMS সারির প্রজনন

সঙ্কর ধানের বীজ উৎপাদনের ফলনের মাত্রা বহিঃসঙ্কর মাত্রার উপর নির্ভরশীল যা উন্নত ফুলসম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য, ভাল ফুল ফোটার আচরণ এবং অন্যান্য আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যযুক্ত CMS সারিসমূহের প্রজননের মাধ্যমে বাড়ানো সম্ভব।

উচ্চ মাত্রার বহিঃসঙ্করায়ণ হারের বৈশিষ্ট্য

১. উচ্চ মাত্রার বহিঃসঙ্করায়ণ হারের জন্য CMS সারিসমূহে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকবে :
২. লম্বা গর্ভদণ্ডযুক্ত গর্ভমুণ্ড যা পরাগমুক্তির পর গ্লুম থেকে বের হয়ে বাইরে অবস্থান করে।
৩. দীর্ঘকার ও অনেকাংশে পাখির পালকের মতো গর্ভমুক্ত ;
৪. সতেজ গর্ভমুক্ত যা দীর্ঘ সময় ধরে পরাগগ্রাহী ;
৫. চওড়া কোণে এবং এক ঘন্টার বেশি সময় ধরে গ্লুম খুলে থাকে ;
৬. ঢিলেঢালা উদ্ভিদ আকৃতি এবং একটি খাটো, সরু এবং সমতলবিশিষ্ট নিশান পাতা এমন কোণে থাকবে যেনো গর্ভমুণ্ডে পরাগ জমার সুযোগ থাকে।
৭. আগাম সময়ে পরাগমুক্তি এবং কেন্দ্রীয়ভাবে পুষ্পায়ন।

উচ্চ বহিঃসঙ্করায়ণ হারের কৌশল

সাধারণত একটি CMS সারি তার পুং বন্ধ্যাত্ব বৈশিষ্ট্য বাদে অন্য প্রায় সবদিক থেকে তার অনুরূপ সংরক্ষক সারি সাথে পার্থক্যহীন। উচ্চ বহিঃসঙ্করায়ণযুক্ত CMS সারি প্রজনন করতে গেলে কাঙ্ক্ষিত সংরক্ষক সারি তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বন্ধ্যা সাইটোপ্লাজমের প্রভাবের জন্য শুধু CMS সারিতে চওড়া কোণে (wider angle) এবং বেশি সময় গ্লুম খোলা থাকাসহ কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়। স্বল্প কেন্দ্রীয়ভাবে

BANGDOC Library Dhaka

প্রাত্যহিক পুষ্পায়ন এবং আবৃত অনুমঞ্জুরির উচ্চ মাত্রাজাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহও সহজেই CMS সারিতে দেখা যায়। সাধারণত লম্বা ও পাতলা গ্লুমযুক্ত গাছে খাটো ও পুরু গ্লুমযুক্ত গাছের চেয়ে ভাল পুষ্পায়ন স্বভাব থাকে।

উর্বরতা পুনঃস্থাপক সারির প্রজনন

উর্বরতা পুনঃস্থাপনকারী জিনের উৎস : সাধারণ নিয়মানুযায়ী পুনঃস্থাপনকারী জিন আদি স্ত্রী প্রজনকের নিউক্লিয়াসে উপস্থিত থাকে যা বন্ধ্যা সাইটোপ্লাজম প্রদান করে। বন্ধ্যা সাইটোপ্লাজমযুক্ত একটি স্বাভাবিক ধানগাছের নিউক্লিয়াসে অবশ্যই প্রকট পুনঃস্থাপক জিন থাকে।

ধানের জাতের উর্বরতা পুনঃস্থাপক ক্ষমতা (restoring ability) কিছুটা এদের উৎসের সাথে সম্পর্কিত। উষ্ণ এবং অবউষ্ণ অঞ্চলে ইন্ডিকা জাত এবং বুনো ধানে প্রধানত পুনঃস্থাপক জিন থাকে। ইন্ডিকা জাতের ধানের মধ্যে আগাম জাতের চেয়ে নাবী জাতের মধ্যে এ সারি পাওয়ার মাত্রা খুব বেশি।

যাচাই সঙ্করায়ণের মাধ্যমে বাছাইকরণ : যাচাই সঙ্করায়ণ একটি সহজ, সুবিধাজনক এবং কার্যকর পদ্ধতি। এর মাধ্যমে পুনঃস্থাপক সারির উদ্ভাবন সম্ভব এবং অনেকগুলো সর্বোত্তম পুনঃস্থাপক সারি, যেমন— IR24, IR26, IR30 এবং IR9761-19-1 এ পদ্ধতির মাধ্যমে চিহ্নিত হয়েছে।

যাচাই সঙ্করায়ণ পদ্ধতি : উৎস নার্সারিতে (source nursery) আকাঙ্ক্ষিত সারিসমূহের মধ্য হতে আদর্শ একক গাছ নির্বাচন করে এদেরকে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক (representative) CMS সারির সাথে করা হয়।

উর্বরতা পুনঃস্থাপক ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ : প্রতিটি ক্রসের দশটির বেশি F_1 সঙ্কর গাছ জন্মানো উচিত। ছড়া আসার পর্যায়ে বিদারি পরাগধানী (dehiscent anthers) এবং স্বাভাবিক উর্বর পরাগরেণুর হারের উপর ভিত্তি করে এদের উর্বরতা পরীক্ষা করা হয়। যেসব গাছের পরাগধানীর বিদারণ হার ৯৯%, স্বাভাবিক উর্বর পরাগরেণুর হার ৮০% এবং বীজ ধারণ স্বাভাবিক হয়, সেসব প্রজনক গাছসমূহকে পুনঃযাচাই সঙ্করায়ণের জন্য নির্বাচন করা হয়।

পুনঃযাচাই সঙ্করায়ণ : পরাগধানীর বিদারণ এবং অনুমঞ্জরির উর্বরতা (spikelet fertility) এসব গাছে স্বাভাবিক থাকলে বুঝতে হয় এর পুং প্রজনকে উর্বরতা পুনঃস্থাপক ক্ষমতা রয়েছে এবং এ পুং প্রজনককে পুনঃস্থাপক সারি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

সঙ্করসাবল্য মূল্যায়ন : পুনঃযাচাই সঙ্করায়ণের মাধ্যমে যেসব সারির উর্বরতা পুনঃস্থাপন ক্ষমতা সবল বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, এদেরকে নানা ধরনের সম-সাইটোপ্লাজমীয় CMS সারির সাথে সঙ্কর সংযোগের জন্য ঐ নিশ্চিত সারিগুলোকে পুনঃস্থাপক সারি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পরবর্তীতে F_1 সঙ্করসমূহকে ফলনশীলতা, রোগ এবং কীটপতঙ্গ প্রতিরোধীতা, দানার গুণসম্পর্কিত অভিযোজিতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হয়।

একক সঙ্করায়ণ পদ্ধতি : একক সঙ্করায়ণ পদ্ধতি সাধারণত R × R এবং B × R অথবা R×B সারিসমূহের মধ্যে সংগঠিত হয়। R × R-এর জন্য দুটি পুনঃস্থাপক জাতের মধ্যে সঙ্করায়ণ বা ক্রস ঘটানো হয়। CMS সারির সাথে যাচাই সঙ্করায়ণের (test cross) জন্য কাঙ্ক্ষিত

বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে এর সংশ্লিষ্ট প্রবল উর্বরতা পুনঃস্থাপক ক্ষমতাসম্পন্ন পুং প্রজনকদের নির্বাচন করা হয়। এভাবে পুং প্রজনকের পুনঃস্থাপক ক্ষমতা এবং অন্যান্য কৃষিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য স্থায়ী না হওয়া পর্যন্ত যাচাই ক্রস সহযোগে কয়েক প্রজন্ম নির্বাচন চালাতে হয়।

বহু সঙ্করায়ণ পদ্ধতি (Multiple cross method) : বহু সঙ্করায়ণের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের অনুকূল জিনসমূহ নতুন পুনঃস্থাপক সারিতে সংযোজন করা যেতে পারে।

ক্রমাগত ফিরতি সঙ্করায়ণ পদ্ধতি : একটি জাতকে পুনঃস্থাপক সারিতে রূপান্তরের জন্য ক্রমাগত ফিরতি সঙ্করায়ণ অত্যাবশ্যক। যাচাই সঙ্করায়ণের (test crossing) মাধ্যমে জাতটির উত্তম সমন্বয় ক্ষমতা এবং সকল সঙ্করসাবল্য প্রকাশের সামর্থ্য মূল্যায়িত হয়েছে কিন্তু জাতটির পুনঃস্থাপনের ক্ষমতা অনুপস্থিত বা দুর্বল। Li-Pu পুনঃস্থাপক সারিটি এ উপায়ে উদ্ভাবিত হয়েছে।

AxR **পদ্ধতি** (A × R method) : এ পদ্ধতিতে A × R ক্রসের F_2 এবং পরবর্তী প্রজন্মসমূহতে উর্বর একক গাছ নির্বাচন করা হয় যে পর্যন্ত না তাদের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অভিন্ন (Uniform) হয় এবং উর্বরতায় পৃথকীকরণ (segregation) প্রদর্শিত হয় না। পরবর্তীতে CMS সারিসমূহের সঙ্গে যাচাই সঙ্করায়ণ করা হয়। কখনও আবার, A × R এর পুং প্রজনকের বৈশিষ্ট্যসমূহ সমৃদ্ধ (enrich) করার জন্য পশ্চাৎ সঙ্করায়ণ করা হয়। কারণ এ ধরনের পুনঃস্থাপক সারির সাইটোপ্লাজম এবং CMS সারির সাইটোপ্লাজম পরস্পরের সদৃশ, এজন্য একে সমসাইটোপ্লাজমীয় পুনঃস্থাপক সারি (isocytoplasmic restorer line) বলে।

সঙ্কর বীজ উৎপাদন এবং CMS সারির বীজ বর্ধন

সঙ্কর ধানের বীজ উৎপাদন পদ্ধতি প্রচলিত বিশুদ্ধ জাতের বীজ উৎপাদন পদ্ধতি থেকে আলাদা। তিন সারি পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সঙ্কর বীজ উৎপাদনের দুটি মূল ধাপ হলো :

ক. A × B বীজ উৎপাদন প্লটে A সারির বীজ বর্ধন এবং

খ. A × R প্লটে F_1 সঙ্কর বীজ উৎপাদন। B এবং R সারির বীজ বর্ধন প্রচলিত জাতের ন্যায় করা হয়ে থাকে। কিন্তু F_1 সঙ্কর বীজ উৎপাদন এবং A সারির বীজ বর্ধনের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

সঙ্কর বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি

স্থান নির্বাচন

সঙ্কর বীজ উৎপাদনের জন্য স্থান নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি আলাদা এলাকায় (isolated area) প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো উর্বর মাটিযুক্ত ধানক্ষেত, একটি উপযোগী পানি সেচ ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলো বাতাস ও সূর্যালোক এবং রোগবালাই ও পোকামাকড়ের কোনো মারাত্মক আক্রমণ দেখা যায় না, প্রধানত সেগুলোর যেগুলোকে সংগনিরোধ বিধিবিধানের (quarantine regulations) আওতাভুক্ত।

পৃথকীকরণ (Isolation) : ধানের পরাগরেণু খুব ছোট, হাল্কা এবং সহজে বাতাসের মাধ্যমে অনেক দূর যেতে পারে। সঙ্কর বীজের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করতে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত জাতের পরাগ দিয়ে পরাগায়ন এড়াতে সঙ্কর বীজ উৎপাদন প্লট নিম্নলিখিত উপায়ে যথাযথভাবে পৃথক করতে হয় :

দূরত্বের পৃথকীকরণ (Space isolation) : সাধারণত ১০০ মিটার এর বেশি পৃথকীকরণ দূরত্ব সন্তোষজনক হতে দেখা গেছে। এ সীমার মধ্যে একই মৌসুমে পরাগ প্রজনক (Pollen parent) ছাড়া অন্য কোনো ধানের জাত লাগানো উচিত নয়।

সময়ভিত্তিক পৃথকীকরণ (Time isolation) : সাধারণত ২০ দিনের অধিক সময় দেয়া হয়ে থাকে। অর্থাৎ সঙ্কর বীজ উৎপাদন প্লটের ১০০ মিটারের মধ্যে অন্য কোনো জাত লাগালেও তার ছড়া যেনো A সারির ছড়া বের হওয়ার ২০ দিন আগে বা পরে হয়।

প্রতিবন্ধন পৃথকীকরণ (Barrier isolation) : কোনো কোনো এলাকায়, ভূমি প্রকৃতি (topographical features) যেমন– পাহাড় এবং বন বা লম্বা ফসল (যেমন, ভুট্টা, ইক্ষু, পাট, জোয়ার) যা ৩০ মিটার এরও বেশি দূরত্ব এলাকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকে, তা পৃথকীকরণের একটি উপায় হিসেবে কাজ করে। প্রজনন কর্মসূচিতে যেখানে প্রতিরূপ ফলন পরীক্ষার (RYT) মাধ্যমে খুব কম পরিমাণ সঙ্কর বীজ উৎপন্ন করা হয়, সেখানে ছোটো আকারে পৃথকীকৃত প্লটের চারিদিকে দুই মিটার উঁচু প্লাস্টিক ফিল্ম বা কালো কাপড়কে কৃত্রিম প্রতিবন্ধক হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

তিনটি সারির স্বাভাবিক ফুল ফোটার জন্য উপযোগী জলবায়ু নিম্নরূপ :

১. দৈনিক গড় তাপমাত্রা, ২৫ থেকে ২৮° সেন্টিগ্রেট ;
২. বাতাসের আর্দ্রতা, ৭০ থেকে ৯০% ;
৩. দিবা–রাত্রির তাপমাত্রার পার্থক্য, ৮ থেকে ১০° সেন্টিগ্রেট ;
৪. পর্যাপ্ত সূর্যালোকসহ তিনদিনের বেশি একটানা বৃষ্টি–বাদল না থাকা ;
৫. মৃদু বাতাস।

নিয়মানুযায়ী উচ্চ তাপমাত্রা সহযোগে কম আর্দ্রতা বা কম তাপমাত্রা সহযোগে বেশি আর্দ্রতায় কিছু গ্লুম খুলবে না। এ অবস্থায় R সারি এর পরাগের সজীবতা এবং A সারি এর গর্ভমুণ্ডের পরাগগ্রাহীতা কমে গিয়ে ফলন কম দেয়। সুতরাং ফুল ফোটা এবং ছড়া বের হওয়া যেনো উপযুক্ত সময়ে হয় সেদিকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিতে হয়।

ফুল ফোটা সমকালবর্তীকরণ (Synchronization of flowering)

মাতৃ প্রজনকের (A line) বীজ ধারণ পরপরাগায়নের উপর (cross pollination) নির্ভরশীল, সেহেতু উভয় প্রজনকের ছড়া বের হওয়ার সময় একই হতে হয়, বিশেষ করে সেসব সঙ্কর সংযোগের (hybrid combinations) জন্য যাদের R এবং A সারির বর্ধনকাল বিভিন্ন মেয়াদের হয়। অধিকন্তু, দীর্ঘ সময় ধরে পরাগরেণু সরবরাহ পাওয়ার জন্য ৫ থেকে ৭ দিন পর পর দু'বার R সারির বীজ বপন করা হয় এবং একান্তরভাবে (alternately) প্রত্যেক ২ থেকে ৩ গোছা পর পর লাগানো হয়।

বর্ধনকাল পদ্ধতি : পূর্ববর্তী বছরে রেকর্ডকৃত A এবং R সারির বীজ বপন থেকে ছড়া বের হওয়া পর্যন্ত সময়ের (বর্ধনকাল) পার্থক্যের ভিত্তিতে বর্তমান বছরে উভয় প্রজনকের সঠিক বপন তারিখ নির্ণয় করা যেতে পারে। এ পদ্ধতি সহজ এবং সহজে গ্রহণযোগ্য।

পাতার সংখ্যা পদ্ধতি (Leaf number method) : ধানের বিভিন্ন জাতের পাতার সংখ্যা তুলনামূলকভাবে স্থায়ী। প্রধান কাণ্ডে (culm) পাতার সংখ্যা গণনার মাধ্যমে একটি ধান গাছের শারীরবৃত্তীয়ভাবে অর্থপূর্ণ বয়স নির্ণয় করা যায়। এ পদ্ধতিতে দুই প্রজনকের মধ্যে বীজ বপন তারিখের পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য প্রধান কাণ্ডে পাতার সংখ্যা একটি নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিস্তারিত নিচে দেওয়া হলো :

১. পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য গ্রহণের জন্য ১০টির বেশি চারার প্রয়োজন।
২. প্রতি তিনদিন অন্তর পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য রেকর্ড করতে হয়। গড়মানের উপর ভিত্তি করে প্রথম বপনকৃত R সারিটি নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৩. পাতার সংখ্যা গণনার জন্য একটি বিশেষ নির্ণয়ক দরকার হয়।

কার্যকর পুঞ্জিত তাপমাত্রা (EAT method) **পদ্ধতি :** একটি জাতের মধ্যে বীজ বপন থেকে ছড়া বের হওয়া পর্যন্ত EAT মোটামুটি অপরিবর্তনশীল। (relatively stable), যদিও বীজ বপনের তারিখ বিভিন্ন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ১২° সেন্টিগ্রেট এবং ২৭° সেন্টিগ্রেট কে যথাক্রমে কম এবং বেশি তাপমাত্রার সীমা হিসেবে ধরা হয়। EAT নির্ণয়ে নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করা হয় :

A = •(T H L)

যেখানে, A = কোনো নির্দিষ্ট বৃদ্ধির পর্যায়ে EAT (° সেন্টিগ্রেট)

T = দৈনিক গড় তাপমাত্রা (° সেন্টিগ্রেট)

H = ঊর্ধ্ব সীমার অর্থাৎ ২৭° সেন্টিগ্রেট–এর উপরের তাপমাত্রা। যেসব দিনের প্রাত্যহিক গড় তাপমাত্রা ২৭° সেন্টিগ্রেট–এর চেয়ে অধিক, কেবল সেসব দিনের জন্য H নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন দৈনিক গড় তাপমাত্রা ২৮° সেন্টিগ্রেট হয় তখন H = ২৮ – ২৭ = ১।

L = তাপমাত্রার নিম্নসীমা (১২° সেন্টিগ্রেট) কেবল যেসমস্ত দিনের প্রাত্যহিক গড় তাপমাত্রা ১২° সেন্টিগ্রেট–এর চেয়ে বেশি সেসব দিনের EAT গণনা করা হয়।

* = একটি নির্দিষ্ট বৃদ্ধি পর্যায়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুঞ্জিত (accumulated) তাপমাত্রা।

যখন A এবং R সারির বীজ বপন থেকে প্রাথমিক ছড়া পর্যায়ের EAT জানা থাকে তখন এদের মধ্যকার পার্থক্য পাওয়া যেতে পারে এবং স্বল্প বর্ধনকালসম্পন্ন প্রজনক সারিসমূহের বীজ বপন তারিখ নির্ণয় করা যেতে পারে।

বর্ধনকাল, পাতার সংখ্যা এবং EAT একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই এ তিনটি পদ্ধতি পরিপূরকভাবে দুই প্রজনকের মধ্যে বীজ বপন তারিখের পার্থক্য নির্ণয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। সাধারণত পাতার সংখ্যা গণনাকে প্রধান পদ্ধতি হিসেবে এবং অন্য দুটি পদ্ধতি সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

সারির অনুপাত, সারির দিক এবং রোপণ বিন্যাস

সারি অনুপাত বলতে সঙ্কর বীজ উৎপাদন প্লটে পুং ও স্ত্রী প্রজনক সারির অনুপাতকে বোঝায়। সারির অনুপাতের নকশা নির্ভর করে :

১. R সারির বর্ধনকাল ;
২. R সারির বৃদ্ধির সজীবতা ;
৩. R সারির গাছের উচ্চতা ;
৪. R সারির পরাগরেণু বহনের ক্ষমতা

মূলনীতি

১. A সারির সারির সংখ্যা বাড়ানো যায়, যদি R সারি প্রচুর পরাগরেণু সরবরাহের সমর্থ হয় ;
২. R সারির দু'সারির মধ্যের দূরত্ব এমনভাবে বাড়াতে হয় যাতে সেই দূরত্বে A সারি কম ছায়া দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে ;
৩. পরপরাগায়নের সুবিধার জন্য সারির দিক (direction) ধান গাছে ছড়া আসা পর্যায়ে প্রবাহিত বাতাসের দিকের সাথে যেনো লম্বাভাবে (perpendicular) থাকে।

ইন্ডিকা জাতের সঙ্কর বীজ উৎপাদনে বহুলভাবে ব্যবহৃত সারির অনুপাত হলো ১ ঃ ৮ থেকে ১ ঃ ১০ বা ২ ঃ ১২ থেকে ২ ঃ ১৪ এবং জাপোনিকা জাতে ১ ঃ ৬ বা ২ ঃ ৮ থেকে ২ ঃ ১০। যদি R সারির পরাগ রেণু বেশি হয় তবে সারির অনুপাত যুক্তিযুক্তভাবে আরো বাড়ানো যাবে।

শীষ বের হওয়ার তারিখ নির্ধারণ এবং সমন্বয়

যদি প্রজনকদ্বয়ের মধ্যে বীজ বপনের সময় সঠিকভাবে নির্ণীত হয় তথাপিও মাঠ ব্যবস্থাপনা এবং তাপমাত্রার ভিন্নতার কারণে উভয় প্রজনকে একই সময়ে ফুল নাও ফুটতে পারে। সুতরাং তাদের ছড়া আসার তারিখ জানা খুব জরুরি। এ কারণে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব একই সময়ে ফুল আনয়নের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

শীষ বের হওয়ার তারিখের অনুমান : আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে কচি শীষকে আটটি বিকাশমান পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে :

১. প্রথম মঞ্জরীপত্রের আদি পর্যায়ের পরিস্ফূরণ।
২. মুখ্য শাখার আদি পর্যায়ের পর্যায়ের পরিস্ফূরণ।
৩. গৌণ শাখার আদি পর্যায়ের পরিস্ফূরণ এবং অনুমঞ্জরীর আদি পর্যায়ের পরিস্ফূরণ।
৪. পুংকেশর এবং স্ত্রীকেশর কুঁড়ির পরিস্ফূরণ। কচি ছড়ার দৈর্ঘ্য ২ থেকে ১৫ মিলিমিটার হয়।
৫. পরাগ মাতৃকোষ সৃষ্টি (PMC)। বিকাশমান অনুমঞ্জরী ১ থেকে ৩ মিলিমিটার এবং কচি ছড়া ১৫ থেকে ৫০ মিলিমিটার হয়।
৬. পরাগ মাতৃকোষের মিয়োটিক বিভাজন। অনুমঞ্জরীর দৈর্ঘ্য ৩ থেকে ৫ মিলিমিটার এবং ছড়ার দৈর্ঘ্য ৫০ থেকে ১০০ মিলিমিটার হয়। শীর্ষপত্রের এবং দ্বিতীয় পত্রের দূরত্ব ৩ সেন্টিমিটার হয়।
৭. পরাগ রেণু ভরাট পর্যায় (filling stage)। অনুমঞ্জরি ৫ থেকে ৬ মিলিমিটার লম্বা এবং সাদা রঙের হয়।
৮. পরাগ রেণু পরিপক্ব পর্যায়। ছড়া এবং অনুমঞ্জরী পূর্ণ দৈর্ঘ্যে পৌছে এবং সবুজ বর্ণ ধারণ করে।

সাধারণত ছড়া বের হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে ছড়ার প্রাথমিক কুঁড়ি রেব হওয়ার শুরু হয়। বিভিন্ন সঙ্কর জাত পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে ছড়া বিকাশের মোট সময়কাল ২৭ থেকে ৩২ দিন। নাবীতে পরিপক্ব R সারির তুলনায় আগাম পরিপক্ব A সারি এ ছড়া বিকাশের মোট সময় কিছুটা কম হয়।

বিভিন্ন A এবং R সারির ছড়া বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ের স্থায়িত্ব

পর্যায়	পর্যায়ের স্থায়িত্ব (দিন)		ছড়া বিকাশের পূর্বের স্থায়িত্ব (দিন)	
	A সারি	R সারি	A সারি	R সারি
১.	২	২	২৫–২৭	৩০–৩২
২.	২–৩	৩–৪	২২–২৪	২৭–৩০
৩.	৩–৪	৪–৫	১৮–২১	২২–২৬
৪.	৫	৬–৭	১৫–১৮	১৯–২২
৫.	৩	৩	১২–১৫	১৬–১৯
৬.	২	২	৯–১১	১২–১৫
৭.	৬–৭	৭–৯	৮–৯	৯–১১
৮.	২	২	২	২

কচি শীষের বিকাশ পরীক্ষা করে একই সময়ে ফুল ফোটার ব্যাপারটি অনুমান করা যায়। শীষ বের হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে A সারি এবং R সারি গাছের নুমনা সংগ্রহ করা হয় এবং এদের প্রধান কাণ্ড থেকে জন্মানো কচি শীষকে খালি চোখে বা বিবর্ধক কাঁচের সাহায্যে তিন দিন পর পর পরীক্ষা করা হয়। পুষ্পায়নে সমকালীনতার জন্য নিম্নোক্ত নির্ণয়ক ব্যবহৃত হয় :

১. যদি R সারির বর্ধনকাল দীর্ঘ হয় তবে কচি শীষ পরিস্ফুরণে প্রথম তিনটি পর্যায়ের মধ্যে A সারির চেয়ে R সারি একটি পর্যায় আগে আসে ;
২. ৪র্থ, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ পর্যায়ে উভয় প্রজনকই একই পর্যায়ে থাকে ;
৩. শেষ দুই পর্যায় R সারির চেয়ে A সারিতে কিছুটা আগে আসে বিধায় সারির প্রাথমিক ফুল ফোটা R সারির চেয়ে ১ থেকে ২ দিন আগে শুরু হয়।

ফুল ফোটার তারিখ সমন্বয়করণ : শীষ উদ্গমের প্রথম তিনটি পর্যায়ের সময় যদি দেখা যায় যে একই সাথে ফুল ফুটবে না, তখন আগাম বর্ধনশীল প্রজনককে তাড়াতাড়ি নাইট্রোজেন সরবরাহে সক্ষম এমন নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের মাধ্যমে সরবরাহ করতে হয়। দেরিতে বর্ধনশীল প্রজনককে ১% পটাশিয়াম ড্রাই হাইড্রোজেন ফসফেট (KH_2PO_4) দ্রবণ দিয়ে স্প্রে করতে হয়। এ উপায়ে ৪ থেকে ৫ দিন পর্যন্ত ফুল আসার তারতম্য সমন্বয় করা যেতে পারে।

পরিপূরক পরাগায়ন : পরাগমুক্তির সময় (anthesis) R সারির ছড়ার উপর দিয়ে রশি টানলে বা রড (rod) চালিয়ে নিয়ে নাড়া পড়ে ফলে পরাগধানী থেকে পরাগরেণু অবমুক্ত হতে পারে এবং পরাগরেণু অনেক জায়গা জুড়েও সুষমভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ উপায়ে বহিঃসঙ্করায়ণের হার বাড়ানো সম্ভব।

পরিপূরক পরাগায়ন সাধারণত সকালে করা হয় যখন A সারির ফুল ফোটে। যদি শুধু R সারিতে ফুল ফোটে কিম্বা A সারির ফুল ফোটেনি, তাহলে পরিপূরক পরাগায়ন কার্যকর হয় না। বিকালেও যদি R সারিতে ফুল ফুটতে থাকে তখনো পরিপূরক পরাগায়ন চালিয়ে যাওয়া উচিত, যদিও সেসময় A সারিতে গ্লুমসমূহ বন্ধ হয়ে যায়।

সম্প্রতি পরিপূরক পরাগায়নের একটি নতুন কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে যেখানে ৩০ মিনিট অন্তর অন্তর পরাগায়নের পরিবর্তে R সারিতে সর্বোচ্চ পরাগরেণু ঝরা পর্যায়ে পরিপূরক পরাগায়ন করতে হয়।

অবাঞ্ছিত গাছ বাছাই (Rouging)

বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত সঙ্কর বীজের বিশুদ্ধতা হয় ৯৮%। এটা করতে R এবং A সারির বিশুদ্ধতা হতে হয় অবশ্যই ৯৯%-এর বেশি। তাই বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে পৃথকীকরণ দূরত্ব ছাড়াও বীজ ফসলের প্লট থেকে সকল অবাঞ্ছিত গাছ তুলে ফেলতে হয়। এ সম্পর্কিত রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে। অবাঞ্ছিত গাছ বাছাই ২ থেকে ৩ বার করতে হয়, যেমন— ছড়া আসার পূর্বে, প্রারম্ভিক ছড়া আসার পর্যায়ে এবং ফসল সংগ্রহের পূর্বে। বন্ধ্যাত্ব সংরক্ষণকারী (B Line-এর গাছসহ A সারির সারিতে অর্ধবন্ধ্যা গাছ দেখা যায় বা উভয় প্রজনক সারিতে যেসব অবাঞ্ছিত গাছ (off-type plants) থাকে তা সম্পূর্ণভাবে তুলে ফেলতে হয়। অবাঞ্ছিত গাছ বাছাই করার সময় যেসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করতে হয় তা হলো ।

১. পাতার পত্রাবরণ এবং পাতার কলারের (leaf sheath এবং leaf collar) রং পত্র ফলকের আকার, বৃদ্ধির পর্যায়, গাছের ধরন (plant type), গাছের উচ্চতা এবং বর্ধনকালে উপর ভিত্তি করে অবাঞ্ছিত গাছ নিধারণ করা হয়।
২. A থেকে বন্ধ্যাত্ব সংরক্ষণকারী গাছে ৩ থেকে ৫ দিন আগে ফুল আসে। বন্ধ্যাত্ব সংরক্ষণকারী গাছের ছড়ার গোড়ার অংশ সাধারণত শীর্ষ পত্রাবরণ থেকে বের হয়ে আসে। বন্ধ্যাত্ব সংরক্ষণকারী সারির পরাগধানী (anther) হলুদ রঙের এবং ভরাট (plump) এবং ফুল ফোটার পরে সম্পূর্ণভাবে ফেটে (dehiscent) যায়।
৩. A সারির চেয়ে অর্ধ বন্ধ্যা গাছসমূহের পরাগধানী কিছুটা বড়, হলুদাভ এবং আংশিকভাবে পেকে যায়। অর্ধ বন্ধ্যা গাছসমূহের অবিদারি (indehiscent) পরাগধানীসহ ফুল ফোটার কয়েক ঘণ্টা পরে গাঢ় হলুদ রঙ ধারণ করে।

বিশেষ মাঠ ব্যবস্থাপনা

সঙ্কর বীজের ভাল ফলন পেতে হলে ভাল মাঠ ব্যবস্থাপনা অত্যাবশ্যক। মাঠ ব্যবস্থাপনাসমূহের মধ্যে রয়েছে :

সুস্থ-সবল কুশিযুক্ত চারা তৈরি : বীজতলায় কুশিযুক্ত সতেজ চারা তৈরি করতে পাতলা করে ও সমভাবে প্রজনক সারিসমূহের বীজ বপন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি হেক্টরে বীজের হার ১৫০ কেজির কম হওয়া উচিত। যখন চারাগুলো দুই পাতাবিশিষ্ট হয়। তখন কুশির সংখ্যা বাড়াতে হেক্টর প্রতি ৭০ থেকে ১০০ কেজি ইউরিয়া উপরিপ্রয়োগ করা হয় ; চারা রোপণের জন্য তুলে নেয়ার ৭ দিন পূর্বে এ পরিমাণ সার আবারও উপরিপ্রয়োগ করা হয়।

১. প্রথম ধাপে R সারির বীজ খুব ঘনভাবে প্রতি হেক্টরে ৭৫০ থেকে ১৫০০ কেজি বীজ হারে নার্সারিতে বপন করা হয়।
২. দ্বিতীয় ধাপে নার্সারিতে যেসব চারার পাতার সংখ্যা ২.৫ হয় এদেরকে তুলে নিয়ে সাময়িকভাবে একটি ভেজা বীজ তলায় ১০ × ১৩ সেন্টিমিটার দূরত্বে প্রতি গোছায় ২ থেকে ৩টি করে চারা রোপণ করা হয়। তারপর আগাম এবং মাঝারি পরিপক্ব R সারিসমূহের জন্য ৭ থেকে ৮ পাতার চারা এবং নাবীতে পরিপক্ব R সারির জন্য ৮ থেকে ৯ পাতার চারা বীজ উৎপাদন প্লটে রোপণ করা হয়।

অধিক কার্যকর কুশি সৃষ্টির জন্য চারা রোপণের পর প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে সার প্রয়োগ

A এবং R সারির গাছগুলোতে অধিক সংখ্যায় কার্যকর কুশি উৎপাদনের জন্য চারার প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে সার প্রয়োগ করতে হয়।

A সারির প্রারম্ভিক চারার সংখ্যার সাথে সঙ্কর বীজের ফলনের হার

প্রারম্ভিক চারার সংখ্যা (মিলিয়ন/হেক্টর)	সঙ্কর বীজের ফলন (মেট্রিক টন /হেক্টর)
১.৬৫	১.৬৫
১.৯৫	১.৯৫
২.২৫	২.১৯
২.৫৫	২.৭৮
২.৭০	৩.০২
২.৮৫	৩.১০
৩.০০	৩.৩৮
৩.৩০	৩.১৭
৩.৪৫	২.৭৬

মধ্যম এবং পরবর্তী পর্যায়ে কম সার ও সেচ প্রয়োগ

শীর্ষ পত্রের বৃদ্ধি রহিত করতে এবং এর ফলে ছড়া আসার পর গাছগুলোর পর্যাপ্ত আলোবাতাস ও সূর্যালোক পাবার জন্য ফসলের মধ্যম এবং শেষ পর্যায়ে সেচ ও সার প্রয়োগের মাত্রা কমাতে হয়। তথাপিও ছড়া পরিস্ফূরণের ৫ম অথবা ৬ষ্ঠ পর্যায়ে (PMC তৈরি ও মিয়োটিক বিভাজন পর্যায়) অনুমঞ্জরি বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ বাঞ্ছনীয় (ইউরিয়া ৭০ থেকে ৯০ কেজি/হেক্টর এবং পটাশিয়াম ক্লোরাইড ৬০ কেজি/হেক্টর।

সাধারণত সঙ্কর বীজের কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হলে, R সারির হেক্টর প্রতি ১.২ মিলিয়ন উৎপাদনশীল ছড়া এবং A সারির ৩ থেকে ৩.৫ মিলিয়ন ছড়া বা তার বেশি থাকা উচিত। R এবং A সারির মধ্যে অনুমঞ্জরির অনুপাত ১ : ২.০ থেকে ১ : ২.৫ এবং A সারির অনুমঞ্জরির সংখ্যা প্রতি হেক্টরে ৩০০ মিলিয়ন হওয়া উচিত।

A সারির বীজ বর্ধনের কলাকৌশল

A সারির বীজ বর্ধনের কৌশল বীজ বপন ব্যবধান, সারির অনুপাত এবং মাঠ ব্যবস্থাপনা এই তিনটি দিক ছাড়া সঙ্কর বীজ উৎপাদনের কলাকৌশলের ন্যায় মূলত একইরকম।

বপন ব্যবধান

A সারি এবং এর সংরক্ষক সারি (B line) হলো পরস্পরের যমজ এবং সেকারণেই এদের বর্ধনকালের খুব একটা পার্থক্য হয় না।

১. **রেণুভিদীয় ইন্ডিকা জাতের A সারি :** B সারির চেয়ে A সারিতে ৪ থেকে ৬ দিন পর ছড়া বের হয়। সেক্ষেত্রে A সারির বীজ কয়েক দিন আগে বপন করতে হয়। B সারির প্রথমবার বীজ বপন করতে হয়, যেদিন A সারির পাতার সংখ্যা ১.৫ হয় এবং দ্বিতীয়বার বীজ বপন করতে হয় যেদিন A সারির পাতার সংখ্যা ২.৫ থেকে ৩.০ হয়।

২. **জননকোষভিদীয় জ্যাপোনিকা জাতের A সারি :** কত দিনে ছড়া বের হয় তা A এবং B উভয় সারিতে একই। সুতরাং B সারির প্রথমবার বীজ বপনের সময় এবং A সারির বীজ বপন সময় একই এবং B সারির দ্বিতীয়বার বীজ বপন করতে হয় যেদিন A সারির পাতার সংখ্যা ১.৫ থেকে ২.০ হয় অর্থাৎ প্রথমবার বীজ বপনের ৫ থেকে ৭ দিন পর।

সারি অনুপাত (Row ratio)

যেহেতু A এবং B সারির মধ্যে গাছের উচ্চতার কোনো পার্থক্য নেই এবং যেহেতু B সারির বীজ দেরিতে বপনের কারণে কুশি গজানোর ক্ষমতা এবং বৃদ্ধির সজীবতা A সারির চেয়ে কম, তাই এদের সারি অনুপাত কম হয়। বর্তমান চীনে বীজ বর্ধন প্লটে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত B এবং A সারির অনুপাত হচ্ছে ১ : ৩ বা ২ : ৫।

মাঠ ব্যবস্থাপনা

যেহেতু B সারির চেয়ে A সারির বীজ বপন এবং চারা রোপণ আগে হয়ে থাকে এজন্য সঙ্গত কারণেই কুশি গজানোর ক্ষমতা এবং বৃদ্ধির সজীবতা B সারির চেয়ে A সারিতে বেশি হয়। বীজ বর্ধন প্লটে বীজের ফলন বাড়াতে B সারির বৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন অত্যাবশ্যক।

সঙ্কর ধানের বীজ উৎপাদনে সম্ভাব্য ফলন

১৯৭৫ সালে চীনে সঙ্কর ধানের বীজ উৎপাদনের কৌশলসমূহ উদ্ভাবিত হয়। ১৯৮০ সালের পূর্বে সঙ্কর বীজের হেক্টর প্রতি গড় ফলন ছিল ০.৭৫ মেট্রিক টন, কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সমগ্র চীনে হেক্টর প্রতি ২.৩ মেট্রিক টন গড় ফলন পাওয়া গেছে। হুনান প্রদেশে গড় ফলন কিছুটা বেশি অর্জিত হয়েছে।

A সারি বীজ বর্ধন, সঙ্কর বীজ উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনে মাঠের ক্ষেত্রফলের অনুপাত (field area ratio) A সারি বীজ বর্ধন এবং F_1 বীজ উৎপাদনে উভয়েরই ফলন এবং প্রতি একক ক্ষেত্রের জন্য বাণিজ্যিক উৎপাদনের মাঠে ব্যবহৃত বীজ হারের উপর নির্ভর করে। প্রতি একক ক্ষেত্রের (per unit area) বীজের ফলনের দ্রুত বৃদ্ধি, A সারি বীজ বর্ধন, সঙ্কর বীজ উৎপাদন ও বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য মাঠের ক্ষেত্রফলের অনুপাতকে ১৯৭০ দশকের প্রায় ১ : ৩০ : ১০০০ থেকে ১৯৮৫ সালে এবং পরবর্তীতে প্রায় ১ : ৫০ : ৫০০০–তে উন্নীত করেছে। অর্থাৎ ধানের সঙ্কর বীজ উৎপাদনে উন্নত কৌশল ব্যবহার করে খুব দ্রুত অর্থনৈতিক লাভ পাওয়া গেছে।

মাঠ ব্যবস্থাপনার বিশেষ ব্যবস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো

১. হেক্টর প্রতি উৎপাদনশীল ছড়ার সংখ্যা ৩.৫ থেকে ৪.৩ মিলিয়ন অথবা খুব বৃহদাকৃতির শীষ হেক্টর প্রতি সংখ্যা ২.৫ মিলিয়ন।

২. ছড়া প্রতি ভরাট দানার সংখ্যা ৭০ থেকে ৮৫ (বহিঃসঙ্করায়ণের হার, ৫৫ থেকে ৮৫%)।

৩. দানার ওজন সাধারণত ২৬ থেকে ২৮ গ্রাম (ব্যতিক্রম Zhi-You 77 জাতটি যার ১০০০ দানার ওজন ২০.৫ গ্রাম)।

৪. A সারির মোট অনুমঞ্জরির সংখ্যা ৩৮০ থেকে ৪৪০ মিলিয়ন/হেক্টর এবং সমস্ত ধানের সংখ্যার ভিত্তিতে A এবং R এর অনুপাত ৩ : ১ এবং ৩.৫ : ১ এর মধ্যে।

৫. R এবং A সারির সারি অনুপাত ২ : ১৪ থেকে ২ : ১৬। প্রতি হেক্টর A সারির মোট গাছের সংখ্যা অবশ্যই বজায় রাখতে হয়। প্রধানত প্রারম্ভিক হেক্টর প্রতি কুশি ২.৭ থেকে ৩.০ মিলিয়ন (কুশিসহ) চারা রোপণের মাধ্যমে। R সারির জন্য শুধু একবার বীজ বপন করা হয় এবং বহু কুশি সম্বলিত চারা লাগানোসহ একতরফাভাবে সারের উপরিপ্রয়োগ করা হয়।

৬. শীর্ষ পাতার দৈর্ঘ্য মাঠ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বা পাতা কর্তনের মাধ্যমে পাতার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ সেন্টিমিটার রেখে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৭. GA_3 ব্যবহারের মাত্রা হেক্টর প্রতি ২৪০ থেকে বাড়িয়ে ২৭০ গ্রাম করা হয় এবং উচ্চ ঘনত্বে প্রথমবার স্প্রে করার জন্য ২৪০ থেকে ৩২০ পিপিএম এবং দ্বিতীয় বার স্প্রে করার জন্য ৪০০ থেকে ৪৮০ পিপিএম ব্যবহার করা হয়।

৮. গাছের বৃদ্ধির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে GA_3 দ্রবণ বিভিন্ন মাত্রায় বা ঘনত্ব করে গাছের উপরে স্প্রে করা উচিত। খাটো জাতের R সারির উপর প্রত্যেক বার বেশি মাত্রায় GA_3 প্রয়োগ করতে হয়, তবে গাছ হেলে পড়া এড়াতে বেশিবার স্প্রে করা উচিত নয়।

৯. পুষ্পায়ন সমন্বয়কারী এজেন্ট হিসেবে পরিচিত কিছু জৈবরাসায়নিক দ্রব্য, যেমন— বহিঃসঙ্করায়ণের হার বাড়াতে তথা সঙ্কর বীজের ফলন বাড়াতে কার্যকর ভূমিকা রাখে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রজনক সারি বিশুদ্ধকরণ ও ভিত্তি বীজ উৎপাদন

F_1 সঙ্করের সম্ভাব্য ফলন বীজের বিশুদ্ধতা হতে দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। প্রতি ১% সঙ্কর বীজের বিশুদ্ধতা হ্রাসের জন্য সঙ্কর ধানের হেক্টর প্রতি ফলন ৮০ থেকে ১০০ কেজি কমে যায়। সুতরাং সঙ্কর ধান উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রজনক সারি তিনটির (A, B, R lines) বিশুদ্ধায়ন ও ভিত্তি বীজ উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্রজনক সারি এবং F_1 সঙ্করের অবক্ষয় প্রাপ্তি

পুং বন্ধ্যা সারি

১. গাছের ধরন বর্ধনকাল এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যসমূহে পৃথকীকরণের ঘটনা ঘটে।

২. বন্ধ্যাত্বের মাত্রা এবং বন্ধ্যা গাছের শতকরা হার কমে যায় এবং আংশিক স্বনিষেক ঘটে।

BANSDOC Library
Accession No.........

৩. পুষ্পায়ন আচরণ খুব ভাল হয় এবং পুষ্পায়নের সময় ব্যাপ্ত হয়ে যায়।
৪. না খোলা গ্লুমের সংখ্যা বেড়ে যায়।

উর্বরতা পুনঃস্থাপক সারি

১. আংশিক বৈশিষ্ট্যসমূহের ভিন্নতারও পৃথকীকরণ ঘটে।
২. উর্বরতা পুনঃস্থাপকের ক্ষমতা কমে যায়।
৩. পরাগরেণুর সরবরাহ অপ্রতুল এবং পরাগরেণুর ঝরে পড়া বাধাপ্রাপ্ত হয়।
৪. পীড়ন প্রতিরোধিতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

F_1 সঙ্কর

১. সমরূপতা খুব কমে যায় এবং পৃথকীকরণ ঘটে।
২. বীজ ধারণ কমে যায়।
৩. পীড়ন প্রতিরোধিতা দুর্বল হয়ে পড়ে।

প্রজনকের অবক্ষয় এবং অপমিশ্রণ

জীবজ অপমিশ্রণ : সঙ্কর বীজ উৎপাদন এবং CMS সারি বীজ বর্ধন প্লটে অন্য জাতের পরাগরেণুর উপস্থিতিই হলো সঙ্কর বীজের অবক্ষয় প্রাপ্তি ও অপমিশ্রণের মূল কারণ। জীবজ অপমিশ্রণের কারণে সাধারণত CMS সারি এবং F_1 সঙ্কর উদ্ভিদসমষ্টিতে দেরিতে পাকে এমন উপজাতের (late maturing variants) সৃষ্টি হয়।

যান্ত্রিক অপমিশ্রণ : অসতর্ক ব্যবস্থাপনার জন্য বীজ বর্ধন ও উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়, যেমন বীজ বপন, রোপণ, ফসল সংগ্রহ, মাড়াই শুকানো, পরিবহণ ও সংরক্ষণ এর সময় তিনটি প্রজনক সারির বা সঙ্কর বীজের সাথে অন্য জাতের ধানের বীজ মিশে যেতে পারে।

প্রকৃতিক বিভিন্নতা : প্রজনক সারি তিনটির চাষাবাদের সময়, এমনকি অন্য কোনো স্থান থেকে প্রজনক সারিসমূহ প্রবর্তন করলেও সারিগুলোতে স্বাভারিকভাবেই কৌলিক বিভিন্নতা ঘটতে পারে। যার ফলে বৈশিষ্ট্যসমূহের এবং উর্বরতার পৃথকীকরণ ঘটে, যদিও এর সম্ভাবনা ততোটা বেশি নয়।

প্রজনক সারি বিশুদ্ধকরণ

প্রজনক সারিসমূহের (A, B, এবং R lines) বিশুদ্ধকরণের জন্য নানা ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সবচেয়ে সহজ এবং কার্যকর পদ্ধতি হলো তিনটি নার্সারির ব্যবহার যা চার ধাপে সম্পন্ন করা হয়। নার্সারি তিনটি হলো :

১. যাচাই সঙ্করায়ণ (testcross) নার্সারি ;
২. চিহ্নিতকরণ নার্সারি ; এবং
৩. বীজ বর্ধন নার্সারি।

ধাপ চারটি হলো

১. একক গাছ নির্বাচন ;
২. জোড়ায় জোড়ায় যাচাই সঙ্করায়ণ ;

৩. প্রত্যেক সারি চিহ্নিতকরণ ; এবং
৪. আয়ত (bulk) বীজবর্ধন।

আদর্শ গাছ নির্বাচন

প্রজনক সারি তিনটির প্রত্যেকটির স্বাভাবিকভাবে জন্মানো ভাল গাছগুলো একটি একটি করে কঠোরভাবে মূল্যায়নের পর নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনের ভিত্তি হয় আদর্শ বৈশিষ্ট্যসমূহ, বন্ধ্যাত্ব এবং কাঙ্ক্ষিত প্রতিরোধিতা।

জোড়ায় জোড়ায় যাচাই-সঙ্করায়ণ ও ফিরতি সঙ্করায়ণ : নির্বাচিত একক গাছসমূহকে যাচাই সঙ্করায়ন নার্সারিতে যাচাই–সঙ্করায়ণ এবং পশ্চাৎ সঙ্করায়ণ করা হয়। সাধারণত ৫০ জোড়া A × B ক্রস (cross) দরকার হয় এবং প্রত্যেক জোড়া যেনো ফিরতি–সঙ্করায়ণ (backcross)–এর মাধ্যমে ১০০টিরও বেশি বীজ উৎপন্ন করে। একই A × B জোড়াগুলো যাচাই–সঙ্করায়ণের জন্যও ব্যবহৃত হয় এবং এক্ষেত্রে প্রতি জোড়া থেকে ২০০টির বেশি বীজ উৎপন্ন করা হয়।

প্রত্যেক সারি সনাক্তকরণ : পুং প্রজনকের আচরণ, F_1 সারির সঙ্করসাবল্য এবং A সারির বন্ধ্যাত্বের মূল্যায়নের জন্য তিনটি চিহ্নিতকরণ নার্সারি স্থাপন করা হয়।

বন্ধ্যাত্ব শনাক্তকরণ নার্সারি : একটি ভালোভাবে পৃথককৃত প্লটে A সারি এবং এর B সারিজোড়া হিসেবে রোপণ করা হয়। প্রারম্ভিক ছড়া পর্যায়ে এদের পুং–বন্ধ্যাত্ব চিহ্নিত করতে হয়।

সঙ্করসাবল্য মূল্যায়ন নার্সারি এবং R সারি নার্সারি : প্রতি জোড়া A × R–এর জন্য প্রায় ১০০ F_1 গাছ লাগানো হয় এবং সংশ্লিষ্ট R সারির ১০০ থেকে ২০০টি গাছ অন্য একটি পৃথককৃত প্লটে লাগানো হয়। যেসব উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সঙ্করসাবল্য সনাক্ত করতে হয় তা হলো— বৃদ্ধির সতেজতা, কুশি জন্মানোর ক্ষমতা, ছড়াবহনকারী কুশির শতকরা হার, সমরূপতা (uniformity), কাঙ্ক্ষিত প্রতিরোধিতা, দানার ফলন এবং বিশেষ করে বীজ ধারণের হার (seed-setting rate)।

আয়ত বীজবর্ধন : নির্বাচিত A সারি এবং B সারির বীজকে আলাদাভাবে বৃহৎ পরিমাণে (bulk) সংগ্রহ করে প্রজননকারী বীজ উৎপাদনের জন্য এদের পৃথককৃত প্লটে বপন করা হয়। প্রত্যেক নির্বাচিত পুনঃস্থাপক সারির (R line) বীজ বৃহৎ পরিমাণে সংগ্রহ করে পরবর্তীতে প্রজননকারী বীজ উৎপাদনের জন্য অন্য একটি পৃথককৃত প্লটে এদের বপন করা হয়। এই প্রজননকারী বীজ পুনরায় বীজ বর্ধনের মাধ্যমে ভিত্তি (foundation) বীজ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

বীজমান এবং বিশুদ্ধতা নিয়ন্ত্রণ : সঙ্কর ধান প্রযুক্তির সফলতা শুধু বাণিজ্যিকভাবে সঙ্কর বীজ। সুষ্ঠ বীজ উৎপাদন পদ্ধতির উপরও নির্ভরশীল। সঙ্কর বীজ উৎপাদন ব্যবস্থা নিম্নরূপ হতে পারে।

১. জাতীয়, প্রাদেশিক এবং জেলা/থানা পর্যায়ের প্রজনন ইউনিটগুলো উপযুক্ত প্রজনক সারিসমূহ এবং সঙ্কর সংযোগসমূহ তৈরি করে এবং এরপর তিনটি প্রজনক সারির প্রজননকারী বীজ। বীজ ব্যবসায়ে জড়িত কোম্পানিগুলোকে সরবরাহ করে।

২. প্রাদেশিক পর্যায়ের বীজ কোম্পানি প্রজনক তিনটি সারির বিশুদ্ধকরণ এবং প্রজনক সারিসমূহের ভিত্তি বীজ উৎপাদন করে।

৩. জেলা/থানা পর্যায়ের বীজ কোম্পানি CMS (A line) এবং পুনঃস্থাপক সারির (R line) বেশি পরিমাণ বীজ বর্ধন করে যাতে বৃহদাকারে সঙ্কর বীজ উৎপাদনের জন্য সেই বীজ পর্যাপ্ত হয়। প্রশাসনিক সর্বনিম্ন পর্যায়ের বীজ কোম্পানি এক থেকে তিনটি এলাকা নির্বাচন করে কিছুসংখ্যক চুক্তিভিত্তিক বীজ উৎপাদক সংগঠিত করে তাদের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য প্রত্যয়িত (certified) সঙ্কর (F_1) বীজ উৎপাদন করে।

৪. শুধু বৈধভাবে স্বীকৃত বীজ কোম্পানিগুলো প্রত্যয়িত সঙ্কর বীজ কৃষকের কাছে বন্টন বিক্রি করে অধিকার প্রাপ্ত।

সঙ্কর ধান চাষের কলাকৌশল

সঙ্কর ধানের পরিচর্যা

সঙ্কর ধানের সর্বোত্তম অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যাবলীই হলো এর উচ্চ ফলনশীলতার মূল ভিত্তি। যা হোক, সঙ্কর ধান চাষে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করে এবং সঙ্কর ধানের বৈশিষ্ট্যবলীর জন্য উপযোগী সঠিক চাষাবাদ কৌশলসমূহ অবলম্বন করেই শুধু এর সঙ্করসাবল্য পূর্ণমাত্রায় বাস্তবে পরিণত করা যায়।

উপযুক্ত সংযোগ বেছে নেওয়া

একটি সর্বোত্তম সংযোগ নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকবে—

১. উচ্চ ফলনশীলতা ;
২. একটি নির্দিষ্ট এলাকার আবাদ মৌসুম এবং শস্য আবার পদ্ধতি ;
৩. প্রধান রোগবালাই ও কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিরোধিতা এবং
৪. ভাল গুণসম্পন্ন দানা।

সতেজ কুশিযুক্ত চারা উৎপাদন

বেশি ফলন পেতে এবং একক গাছ ও উদ্ভিদসমষ্টি-এর মধ্যকার অমিল দূর করে সামঞ্জস্যতা আনার জন্য বলিষ্ট চারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলিষ্ঠ চারার বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বেশি কুশির সংখ্যা, ভাল শিকড় গজানোর ক্ষমতা, কাণ্ডের গোড়া চওড়া, অধিক শুষ্ক বস্তু এবং গোড়ার পত্রাবরণে অধিক ভাস্কুলার বান্ডিল। সতেজ চারাসমূহের মূলাঞ্চলের বৃদ্ধি ও কার্যাবলী বাড়িয়ে তা দিয়ে ফসলের ফলন অনেকাংশে বাড়ানো যায়।

পাতলা করে এবং সমভাবে বীজ বপন : বীজ তলায় চারার অধিক সংখ্যক কুশি বাড়াতে বীজ পাতলা করে এবং সমভাবে ছিটিয়ে বপন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সঙ্কর ধানের বীজ হার প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হওয়া উচিত। তবুও এ বীজ চারার বয়স, স্থানীয় তাপমাত্রা এবং ব্যবহৃত জাতের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা উচিত।

সঙ্কর ধান চাষাবাদে খুব কম বীজ হার ব্যবহার করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বীজ বপনের পূর্বে আগাছা দমন করতে বীজ তলায় আগাছানাশক স্প্রে করতে হয়, কারণ পাতলা করে বীজ বপন করার ফলে আগাছা সহজেই বেড়ে উঠে।

রোপণের সময় চারার বয়সভেদে বীজ হার

রোপণ কালে চারার পাতার সংখ্যা	বীজ হার (কেজি/হেক্টর)
৫	৩০০
৬	২২৫
৭	১৮৭
৮	১৫০
৯	১১২

কৃত্রিম উষ্ণ অবস্থায় চারা উৎপাদন : চারার কচি অবস্থায় যেসব এলাকায় তাপমাত্রা কম থাকে, সেসব স্থানে বীজতলা গরম রাখতে পলিথিন শিট দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়।

পাতলাকরণ এবং পুনঃরোপণ : যখন চারার পাতার সংখ্যা ১.৫ থেকে ২.৫-তে পৌঁছে, তখন কাছাকাছি জন্মানো চারা সঠিকভাবে পাতলা করে দিতে হয় এবং এসব অতিরিক্ত সেসব স্থানে লাগাতে হয় যেখানে চারার সংখ্যা কম।

সার প্রয়োগ এবং অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রয়োগ : যখন চারার পাতার সংখ্যা প্রতি গাছে ২.১টি হয়, তখন কিছু পরিমাণ দ্রুত কার্যকরি নাইট্রোজেন সার (৪৫ থেকে ৬০ কেজি ইউরিয়া/হেক্টর) প্রয়োগ করতে হয়। বীজতলায় সর্বোচ্চ কুশি পাওয়ার জন্য পটাশিয়াম সারও ব্যবহার করা যেতে পারে। এ সার চারাগুলোর গোড়ার দিকের গিট থেকে বেশি সংখ্যক কুশি উৎপাদনের সাহায্য করে। চারার বৃদ্ধির অবস্থার উপর নির্ভর করে, চারা রোপণের ৩ থেকে ৫ দিন আগে আবার কিছু নাইট্রোজেন সার (হেক্টর প্রতি ৪৫ কেজির কম ইউরিয়া) প্রয়োগ করা ভাল, এতে চারাগুলোর সাদা শিকড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

সময়মত বীজ বোনা এবং রোপণ

প্রচলিত জাতের চেয়ে সঙ্কর ধান ফুলফোটা পর্যায়ে তাপমাত্রার প্রতি বেশি সংবেদনশীল ইন্ডিকা সঙ্কর জাতের ফুল ফোটার জন্য উপযোগী দৈনিক গড় তাপমাত্রা হলো ২৪° থেকে ২৯° সেন্টিগ্রেড। দৈনিক গড় তাপমাত্রা যদি ৩০° সেন্টিগ্রেট-এর বেশি বা ২৩° সেন্টিগ্রেট-এর কম তিন দিন বা তার বেশি বিরাজ করে তবে চিটা ধানের সংখ্যা বেড়ে যায়। জ্যাপোনিকা সঙ্করের ক্ষেত্রে ফুলফোটার সময়ে উপযোগী দৈনিক গড় তাপমাত্রা হলো ২২ থেকে ২৬° সেন্টিগ্রেট।

উচ্চ ফলনশীল উদ্ভিদসমষ্টি সৃষ্টি

আলোকশক্তি (light energy) এবং মাটির উর্বরতা পূর্ণ মাত্রায় সদ্ব্যবহার করে ভাল ফলন পাওয়ার জন্য সঙ্কর ধানের একটি কাঙ্ক্ষিত উদ্ভিদসমষ্টির ব্যবস্থা করা জরুরি। সঙ্কর ধানের উত্তম বৈশিষ্ট্যসমূহের উপর ভিত্তি করে এর সঙ্করসাবল্যের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে তা করা হয়।

ধানের ফলন চারটি নির্ণয়কের উপর নির্ভর করে—

১. উৎপাদনশীল ছড়ার সংখ্যা
২. ছড়া প্রতি ধানের সংখ্যা

৩. বীজ ধারণের হার বা ছড়া প্রতি পুষ্ট দানার সংখ্যা এবং
৪. দানার ওজন।

সাধারণত প্রথম ৩টি নির্ণয়ক গাছের সংখ্যা এবং সারের মাত্রার দ্বার সহজে প্রভাবিত হয়। এ ছাড়া ছড়ার সংখ্যা এবং ছড়া প্রতি ধানের সংখ্যার কুশির মধ্যে সাধারণত ঋণাত্মক সম্পর্ক প্রদর্শন করে। এজন্য সঙ্কর ধানের উদ্ভিদসমষ্টি এমনভাবে গড়ে তুলতে হয় যাতে যৌক্তিকভাবে ঘন রোপণ করে প্রারম্ভিক রোপণকৃত চারার সংখ্যা ঠিকমতো রাখার মাধ্যমে ছড়াপ্রতি ধানের সংখ্যা না কমিয়েও অধিক সংখ্যক উৎপাদনক্ষম ছড়া পাওয়া নিশ্চিত করা যায়।

আগাম মৌসুমের সঙ্কর ধানের প্রতি হেক্টরে ৭.৫ থেকে ৮.৫ মেট্রিক টন চালের জন্য উদ্ভিদ সমষ্টির গঠন

১. রোপণ দূরত্ব এবং প্রারম্ভিক চারা : গোছাপ্রতি ৪ থেকে ৫টি চারা (কুশিসহ) এবং প্রতি হেক্টরে ০.৩ থেকে ০.৩৭৫ মিলিয়ন গোছা।
২. সর্বোচ্চ সংখ্যক কুশির সংখ্যা : মোটামুটি হেক্টর প্রতি ৪.৫ মিলিয়ন কুশি।
৩. উৎপাদনক্ষম কুশির সংখ্যা : বড়ো ছড়াযুক্ত সঙ্কর জাতে প্রতি হেক্টরে ৩.০ মিলিয়ন এবং মাঝারি আকারের ছড়াযুক্ত সঙ্কর জাতে ৩.৭ মিলিয়ন।

মধ্যম মৌসুমের সঙ্কর ধানের প্রতি হেক্টরে ৯.৫ থেকে ১০.৫ মেট্রিক টন চালের ফলনের জন্য উদ্ভিদসমষ্টির গঠন

১. রোপণ দূরত্ব ও প্রারম্ভিক চারার সংখ্যা : গোছা প্রতি ৩ থেকে ৪টি চারা অথবা গোছা প্রতি ৬ থেকে ৭টি চারা এবং প্রতি হেক্টরে ০.২৫ থেকে ০.৩০ মিলিয়ন গোছা।
২. সর্বোচ্চ সংখ্যক কুশির সংখ্যা : বড়ো ছড়াযুক্ত সঙ্কর জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ৩.৩ থেকে ৩.৬ মিলিয়ন এবং মধ্যম ছড়াযুক্ত জাতের জন্য প্রতি হেক্টর ৪.০ থেকে ৪.৫ মিলিয়ন।
৩. উৎপাদনক্ষম কুশির সংখ্যা : বড়ো ছড়াযুক্ত সঙ্কর জাতে প্রতি হেক্টরে ২.৫ থেকে ৩.০ মিলিয়ন এবং মাঝারি আকারের ছড়াযুক্ত সঙ্কর জাতে ৩.৫ মিলিয়ন।

নাবী মৌসুমের সঙ্কর ধানের প্রতি হেক্টরে ৭.৫ মেট্রিক টন চালের ফলনের জন্য উদ্ভিদসমষ্টির গঠন

১. রোপণ দূরত্ব এবং প্রারম্ভিক চারার সংখ্যা : প্রতি গোছায় ৫ থেকে ৬টি চারা (কুশিসহ) এবং প্রতি হেক্টরে ০.৩ থেকে ০.৩৭৫ মিলিয়ন গোছা।
২. সর্বোচ্চ কুশির সংখ্যা : প্রতি হেক্টরে ৩.৫ থেকে ৪.০ মিলিয়ন।
৩. উৎপাদনক্ষম কুশির সংখ্যা : বড়ো ছড়াযুক্ত সঙ্কর জাতের জন্য প্রতি হেক্টরে ২.৫ থেকে ২.৭ মিলিয়ন এবং মাঝারি ছড়াযুক্ত সঙ্কর জাতে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন।

পুষ্টি উপাদানের চাহিদা এবং সার ব্যবস্থাপনা

সঙ্কর ধান নাইট্রোজেন প্রয়োগের প্রতি অতি মাত্রায় সংবেদনশীল বিধায় একই পরিমাণ ফলন পেতে প্রচলিত জাতের চেয়ে সঙ্কর জাতে কম নাইট্রোজেন প্রয়োজন এবং মাঝারি বা কম মাত্রায়

নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের ফলে প্রচলিত জাতের চেয়ে সঙ্কর জাতে অধিক মাত্রায় ফলন বৃদ্ধি ঘটায়। যদিও সঙ্কর জাতের নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়ামের গ্রহণমাত্রা মাটির উর্বরতা, জলবায়ুর অবস্থা, জাত এবং সার ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী বিভিন্ন হয়ে থাকে, তথাপিও নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং পটাশিয়াম গ্রহণের সাথে ফলনের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। একটি সাধারণ নিয়ম হলো হেক্টর প্রতি ৭.৫ মেট্রিন টন দানার (চালের) ফলন (grain yield) পেতে সঙ্কর ধান ১৫০ কেজি নাইট্রোজেন, ৭০ কেজি ফসফরাস এবং ১২০ কেজি পটাশিয়াম গ্রহণ করে। সাধারণভাবে নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম, ফসফরাসের ব্যবহার অনুপাত হলো ১.০ ঃ ০. ৪৫ ঃ ০.৮।

সঙ্কর ধান প্রচলিত জাতের চেয়ে বেশি মাত্রায় পটাশিয়াম গ্রহণ করে বলে এবং পাতার ক্রিয়াশীল কাল (functional period) খানিকটা দীর্ঘস্থায়ী করতে বেশি পরিমাণ পটাশিয়াম সার প্রয়োগের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। সঙ্কর ধানের পুষ্টি উপাদানের চাহিদা অনুযায়ী পরিমিত পরিমাণ সার প্রয়োগ করা উচিত। আগাম মৌসুমের সঙ্কর জাতের জন্য জমি প্রস্তুতের সময় মাটিতে মিশিয়ে সারের প্রয়োগ (basal dressing) এবং সারের উপরিপ্রয়োগের অনুপাত হলো ৬ ঃ ৪ এবং মধ্যম ও নাবী সঙ্কর জাতের জন্য ঐরূপ ব্যবহারের অনুপাত ৫ ঃ ৫। সাধারণত সারের উপরিপ্রয়োগ কয়েক দফায়, বিশেষ করে কুশি গজানো, ছড়া গঠন (panicle formation) ও দানা ভরাট (grain filling) পর্যায়ে প্রয়োগ করা শ্রেয়।

চারা রোপণ থেকে কুশি গজানো পর্যন্ত সময় : মূলত এ সময়ের মধ্যে শিকড়, পাতা ও কুশির বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। এ সময়ের মধ্যে সারের মোট উপরিপ্রয়োগের প্রায় ৭০% ব্যবহার করতে হয় যাতে উৎপাদনশীল কুশি পর্যায় শেষ হওয়ার আগেই যথেষ্ট সংখ্যক কাঙ্ক্ষিত কুশি পাওয়া যায়।

কচি শীষ উৎপন্ন থেকে শীষ পর্যায় সময় : এসময়ে সঙ্কর ধানের কাণ্ড, কচি ছড়া এবং পত্রাবরণে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে, তাই এসময়ে অঙ্গজ বৃদ্ধি ও জননবৃদ্ধির মধ্যে সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা। কচি ছড়া গঠনের পর অল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন এবং পটাশিয়াম প্রয়োগ করা উচিত যেন পাতা সবুজ থাকে, কাণ্ড বলিষ্ঠ হয় এবং সালোকসংশ্লেষণ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে সর্বাধিক ছড়ার সংখ্যা এবং তার সাথে ছড়া প্রতি ধানের সংখ্যাও বৃদ্ধি হয়। ছড়া বের হওয়ার পূর্বে যখন নিশান পাতা আগা বের হচ্ছে তখন পরিমিত পটাশিয়াম ও ফসফরাসের প্রয়োজন হয় এবং গাছের শীর্ষ তিনটি পাতার বৃদ্ধির অবস্থার উপর নির্ভর করে অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেন প্রয়োগও বাঞ্ছনীয়।

শীষ থেকে পরিপক্ব পর্যায় পর্যন্ত : সম্পূর্ণ ছড়া বের হওয়ার পর পাতার রঙ অনুযায়ী হেক্টর প্রতি ৭০০ থেকে ১১২০ কেজি পানিতে ২.৫ থেকে ৩.৫ কেজি পটাশিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন ফসফেট অথবা ৭.৫ কেজি ইউরিয়া মিশিয়ে সেই দ্রবণ গাছের উপর স্প্রে করে ছিটিয়ে দেওয়া উচিত যা পত্রফলকের সালোকসংশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ায়, সর্বোচ্চ পাতাগুলোর জীবনকাল বাড়ায়, আগাম হলুদাভ হওয়া এড়ানো যায় এবং দানার ওজন বাড়ায়।

ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় : বৃহদাকার ছড়া এবং ভারি দানা ছড়াও সঙ্কর ধানের দানা ভরাট পর্যায় দু'ভাগে বিভক্ত। তাই প্রচলিত জাতের চেয়ে সঙ্কর ধানের দানা পরিপুষ্ট এবং পরিপক্ক হতে বেশি সময় নেয়।

সঙ্কর ধানের মুড়ি ফসল : ফসল কর্তনের পর ধান গাছের কর্তিত গোড়া থেকে নতুন কুশি বের হওয়ার ক্ষমতাকে ধানের মুড়ি ফসল বলে। যখন এক ফসলী ধানের জন্য সূর্যালোক, তাপমাত্রা ও পানি সরবরাহের প্রাচুর্য থাকে কিন্তু তা দো'ফসলী ধানের জন্য অপ্রতুল, সেক্ষেত্রে মুড়ি ফসলের মাধ্যমে এক ফসলী এলাকাতে ধানের উৎপাদন বাড়ানো যায়।

সঙ্কর ধানের মুড়ি ফসলের সম্ভাব্য ফলন : সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনের যে এলাকার তাপমাত্রা কম সেখানে ব্যাপকভাবে সঙ্কর ধানের মুড়ি ফসলের আবাদ হচ্ছে। চাষীরা মুড়ি ফসল থেকে হেক্টর ২.০ থেকে ২.৫ মেট্রিক টন চালের ফলন পাচ্ছে।

মুড়ি ফসলের জন্য সঙ্কর জাত : মুড়ি ফসল উপযোগী একটি আদর্শ সঙ্কর জাতের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা উচিত :

১. ফসল কর্তনের পর কর্তিত গাছের গোড়া থেকে উচ্চ হারে এবং দ্রুত কুশি পুনরুৎপাদন ;
২. উচ্চ বীজ ধারণের হার ;
৩. একই সময়ে ছড়া বের হওয়া এবং পরিপক্ক হওয়া ; এবং
৪. মুড়ি ফসলের বর্ধনকাল হয় ৬০ দিন।

বিভিন্ন দেশের ধানের প্রতিশ্রুতিশীল সঙ্কর জাত

চীন		ভারত	ভিয়েতনাম
ইন্ডিকা টাইপ	জ্যাপোনিকা টাইপ		
Bo-You 64	Dang-You-C-Bao	Hybrid 1002	IR54752A/IR64R
Jin-You 77	Han-You-Xiang-Oing	Hybrid 1006	IR54752A/OM 80R
Shan-You 46	Liu-You 1	IR58025A/IR10198-66-2R	IR58025A/IR9761-19-1R
Shan-You 64	Si-You 422	IR58025A/IR29723-143-3R	IR62829A/IR9761-19-1R
Shan-You-Gui 33	Xiu-You 57	IR58025A/IR9761-19-1R	Shan-You 63
Shan-You-Gui 99	76-27A/PC 312	IR58025A/Swarna	Shan-You-Gui 99
Wei-You 46	Han-You 1027	IR58025A/Vajram	Te-You 63
Wei-You 49	Li-You-C-Bao	IR62829A/WGL3962	UTL 1I (IR64615H)
Wei-You 77	Tai-Za 2	PMS 8A/IR31432-6-2-1	UTL 2 (IR64616H)
Wei-You 647	76-You 312	PMS 8A/PAU 1106-6-2	V20 A/IR8423R
Wei-You-Fu 26		PMS 10A/PAU 1106-6-2	Zhi-You-Gui 99
You-1 46			
Zhi-You 77			
II-You 63			
D-You-Gui 99			
Shan-You-Gui 34			
Wei-You 35			
Wei-You 64			
Wei-You 1126			
Xie-You 64			
You 177			
II-You 46			

সঙ্কর ধানের মুড়ি ফসল চাষের পদ্ধতি : সঙ্কর ধানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মুড়ি ফসলের অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে হয়।

১. **নাড়ার উচ্চতা :** নাড়ার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্ব উৎপাদিত কুশিসমূহের অবদান মুড়ি ফসলের মোট ফলনের ৭০%। উচ্চ এবং স্থায়ী ফলন পেতে হলে মুড়ির শীষের অধিকাংশই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বের কুঁড়ি (bud) থেকে বের হওয়া উচিত।

২. **নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ :** প্রধান ফসলের (main crop) অবস্থা এবং মাটির উর্বরতার উপর ভিত্তি করে মুড়ি ফসলে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের মাত্রা এবং সময় বিভিন্ন রকম হয়। আগাম এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক মুড়ি পেতে দুই দফায় দ্রুত অবমুক্তিক্ষম নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ করতে হয় ; প্রধান ফসল কর্তনের ৫ থেকে ৭ দিন পূর্বে এবং কর্তনের অব্যবহিত পরেই। সাধারণত প্রতি হেক্টরে মোট ৭৫ কেজি ইউরিয়া প্রয়োগ করা হয়।

অগ্রগামী সঙ্কর ধানের জাত : চীনে ১৯৭২ সালে প্রবল সঙ্করসাবল্য সম্বলিত সঙ্কর ধানের অগ্রদূত Nan-You 2 জাতটি সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত হয় এবং ১৯৭৬ সালে এ জাতকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অবমুক্ত করা হয়। তখন থেকে একশ'র বেশি সঙ্কর ধানের জাত ব্যাপকভাবে চাষাবাদের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে। অন্যান্য দেশসমূহেও প্রচুর প্রতিশ্রুতিশীল ধানের সঙ্কর জাতসমূহ উদ্ভাবন করা হয়েছে।

দুই সারি সিস্টেম-এর সঙ্কর ধানের প্রজনন

সঙ্কর ধান সৃষ্টিতে EGMS সারিসমূহ ব্যবহার করা হলে সেই ধান সৃষ্টির Classical বা প্রচলিত তিন সারি অর্থাৎ CMS সিস্টেম-এর চেয়ে নিচে উল্লেখকৃত সুবিধাসমূহ পাওয়া যায় :

১. এটি EGMS সারিসমূহের ব্যবহার সঙ্কর বীজ উৎপাদন পদ্ধতিকে সহজ করে এবং সঙ্কর বীজের খরচ কমায়, কারণ এতে বন্ধ্যাত্ব সংরক্ষণকারী সারির প্রয়োজন হয় না। PGMS সারি লম্বা দিবস দৈর্ঘ্যে এবং TGMS সারিসমূহ উচ্চ তাপমাত্রায় সম্পূর্ণভাবে পুং বন্ধ্যাত্ব প্রদর্শন করে এবং এ অবস্থায় এদের ব্যবহার করে সঙ্কর বীজ উৎপাদন করা হয়।

২. যেহেতু PGMS এবং TGMS সারিসমূহের পুং বন্ধ্যাত্ব প্রচ্ছন্ন জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এজন্য প্রায় সকল সাধারণ জাতের ধান এসব পুং বন্ধ্যা সারির উর্বরতা পুনঃস্থাপন করতে পারে। এজন্য উৎকৃষ্ট সঙ্কর জাত উদ্ভাবনের জন্য প্রজনকসমূহের নির্বাচনের ক্ষেত্র যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, ফলে ভাল সঙ্কর সংযোগ প্রাপ্তির সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. নানা ধরনের প্রজনন কর্মসূচিতে প্রয়োজনে প্রায় যে কোনো ধান জাতের নতুন পুং বন্ধ্যা সারিসমূহের তৈরিতে PGMS এবং TGMS জিনসমূহ খুব সহজেই স্থানান্তর করা যায়।

৪. PGMS এবং TGMS সারিসমূহের পুং বন্ধ্যাত্ব সাইটোপ্লাজমের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এবং WA ধরনের একক (unitary) সাইটোপ্লাজমীয় অবস্থা পরিহার করা যায়।

আন্তঃজাত সঙ্কর উদ্ভাবন

আন্তঃজাত সঙ্কর তৈরিতে কোনো কৌলিক প্রতিবন্ধকতা বা উর্বরতা সম্পর্কিত কোনো সমস্যা নেই। সুতরাং একটি ভাল EGMS সারি পাওয়া গেলে যাচাই সঙ্করায়ণের মাধ্যমে আন্তঃজাতের

ভাল সঙ্কর পাওয়া সহজতর হয়। বর্তমানে দুই–সারি সিস্টেম হতে উদ্ভাবিত আন্তঃজাতের সঙ্কর ধানগুলো বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত কার হচ্ছে।

আন্তঃউপপ্রজাতীয় সঙ্কর উদ্ভাবন

বিভিন্ন ধরনের সঙ্করসাবল্যের মাত্রা নিচের ধারা বহন করে : *indica x japonica* × *indica x javanica* × *japonica x javanica* × *indica x indica* > *japonica* × *japonica*. যেহেতু *japonica* × *javanica* সঙ্করসমূহে উর্বরতা সমস্যা বেশ কম আছে এবং প্রায় সকল *javanica* জাতের দানার গুণ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য অনেক দিক দিয়ে *japonica* জাতের সমান, তাই *japonica* জাতের ধানের ফলনের বাড়াতে কার্যকর উপায় হিসেবে *janponica* × *javanica* সঙ্করসমূহের সঙ্করসাবল্যের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত।

আন্তঃউপজাতীয় *indica/japonica* সঙ্করসমূহের আধার (sink) এবং উৎস (source) উভয় ক্ষেত্রেই সর্বোত্তম ফলনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ তাত্ত্বিক দিক থেকে এই সঙ্করসমূহ প্রচলিত সর্বোত্তম আন্তঃজাতের সঙ্করসমূহের চেয়ে ৩০% বেশি ফলন সুবিধা দিয়ে থাকে। সুতরাং দুই–সারি সিস্টেমের সঙ্কর ধান প্রজনন কর্মসূচিতে *indica* × *japonica* সঙ্করসমূহে প্রাপ্ত সবল সঙ্করসাবল্যকে ঠিকমতো ব্যবহারই প্রধান লক্ষ্য।

বীজ বর্ধন (Multiplication)

১. EGMS সারিসমূহের বীজ বর্ধন কিছুটা সহজ, কারণ দুই সারির পরিবর্তে বীজ বর্ধন প্লটে একটি মাত্র সারি লাগানো হয়। এ বীজ বর্ধনে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাপনাসমূহ মেনে চলতে হয় :

২. অযৌনভ্রূণীতা একটি জিন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এর বংশানুসরণ খুব সহজ হয়, যার ফলে অযৌনভ্রূণী F_1 সঙ্কর সহজে তৈরি করা যায় ;

৩ অযৌনভ্রূণীতার বহিঃপ্রকাশ হয় স্থায়ী, সম্পূর্ণ এবং এটি সহজে পরিবেশ দিয়ে প্রভাবিত হয় না ;

৪. অযৌনভ্রূণতার প্রকৃতি হয় বাধ্যতামূলক বা এর কাছাকাছি ;

৫. শস্য হয় পূর্ণ বিকশিত এবং এটি প্রধান খাদ্য হিসেবে খাওয়ার যোগ্য হয়।

ধানের বুনো প্রজাতি এবং অন্যান্য জাতে অযৌনভ্রূণ সন্ধান করা

যেসব একক গাছ পুং বন্ধ্যা বা যারা কম উর্বরতা প্রদর্শন করে কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে পর্যাপ্ত বীজ উৎপন্ন করে, এদেরকে নির্বাচিত করে প্রকট চিহ্নিতকরণ উদ্ভিদের (dominant markers) সাথে সঙ্করায়ণ করতে হয়। F_1 সঙ্কর থেকে যেসব গাছ স্ত্রী প্রজনকের বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রদর্শন করে, শুধু এদেরকে নির্বাচিত করতে হয় ; অথবা আবাদকৃত জাতকে বুনো প্রজাতির সাথে সঙ্করায়ণের পর সৃষ্ট F_1 সঙ্কর জাতকে (progeny) থেকে যেসব গাছ নির্বাচন করতে হয় যারা অতি মাত্রায় বন্ধ্যা পরাগ থাকা সত্ত্বেও উচ্চমাত্রায় অনিষিক্ত ফল বা বীজ (parthenocarpy) তৈরি করে।

বহুভ্রূণী চারা নির্বাচনের মাধ্যমে অযৌনভ্রূণী সন্ধান করা

বহু ভ্রূণসম্পন্ন বীজ অঙ্কুরোদগমের ফলে সৃষ্ট চারাকে বহুভ্রূণী চারা বলে। ধানের অস্থানিক ভ্রূণের প্রধান বহিঃপ্রকাশই হলো একটি বহুভ্রূণী চারা অযৌনভ্রূণী বস্তু পাওয়ার একটি উপায় হলো ধানের

উচ্চমাত্রার অযৌনভ্রূণী দ্রব্যাদি

সম্প্রতি উচ্চমাত্রার অযৌনভ্রূণবিশিষ্ট ধানের নতুন সারিসমূহ উদ্ভাবিত হয়েছে। যমজ চারা সারির সাথে জ্যাপোনিকা জাতের সঙ্করায়ণের ফলে সৃষ্ট জাতকের মধ্য থেকে একটি যমজ চারা সারির শুকনা বীজে আয়ন রশ্মি বিকিরণ করে।

অযৌনভ্রূণীতার প্রজননক্ষম F_1 সঙ্কর ধান উদ্ভাবন

ধানে সঙ্করসাবল্য ব্যবহারের জন্য অযৌনভ্রূণীতার প্রজনন একটি নতুন কৌশল। যেহেতু প্রচলিত কোনো অযৌনভ্রূণী ধান প্রজাতি (aponictic rice species) নেই, তাই স্থায়ী অযৌনভ্রূণী জিনসমূহের খোঁজ পাওয়া প্রথম কাজ।

ধানের অযৌনভ্রূণীতার কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য

স্থায়ী F_1 সঙ্করসাবল্যের জন্য একটি আদর্শ অযৌনভ্রূণী ধানের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থাকা উচিত :

১. স্বাভাবিক পরাগরেণুর বিকাশের নিশ্চয়তার জন্য উদ্ভিদসমষ্টির সংবেদনশীল পর্যায়টি সহায়ক দিবস–দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রার সাথে মিলে যেতে হয়।

২. যেহেতু EGMS সারিসমূহের গর্ভমুণ্ড সাধারণত পূণ বিকশিত এবং উদ্‌গত (exserted), তাই বীজের বিশুদ্ধতা রক্ষার্থে প্রতি সারির উদ্ভিদ সমষ্টির জন্য কঠোর পৃথকীকরণ (isolation) ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হয়।

সঙ্কর বীজ উৎপাদন

দুই সারি বা তিন সারি সিস্টেম এর সঙ্কর বীজ উৎপাদন একই রকম। এজন্য তিন সারির ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থাপনাসমূহ অবলম্বন করা হয়ে থাকে, দুই সারির ক্ষেত্রেও তা করতে হয়, শুধু দুই সারি সিস্টেমে GA_3 কম মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়।

যেহেতু EGMS লইনসমূহের উর্বরতা পরিবর্তন পরিবেশের অবস্থা হতে আবেশিত হয়, এজন্য ফসল উৎপাদন মৌসুম এমনভাবে নির্বাচন করতে হয় যেনো EGMS উদ্ভিদসমষ্টি সবসময় বন্ধ্যা থাকে।

এক সারি সিস্টেমের সঙ্কর ধান উদ্ভাবনের উপর গবেষণা (Studies on one-line system hybrid rice development)

সঙ্কর ধান প্রজননে মূল কৌশল হলো, প্রজনন পদ্ধতিসমূহকে সহজ করা এবং সঙ্করসাবল্যের মাত্রাকে বাড়ানো। সঙ্করসাবল্যের মাত্রাকে বাড়ানোর জন্য তিনটি পর্যায় রয়েছে :

১. তিন সারি পদ্ধতির হতে উদ্ভাবিত আন্তঃজাত সঙ্করসমূহের সঙ্করসাবল্যের ব্যবহার ;

২. দুই সারি পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত আন্তঃউপপ্রজাতীয় সঙ্করসমূহের সঙ্করসাবল্য ব্যবহার;

৩. এক সারি পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত আন্তঃউপপ্রজাতীয় এবং এমনকি এর চেয়েও দূরবর্তী সঙ্করসমূহের সঙ্করসাবল্যের স্থিতায়ন এবং ব্যবহার। এই শেষ কর্মপন্থাটির উপর দৃষ্টি রেখে কিছু বিজ্ঞানী সঙ্করসাবল্যের স্থিতায়নের জন্য অতি সম্প্রতি এক সারি পদ্ধতির গবেষণায় নিয়োজিত হয়েছে।

সঙ্করসালব্য স্থিতায়নের সম্ভাব্য উপায়

তত্ত্বীয়ভাবে সঙ্করসাবল্য স্থিতায়নে অনেকগুলো সম্ভাব্য উপায় রয়েছে। এর মধ্যে গবেষণাধীন কিছু পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো :

১. মুড়ি ফসল বা বহু বর্ষজীবী ধান হিসেবে আবাদ করে F_1 সঙ্করসমূহের অযৌন বংশ বিস্তার ;

২. F_1 সঙ্করসমূহের দেহ দৈহিক কোষ থেকে পুনরুৎপাদিত ক্ষুদে চারাসমূহের বৃহদাকারে উৎপাদন ;

৩. সুযহ–ঘাতক সিস্টেমের ব্যবহার, যেখানে শুধু হেটারোজাইগোটসমূহ বৃদ্ধি লাভ করে এবং বীজ তৈরি করে কিন্তু হোমোজাইগোটসমূহ হোমোজাইগাস–ঘাতক প্রবৃত্তির জন্য বৃদ্ধিলাভ করতে এবং বীজ উৎপাদন করতে পারে না ;

৪. অযৌনভ্রূণীতার মাধ্যমে অযৌন বীজ উৎপাদন, যা মাতৃ–গাছ সদৃশ্য গাছ তৈরি করতে হয় এবং এর সঙ্করসাবল্য ধরে রাখে ।

অষ্টম অধ্যায়

ধানের জমিতে সার প্রয়োগ ও পানি ব্যবস্থাপনা

১। সারের প্রকার

বাংলাদেশে বর্তমানে জমিতে উচ্চ ফলন পেতে হলে সার প্রয়োগ করতে হয়। দেশী জাতের তুলনায় উফশী জাত অধিক পরিমাণ উদ্ভিদ পুষ্টি গ্রহণ করে। এ জন্য সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়। ধানের জমিতে নিচে উল্লেখিত সময়ে সার প্রয়োগ করতে হয়।

১। জৈব সার

গোবর বা কমপোস্টজাতীয় জৈব সার জমি প্রস্তুত করার সময় প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। জৈব সার প্রয়োগের ৭ থেকে ১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হয়।

২। রাসায়নিক সার

ইউরিয়া সার ব্যতীত সব জমিতে শেষ চাষ দেওয়ার আগে প্রয়োগ করে মই দিতে হয়।

৩। ইউরিয়া সার

জমিতে চারা রোপণের পর ৩ কিস্তিতে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগ করতে হয়। ধানের জমিতে সার প্রয়োগের নির্দেশনা সুপারিশ নিচে উল্লেখ করা হলো। ধানের জমিতে সার প্রয়োগের সর্বায়িত (generalized) নীতিমালার আলোকে নির্দিষ্ট জমিতে জাত ও মৌসুমভেদে সার সুপারিশ চূড়ান্ত করতে হয়।

২। উফশী ধানের জমিতে সার প্রয়োগের সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা সুপারিশ

প্রতি শতক জমিতে সারের পরিমাণ (গ্রাম)

মৌসুম	ধানের জাত	সারের পরিমাণ /গ্রাম /শতক				
		ইউরিয়া	টিএসপি	জিপসাম	জিঙ্ক	ফলন মাত্রা (কেজি/শতক)
বোনা আউশ	নিজামী নিয়ামত	৪৫০–৫৫০	২৭৫–৩৩০	১৪৫–১৭৫	২২০—২৬০	৩০–৩৫
রোপা আউশ	চান্দিনা, পূর্বাচী, গাজী, ব্রিবালাম	৫০০–৬০০	৩৪০–৩৮০	১৪০–১৮০	২২৫–২৬৫	৩০–৫০
	বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহীবালাম	৫৫০–৬৫০	৩৪০–৩৮০	১৪০–১৮০	২২৫–২৬৫	৩০–৫০

রোপা আমন	নাবী কিরণ, দিশারী	৩৪০–৩৮০	৩৩০–৩৭০	১৩৫–১৭০	২১০–২৫০	২৫–৪০
	ব্রিশাইল প্রগতি, মুক্তা, বিপ্লব	৫৬০–৬২০	৩৫০–৩৮০	১৪০–১৮০	২৩০–২৭০	৩৫–৫৫
বোরো	চান্দিনা, পূর্বাচী, গাজী	৭০০–৮০০	৩৬০–৪৫০	১৭০–২৩০	২৩০–২৭৫	৪০–৫০
	বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না মোহিনী, শাহীবালাম	৮০০–৯০০	৪৫০–৫২০	২৫০–৩২০	২৬০–৩০০	৪০–৫০
	হাসি, শাহজালাল, মঙ্গল	৫০০–৬০০	৩২০–৩৮০	১৪৫–১৭৫	২৩০–২৭৫	৩৫–৫০

উল্লেখ্য যে, জৈব সার হিসেবে পঁচা গোবর বা কম্পোস্ট প্রয়োগ করা ভাল। প্রতি শতকে ৩০ থেকে ৫০ কেজি সার দিতে হয়। সঠিক পরিমাণ জৈব সার ব্যবহার করলে রাসায়নিক সারের পরিমাণ ২০% থেকে ৩০% কমিয়ে দেওয়া যায়।

৩। মৌসুম ও জাতভেদে ইউরিয়া সারের উপরিপ্রয়োগের সময় ও সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)

ধানের জাত	রোপণের যতদিন পর						
	০	১৫	২০	৩০	৪৫	৫০	৫৫
রোপা আউশ							
চান্দিনা, পূর্বাচী, গাজী, ব্রিবালাম, বিআর ৬, শ্রাবণী, ব্রিধান ২৭	০	৪৫		৪৫	৪৫		
বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহীবালাম	০	৫০		৫০	৫০		
বৃষ্টি নির্ভর বোনা আউশ							
নিজামী	৪৩		৪৩			৪৩	
নিয়ামত	৪৩		৪৩		৪৩		
রহমত	৪৩		৪৩		৪৩		
রোপা আমন							
ব্রিশাইল, প্রগতি, মুক্তা, বিপ্লব, কিরণ, দিশারী, ব্রিধান ৩০, ব্রিধান ৩১	০	৬০		৬০		৬০	
নয়াপাজাম, ব্রিধান ৩২, ব্রিধান ৩৩	০	৫০		৫০	৫০		

নাবী রোপা আমন							
কিরণ, দিশারী, বিনাশাইল, ব্রিধান ৩৪, নাইজারশাইল	৬৫ ৩২	০ ০		৬৫ ৩২			
বারো							
চান্দিনা, পূর্বাচী, গাজী, বিআর ৬, বিধ্রান ২৮, বিপ্লব, আশা, সুফলা, ময়না, মোহিনী, শাহীবালাম, বিধ্রান ২৯, হাসি, শাহজালাল, মঙ্গল (হাওড় একালার জন্য)	০ ০ ০	৭৫ ৯০ ৪৫		৭৫	 ৯০ ৪৫	৭০	 ৯০ ৪৫

(উল্লেখ্য, কেজি/ হেক্টর অথবা ০.১৩ সের/বিঘা।)

৪। ধানের জমিতে সার প্রয়োগের সাধারণ নীতিমালা

(ক) মাটি বিবেচনায়

১. লাল বেলে মাটি ও পাহাড়ের পাদভূমি (piedmont) মাটিতে এমপি সারের পরিমাণ দেড় গুণ দিতে হয়।

২. বেলে বুনটের মাটিতে এমপি সার দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করা ভালো।

৩. হাওড়ের মাটিতে সকল সারের পরিমাণ কমিয়ে দিতে হয়।

৪. গঙ্গা প্লাবন ভূমি ও সেচ প্রকল্প এলাকায় দস্তা সারের পরিমাণ বাড়াতে হয়।

(খ) ফসল বিবেচনায়

১. দেশী জাতের ক্ষেত্রে সারের পরিমাণ অর্ধেকের বেশি হয় না।

২. পূর্ববর্তী কোনো ফসল টিএসপি, এমপি, জিপসাম যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হলে উপস্থিত ফসলে এসব সারের অর্ধেক পরিমাণ ব্যবহার করলেই চলে।

৩. কোনো একটি ফসলে জিঙ্ক সালফেট প্রয়োগ করা হলে পরবর্তী দুটি ফসলে তা প্রয়োগ করার দরকার হয় না।

৪. ফসল চক্রের প্রথম খরিফ মৌসুমে যে জমিতে সবুজ সারের চাষ করা হয়েছে সে জমিতে পরের ফসলে ইউরিয়ার পরিমাণ ৩০% থেকে ৪০% কমানো যায়।

ধানের অপুষ্টি লক্ষণ : ধানে পুষ্টি উপাদানের অপুষ্টি দেখা দিলে প্রায়শ তা রোগ-পোকার আগমন বলে ভুল হয়। এজন্য ধানের অপুষ্টি লক্ষণ আলাদাভাবে দেওয়া হলো। ধানে ফসফরাস ও NPKZn অপুষ্টি সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে।

নাইট্রোজেনের অপুষ্টি লক্ষণ

১. ধান গাছের বাড়-বাড়তি কমে যায়।

২. গাছ খাটো হয়।

৩. কুশির সংখ্যা কম হয়।

৪. প্রথমে গাছের পুরানো পাতা বা নিচের পাতা হলদে বর্ণ ধারণ করে।

৫. পরে ধীরে ধীরে সকল পাতা তথা সম্পূর্ণ গাছ হলুদাভ হয়ে যায়।

৬. ধান গাছ পূর্ণ বয়সে পৌছার পূর্বেই অকালে ধান পাকতে শুরু করে।

৭. ফলন অত্যন্ত কম হয়।

ফসফরাসের অপুষ্টি লক্ষণ

১. গাছের শিকড় বৃদ্ধি বিঘ্নিত হয়।
২. গাছ আকারে ছোট থাকে।
৩. কুশির সংখ্যা কম হয়।
৪. পাতা ছোট ও চিকন থাকে।
৫. পাতার বর্ণ গাঢ় সবুজ দেখায়। পাতার এই গাঢ় সবুজ রঙ নাইট্রোজেনের ঘাটতিজনিত লক্ষণের বিপরীত।
৬. কচি পাতা পুরাতন পাতার চেয়ে সুস্থ থাকে এবং পুরাতন পাতাগুলো পরবর্তীকালে লালচে হয়ে মারা যায়।
৭. ধানের জীবনচক্র দীর্ঘায়িত হয়।
৮. ফসফরাস ঘাটতি চরম হলে ধান গাছে ফুল আসা অত্যন্ত বিলম্বিত হয়।
৯. ফলন কমে যায়।

পটাশিয়ামের ঘাটতি লক্ষণ

১. পাতা ছোট থাকে এবং নেতিয়ে পড়ে।
২. পটাশিয়ামের অভাবে প্রাথমিক অবস্থায় পাতার আগা ও কিনারা হলদে হয়ে যায় ও পরে সে স্থানে হাল্কা বাদামি দাগ দেখা দেয়।
৩. অনেক সময় গাঢ় সবুজ পাতায় তিলের দানার মতো ছোট বাদামি দাগ দেখা যায়।
৪. গাছে রোগের আক্রমণ বেশি হয়।
৫. ফলন কমে যায়।

গন্ধকের অপুষ্টি লক্ষণ

১. লক্ষণ অনেকটা নাইট্রোজেনের মতো, তবে পার্থক্য হচ্ছে নাইট্রোজেন ঘাটতির ক্ষেত্রে যেখানে গাছের পুরানো পাতাগুলো প্রথমে হলদে হয়ে যায় সেখানে গন্ধক ঘাটতির ক্ষেত্রে প্রথমে কচি পাতাগুলো হলদে হয়।
২. সারা মাঠে গাছ হলদে বা পাংশে হলদ রঙ ধারণ করে, তবে মাঠের নিচু জায়গায় এই লক্ষণ বেশি পরিলক্ষিত হয়।
৩. গন্ধকের ঘাটতি বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি ঘটে না।
৪. কুশির সংখ্যা কমে যায়।
৫. গাছের জীবনচক্র ব্যাহত হয়।
৬. ফলন কমে যায়।

দস্তার অপুষ্টি লক্ষণ

১. কচি পাতার গোড়া সাদা হয়ে যায়।
২. পুরাতন পাতা ও গাছ মরচে পড়া বাদামি রঙের মতো দেখা যায়।
৩. পাতার আকার ছোট হয়ে যায় এবং কোনো কোনো পাতার কিনারা কুঁচকে যায়।
৪. গাছের বাড়-বাড়তি সুষম হয় না।

৫. মাঠের বিভিন্ন স্থানে গাছের উচ্চতার তারতম্য দেখা যায়।

৬. গাছে রোগের আগমণ বেশি হয়।

৫। ধানের জমিতে সবুজসারকরণ

ধানের জমিতে সবুজ সার প্রয়োগ খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকায় ফসল বিন্যাসেই সবুজ সার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। জমিতে সবুজ সার প্রয়োগ করে ২০ থেকে ৩০ টন সবুজ বায়োঘাসের জন্য ২০ থেকে ৩০ কেজি নাইট্রোজেন কমিয়ে দেওয়া যায়। বাংলাদেশে সবুজ সারকরণের জন্য ধইঞ্চা ও গোমটর, শনপাট, কালাই, এজোলা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

সবুজ সার ফসল–ধইঞ্চা

ইংরেজি নাম : Sesbania

বৈজ্ঞানিক নাম : *Sesbania rostrata*

চাষ সময় : ৪০ থেকে ৫০ দিন

নাইট্রোজেনের সংযোজন : ১০০ কেজি/হেক্টর

জলাবদ্ধতা : সহ্যশীল

তাপ চাহিদা : ১৫° থেকে ৪০° সে:

বাংলাদেশের অনেক স্থানে সময় সমস্যার কারণে ধৈঞ্চার বীজ বপন করে সবুজ সার করা না গেলে সেক্ষেত্রে কাটিং পদ্ধতিতে গাছ জন্মানো যায়। এখানে ধৈঞ্চার কাটিং পদ্ধতি সচিত্র বিবরণ দেওয়া হলো।

রোপণ পদ্ধতি

১. কাটিং মাটির ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার গভীরে রোপণ করতে হয়।

২. মাটির নিচে ২টি গিঁট (node) থাকবে।

৩. পলিব্যাগে বা টবেও কাটিং লাগানো যায়।

৪. মাটি ভিজা রাখতে হয়।

৫. কাটিং–এ ১৫ দিনের মধ্যে শিকড় গজায়।

৬. কাটিং–এর চারা ৬০ দিনের মধ্যে মাঠে লাগানো যায়।

৬। ধানের জমিতে এজোলার সবুজসারকরণ

ধানের জমিতে প্রধাণত দুই পদ্ধতিতে এজোলা সার ব্যবহার করা যায়। যেমন—

১. এজোলা দ্রব্য প্রয়োগ করে ;

২. ধানের সাথে এজোলা চাষ করে।

এজোলা প্রয়োগ : এজোলা অন্যত্র চাষ করে প্রাথমিকভাবে প্রতি বর্গমিটারে ১০০ থেকে ২০০ গ্রাম এজোলা বীজ হিসেবে ধানের জমিতে ছড়িয়ে দিতে হয়। সাথে সাথে জমিতে প্রতি হেক্টরে ৮ থেকে ১০ কেজি সুপার ফসফেট সার দিতে হয়।

অনুকূল আবহাওয়ায় ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে এজোলা বংশবিস্তার করে জমি ভরে যায়। এ অবস্থায় ধান রোপণের পূর্বে এজোলা দ্রব্য মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। এতে জমি

১০ থেকে ১৫ টন সবুজ সারের সমান দ্রব্য যাতে ২০ থেকে ২৫ কেজি N বা ৪৫ থেকে ৫৫ কেজি ইউরিয়ার সামান্য যোগ হয়। অ্যাজোলার রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে।

ধানের সাথে এজোলার সাথী চাষ

জমিতে ধান রোপণের ৫ থেকে ৭ দিন পর জমিতে পানি থাকা অবস্থায় প্রতি বর্গমিটারে ১৫০ থেকে ২০০ গ্রাম সজীব এজোলা জমিতে ছড়িয়ে দিতে হয়। ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে জমিতে এজোলার স্তর তৈরি হলে তা মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।

৭। পানিসেচ ব্যবস্থাপনা

উচ্চ ফলনশীল ধান চাষের ক্ষেত্রে পানি সেচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জমিতে চারা রোপণের পর ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার পানি সপ্তাহখানেক আটকে রাখলে আগাছার প্রকোপ কম হয়।

এরপর জমিতে কুশি উৎপাদন পর্যায়ে পানির পরিমাণ ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার রাখলে কুশি উৎপাদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

চারার বয়স ৫০ থেকে ৬০ দিন হলে জমিতে ৭ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পানি রাখা ভালো। এতে উৎপাদনশীল কুশির সংখ্যা বাড়ে।

অধিক পানি বিলম্বিত কুশি উৎপাদন রোধ করে। বিলম্বিত কুশি থেকে ভালো দানা হয় না। জমি সমতল হলে মুক্ত প্লাবন পদ্ধতিতে এবং জমি ঢালু হলে বেসিন চেক বা আইল বদ্ধ প্লাবন পদ্ধতিতে পানি সেচ দেওয়া হয়।

জমিতে পানি কমে গেলে সে অবস্থায় প্রয়োজন মোতাবেক আগাছা দমন করে এবং উপরি করে তারপর পানি সেচ দেওয়া যায়।

জমিতে খরা দেখা দেওয়ার আশংকা থাকলে পটাশিয়াম সারের পরিমাণ বেশি দেওয়া উপকারী। এতে ফসলের ক্ষতি কম হয়।

জমিতে মাটি কিছুটা দো-আঁশ ধরনের হলে একবারে বেশি পরিমাণ পানি না দিয়ে কম কম করে ঘন ঘন পানি সেচ দেওয়া উত্তম।

জমিতে থোড় আসা অবস্থায় পানির ঘাটতি পড়া খুবই ক্ষতিকর। তবে দানা পুষ্ট হতে শুরু করলে আর পানিসেচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

নবম অধ্যায়

ধানের জমিতে আগাছা দমন

১। গুরুত্ব ও প্রকার

আগাছা ধানের প্রধান শত্রু। এজন্য সময়মতো আগাছা দমন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বোনা ধানে আগাছা দমন না করলে শতকরা ৮০ থেকে ১০০ ভাগ ফলন কমে যায়। এজন্য বোনা আউশের জমিতে বীজ বপনের ৩০ থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত অবশ্যই আগাছা মুক্ত রাখতে হয়। তা–না হলে ফলন অনেক কমে যায়। তাই বীজ বপনের ১৫ থেকে ২০ দিন পর একবার, ২৫ থেকে ৩০ দিন পর আরেকবার এবং ৩৫ থেকে ৪০ দিন পর শেষ বারের মতো জমির আগাছা ভালভাবে দমন করতে হয়। আঁচড়া প্রয়োগে আগাছার উপদ্রব কম হলে দু'বার আগাছা দমন করলেও চলে।

ধানের জমিতে ধান গাছ ছাড়াও সেখানে অনেক আগাছা জন্মে। আগাছা ধানের ফলন কমিয়ে দেয়। আগাছা মাটি থেকে ফসল গাছের পুষ্টি উপাদান শোষণ করে নিয়ে পানি ও আলোর জন্য অন্য গাছের সাথে প্রতিযোগিতা করে। জমিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। জমিতে আগাছা থাকলে এবং সে জমিতে ইউরিয়া সার দিলে ধান গাছের চেয়ে আগাছা বেশি বাড়ে। এসব কারণে আগাছা ধানের ফলন কমিয়ে দেয়। ধান গাছের প্রধান প্রধান আগাছার মধ্যে রয়েছে। এ অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি আগাছার রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে।

১। ঘাসজাতীয় আগাছা – যেমন, শ্যামা *(Echinocloa crusgalli)*

২। সেজজাতীয় আগাছা – যেমন, মুথা *(Cyperus* spp.*)*

৩। অন্যান্য আগাছা

ঘাসজাতীয় আগাছা দেখতে অনেকটা ধান গাছের মতো। এই আগাছা শনাক্ত করতে হলে পাতার গোড়ায় অরিকল আছে কি–না দেখতে হয়। ধান গাছে অরিকল থাকে। আগাছা ঘাসে অরিকল থাকে না। ধানের জমিতে উচ্চ ফলন পেতে হলে অন্তত তিন বার আগাছা দমন করতে হয়। আগাছা দমনের সাধারণ নীতি ও পদ্ধতি পরবর্তী উল্লেখ করা হলো।

১। ধানের চারা অবস্থায় চারা রোপণের ১৫ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে হাতে টেনে বা যন্ত্র দিয়ে (rice weeder) আগাছা দমন করতে হয়।

২। ধান গাছের বাড়ন্ত অবস্থায় প্রথম আগাছা দমনের পরবর্তী দুই সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় আগাছা দমন করতে হয়।

৩। ধানে কাইচথোড় অবস্থায় বা ধানের কাইচথোড় তৈরি হওয়ার ঠিক পূর্বে পুনরায় হাতে টেনে আগাছা দমন করতে হয়।

ধানের জমিতে আগাছা আলো, পানি, খাদ্য উপাদান ইত্যাদির জন্য ধানগাছের সাথে প্রতিযোগিতা করে। আগাছা প্রতিকূল পরিবেশে সহজে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং ধানগাছের

চেয়ে অধিক হারে বাড়তে পারে। এজন্য ধানের চেয়ে আগাছার বৃদ্ধি অনেক বেশি হয়। আগাছা, পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে পরোক্ষভাবেও ধানের ক্ষতি করে থাকে।

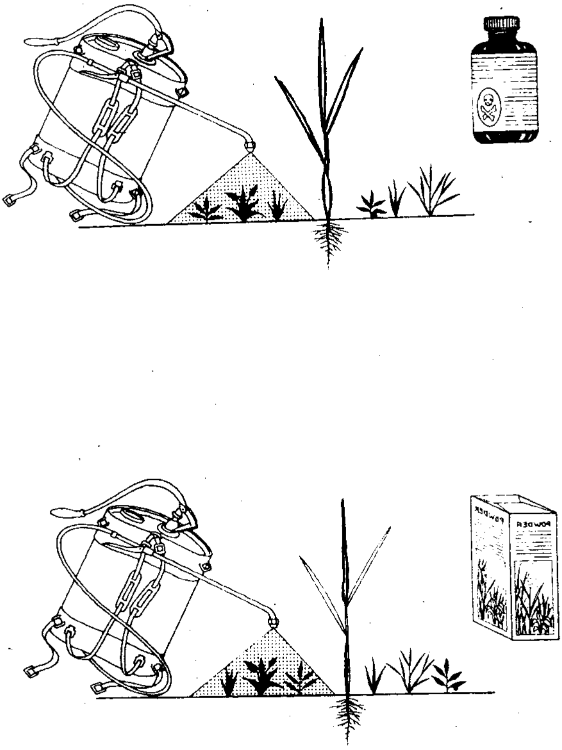

চিত্র ৮.১ : ধানের আগাছা দমনে তরল ও পাউডার আগাছানাশক প্রয়োগ

সাধারণত আমন ও বোরো মৌসুমের চেয়ে আউশ মৌসুমে, বিশেষ করে বোনা আউশে আগাছার উপদ্রব বেশি হয়। আউশ মৌসুমের প্রথম বৃষ্টিপাতের পর জমিতে দু'একটি চাষ দিয়ে পতিত অবস্থায় রেখে দিলে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে। কিছুদিন পর পুনরায় চাষ ও মই দিয়ে ধানের বীজ বপন করলে আগাছার উপদ্রব অনেকাংশে কমে যায়। রোপা ধানের জমিতে ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার বা সামান্য কিছু বেশি পানি রাখলে জমিতে আগাছা কম জন্মায়।

সাধারণত ধানগাছ রোপণের পর থেকে ধান পাকা পর্যন্ত তার তিন ভাগের এক ভাগ সময় জমি আগাছামুক্ত রাখলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। বীজ বোনা বা চারা রোপণের পর আউশ ও আমন মৌসুমের জন্য ৩০ থেকে ৪০ দিন এবং বোরো মৌসুমের জন্য ৪০ থেকে ৫০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা উচিত। ইউরিয়া সার উপরিপ্রয়োগের সময় জমি আগাছামুক্ত কি–না সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। অন্যথায় আগাছার উপদ্রব বেড়ে যায়।

জমিতে চাষ দিয়ে, জমিতে পানি জমিয়ে রেখে, হাত দিয়ে টেনে উঠানো, নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করে আগাছা দমন করা যায়। নিড়ানি যন্ত্রের ব্যবহারের জন্য ধান সারিতে রোপণ করা দরকার। এ যন্ত্র ব্যবহারের ফলে কেবল দু'সারির মাঝের আগাছা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উৎপাদিত আগাছায় যদি পরিপক্ব বীজ না থাকে তবে তা মাটির ভিতর রেখে দিয়ে পচে গিয়ে জৈব সারের কাজ করে।

২। ধানক্ষেতের প্রধান প্রধান আগাছা পরিচিতি ও নিয়ন্ত্রণ

ক্ষুদে শ্যামা

মসৃণ, ৭০ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার লম্বা গুচ্ছযুক্ত এক বর্ষজীবী ঘাস। এটি সাধারণত মাটির উপর ছড়িয়ে থাকে এবং নিচের গিটে শিকড় গজায়। কাণ্ড চ্যাপ্টা, গোড়ার দিকে সচরাচর লাল-বেগুনি রঙের এবং গিট সাধারণত মোটা থাকে। পাতার খোল মসৃণ এবং মাঝে মধ্যে চ্যাপ্টা হয়। পাতার ফলক মসৃণ, চওড়া, সরল, তলোয়ারাকৃতি এবং নরম। এটি ২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা এবং ৩ থেকে ৭ মিলিমিটার চওড়া হয়।

সবুজ থেকে বেগুনি রঙের পুষ্পবিন্যাস ৬ থেকে ১২ সেন্টিমিটার লম্বা এবং এতে ৪ থেকে ৮টি খাটো আকারের শাখা হয়—এগুলো ১ থেকে ৩ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৩ থেকে ৪ মিলিমিটার ঘন শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট উর্ধ্বমুখী ছড়া। ফল গোলাকৃতির ক্যারিওপসিস। বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার করে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ

১. বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতির সাথে এ আগাছা যেন না মিশে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।
২. কাঁচি বা নিড়ানির সাহায্যে উপড়িয়ে দমন করা দরকার।
৩. ধানের জমিতে পানি জমা রাখা এবং ধান পাকার আগেই ক্ষুদে শ্যামা দমন করা দরকার।

৩। শ্যামা

শ্যামা ঘাস একটি খাড়া ২ মিটার পর্যন্ত লম্বা বর্ষজীবী ঘাস। শিকড় ঘন এবং কাণ্ড শক্ত। কাণ্ডের গোড়ার দিকে কখনো কখনো চাপা থাকে। পাতা সরল ৪০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ৫ থেকে ১৫ মিলিমিটার চওড়া।

পাটল থেকে বেগুনি, মাঝে মধ্যে সবুজ বর্ণের পুষ্পবিন্যাস ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা। পাকার সময় ছড়াগুলো পুনরায় শাখা ছাড়ে এবং ছড়িয়ে থাকে। সাধারণত প্রধান শাখার গিটগুলো লোমযুক্ত হয়। শুঙগুলো প্রধানত লাল বা বেগুনি রঙের এবং ২.৫ সেন্টিমিটার লম্বা। ফল ২ মিলিমিটার লম্বা, ক্যারিওপসিস। বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার হয়ে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ : ১. শ্যামা ঘাস দমনের নিয়মাবলী ক্ষুদে শ্যামার অনুরূপ।

২. প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিৎ। যেমন আউশ ধান ও শ্যামা ঘাসের বীজ একই সময়ে পাকে বলে বীজধানের সাথে শ্যামার বীজ মিশে পুনরায় জমিতে জন্মানোর সুযোগ পায়। সেজন্য শ্যামার বীজ পাকার আগেই দমন

শ্যামা ও ক্ষুদে শ্যামার মধ্যে পার্থক্য

বিষয়	শ্যামা	ক্ষুদে শ্যামা
আকার	১. গাছের আকার বড়, ৬০ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার।	১. গাছের আকার ছোট, ১৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার।
শুঙ	২. ফুলে শুঙ আছে।	২. ফলে শুঙ নেই।
ধরন	৩. গাছ অনেকটা খাড়া।	৩. গাছ অনেকটা বিস্তৃত।
জলাবদ্ধতা	৪. জলাবদ্ধতা জমিতে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।	জলাবদ্ধতা জমিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
মঞ্জরি	মঞ্জরি আকারে বড়।	মঞ্জরি আকারে ছোট

৪। চাপড়া ঘাস

চাপড়া একটি মসৃণ বা কিছুটা লোমশ গুচ্ছযুক্ত ঘাস। ভূমিতে শায়িত থেকে খাড়া, ৩০ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার লম্বা এক বর্ষজীবী ঘাস। ধূসর বর্ণের কাণ্ড, পাশে চওড়া, মসৃণ বা ধার বরাবর কিছু লম্বা লোমযুক্ত। পাতার খোল ৬ থেকে ৯ সেন্টিমিটার লম্বা, পাশে চওড়া। এর উপরিভাগে কিছু ছড়ানো লোম আছে।

পুষ্পবিন্যাসের গোড়ার দিকে বহু শাখা–প্রশাখায় বিভক্ত থাকে। মাঝে মাঝে নিচের গিঁটগুলো থেকে শিকড় গজায়। আগার দিকে ৩ থেকে ৬টি ছড়া, ৪ থেকে ৮ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ৩ থেকে ৬ মিলিমিটার চওড়া হয়।

নিয়ন্ত্রণ :
১. আউশ ও চাপড়ার বীজ এক সাথে গজায়। সেজন্য আউশ ধানের বীজের সাথে চাপড়ার বীজ থাকলে তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বপন করা প্রয়োজন।
২. নিড়ানী বা কাচির সাহায্যে শিকড়সহ চারাগাছ ভালো করে তুলে দিলে পরবর্তী মৌসুমে চাপড়ার আক্রমণ কমে যায়।
৩. চাপড়া গাছ ফুল বা ফল আসার আগেই চাষ ও মই দিয়ে অথবা হাল্কা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে দমন করা যায়।

৫। ঝরাধান বা লালধান

ঝরা বা লালধানকে জংলি ধানও বলা হয়। এ ধান চাষাবাদযোগ্য ধানের মতোই। কিন্তু ধানগুলো পুরোপুরি পাকার আগেই ঝরে পড়ে এবং ছড়া খাড়া থাকে। পাকা ধানের খোসাগুলো খড়ের রঙ বা কালচে হয়। বীজগুলো মাটিতে বহুদিন সুপ্ত অবস্থায় থাকে, কিন্তু যদি চাষাবাদযোগ্য ধানের মতো কাটা ও ব্যবহার করা যায় তাহলে সুপ্ত অবস্থা ভেঙে দেয়া সম্ভব।

নিয়ন্ত্রণ : কোদলানো, নিড়ানো বা হাল চাষ দিয়ে ঝরা ধান দমন করা যায়।

ধানের চারা, শ্যামা ও মনা আগাছার মধ্যে পার্থক্য : চারা অবস্থায় ধান, শ্যামা ও মনা আগাছার *(Leptochloa chinenses)* সাদৃশ্য এতো বেশি যে ধানের জমিতে এদের সনাক্ত করা কষ্টকর। চারা ধান, শ্যামা ও মনা আগাছার মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এদের লিগিউল। লিগিউলের উপস্থিতি, অবস্থান, সংখ্যা ও বাহ্যিক অবয়বের ভিত্তিতে এদের পার্থক্য নিম্নরূপ :

১। শ্যামা আগাছার কোনো লিগ্যুল নেই।

২। ধানের চারার গোড়ায় ২টি বড় রোমমুক্ত লিগ্যুল রয়েছে।

৩। মনা আগাছার লিগ্যুল সরু ও মসৃণ।

৬। আরাইল (Arial) *Leerisa hexandra*

আরাইল প্রধানত খরিফ আগাছা। আউশ ও বোনা আমন ধানের জমিতে বেশি জন্মায়। জলাবদ্ধতা এদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। বাংলাদেশের ধানের নিচু জমিতে এই আগাছার প্রকোপ বেশি। এপ্রিল–মে মাসে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং জুলাই মাসের মধ্যে বীজ উৎপাদন করে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বার্ষিক আগাছা। কাণ্ড সরু ও দুর্বল। বয়স্ক গাছ প্রায় ৩ থেকে ৪ মিটার লম্বা হতে পারে। পর্বসন্ধি থেকে শিকড় বের হয়। গাছের বর্ণ হাল্কা সবুজ। পাতা সরু, রেখাকার, খোল খসখসে। অক্ষ (rachia) থেকে কিল মঞ্জরি বের হয়। শীষ ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার লম্বা, প্রশাখা সোজা। কীলক মঞ্জরি সোজা, ক্ষুদ্র, বিন্যাস ইম্ব্রিকেট, লোমশ মসৃণ। পুংকেশর ৬টি।

বংশবিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : বিশুদ্ধ বীজের ব্যবহার ও উত্তম জমি চাষ এই আগাছা দমনের প্রধান উপায়। বোনা আমন ধানের জমিতে বীজ বপনের পূর্ব সময় ব্যতীত অন্যান্য সময় আগাছা প্রয়োগ করার সুযোগ কম থাকে।

৭। জয়না

খাড়া, গুচ্ছভুক্ত, ২০ থেকে ৭০ সেন্টিমিটার লম্বা একবর্ষজীবী বিরুৎ। কাণ্ড নরম, গোড়ার দিকে চ্যাপটা এবং উপরে ৪ থেকে ৫টি শক্ত কোণা আছে। পুষ্পকাণ্ড ০.৫ থেকে ১.৫ মিলিমিটার মোটা। গোড়ার পাতাগুলো ৩৫ মিলিমিটার লম্বা। পাতার খোল মোটামুটিভাবে একে অপরের উপর অবস্থান করে। কাণ্ডের পাতাগুলোর ফলক খুবই ছোট।

পুষ্পবিন্যাস শিথিলভাবে ছড়ানো বাদামি বা খড় বর্ণের এবং ২.০ থেকে ২.৫ মিলিমিটার চওড়াবিশিষ্ট।

ফ্যাকাশে সাদা থেকে বাদামি বর্ণের ফল ত্রিকোণী এবং প্রত্যেক ধারে তিনটি শিরা রয়েছে। বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার করে।

নিয়ন্ত্রণ : ১। নিড়ানি বা কাঁচি দিয়ে চারাগাছ তুলে এটি দমন করা যায়।

২। বীজ পাকার আগেই দমন করলে বংশবিস্তার রোধ করা যায়।

৩। আগাছায় বীজ নেই এমন ধানের বীজ বপন করা দরকার।

৮। কলমিলতা

কলমিলতা একটি মসৃণ, ব্যাপকভাবে ছড়ানো বহুবর্ষজীবী লতা। এর কাণ্ডগুলো লতিয়ে চলে অথবা কখনো কখনো কাদার উপর কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকে, কিন্তু যখন পানিতে ভাসে তখন ফাঁপা নলের মতো। কলমিলতার গিঁট থেকে শিকড় গজায়। পাতাগুলো সরল ৭ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও প্রায় ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার চওড়া। সাদা থেকে ঘিয়ে বা বেগুনি বর্ণে মাত্র একটি ফুল পাতার গোড়ায় জন্মে এবং ফুলটি ৫ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা বোঁটাযুক্ত হয়। ফুল গোলাকার,

খোসা দিয়ে ঢাকা এবং প্রায় ১ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। এর দুটি কক্ষে চারটি বীজ থাকে। হাল্কা বাদামি বর্ণের বীজ খাটো, ঘন ও ধূসর বর্ণের লোমযুক্ত হয়। বীজ বা গাছ থেকে বংশবিস্তার হয়ে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ : ১। কলমিলতা দমনের জন্য সাধারণত হাত দিয়ে ছিঁড়ে বা কাঁচি দিয়ে কেটে গাছ তুলে ফেলা হয়।

২। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে কলমিলতা পরিষ্কারের সময় এর কাটা খণ্ড টুকরা যাতে জমিতে না পড়ে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

৩। বীজ পাকার আগেই কলমিলতা দমন করা উচিৎ।

৯। বড় আঙুলি ঘাস

খাড়া বা ছড়ানো গুচ্ছভুক্ত এক বর্ষজীবী ঘাস। এটি ০.৬ থেকে ১.২ মিটার লম্বা এবং দুটি লম্বা শুঙযুক্ত রেসিম ও শিরাযুক্ত কীলক মঞ্জরি রয়েছে। লোমযুক্ত গিটসহ কাণ্ডগুলো বেগুনি বর্ণের। পাতার ফলকগুলো সরল তলোয়ারাকৃতি, ১০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৫ থেকে ১৩ মিলিমিটার চওড়া। লোমশ কিনারাসহ সবুজ বা বেগুনি রঙের পাতার খোল ঢিলা থাকে।
পুষ্পবিন্যাস ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার লম্বা। শুঙগুলো ১.৫ থেকে ২.৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং গোড়ার দিকে কোঁকড়ানো।

ফল লালচে বাদামি বর্ণের কেরিওপসিস, আয়তন তলোয়ারাকৃতি, বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার করে।

নিয়ন্ত্রণ : ১। কাঁচি বা নিড়ানি দিয়ে উপড়িয়ে এ ঘাস দমন করা যায়।

২। বীজ পাকার আগেই দমন করতে পারলে এর বংশবিস্তার রোধ করা যায়।

৩। আগাছার বীজশূন্য উন্নত জাতের ধানের বীজ ব্যবহার করেও এর দমন করা যায়।

১০। ক্ষুদে আঙুলি ঘাস

এটি ২০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ভূমিতে শায়িত একবর্ষী বা অল্প জীবনকালের বহুবর্ষী আগাছা। এটি মুক্তভাবে শাখা-প্রশাখা উৎপাদন করে এবং নিচের গিরা থেকে শিকড় ছাড়ে। পাতার খোল সাধারণত লোমযুক্ত। পাতার ফলকগুলো চওড়া ও সরল, ৫ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা। পাতাগুলো লোমবিহীন এবং অমসৃণ কিনারা ঢেউ খেলানো। ছড়াগুলো প্রায়ই মাঝের বোঁটার উপরের চারদিকে চক্রাকারে অবস্থান করে। ফল বিভিন্ন প্রকার ডিম্বাকৃতির ক্যারিওপসিস। বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার হয়ে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ : ১। নিড়ানি, কোদাল, হাল্কা লাঙাল ও আঁচড়া দিয়ে চারা অবস্থায় আঙুলী ঘাস দমন করা সহজ।

২। গাছ বড় হয়ে গেলেও ফুল আসা বা ফল পাকার আগেই তুলে ফেলা উচিত।

চাপড়া ও আঙুলি ঘাসে পার্থক্য

চাপড়া	আঙুলি ঘাস
১. কাণ্ড চ্যাপ্টা	১. কাণ্ড প্রায় গোলাকার
২. পাতার কাণ্ডাবরক ঢিলা	২. পাতার কাণ্ডাবরক আটসাট

৩. মঞ্জরিতে ৩ থেকে ৫টি ফুল, ফুল ৩ সেন্টিমিটার	৩. কীলক মঞ্জরি ১ ফুলবিশিষ্ট, ফুল ৫ সেন্টিমিটার
৪. বীজ হলদে	৪. বীজ লালচে বাদামি
৫. গাছ ও কাণ্ড তুলনামূলকভাবে ঘন সন্নিবিষ্ট	৫. গাছ ও কাণ্ড হাল্কা সরু ও কিছুটা লতানো

গিটলা ঘাস দেখতে অনেকটা দুর্বার অনুরূপ, তবে আকারে একটু বড়, স্যাঁতস্যাতে বা জলাবদ্ধ স্থানেও জন্মাতে পারে। কোদলানো, হাতে তুলা ও লাঙ্গল চাষ দিয়ে এই আগাছা দমন করা যায়।

বড় আঙুলি ঘাস	ক্ষুদে আঙুলি ঘাস
১. কাণ্ড : ২০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার লম্বা	১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা
১. পাতা : ফলক লম্বায় ৫ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার, প্রস্থে ৪ থেকে ১০ সেন্টিমিটার ফলক ও কাণ্ডাবরক রোমহীন	ফলক লম্বায় ৪ থেকে ১০ সেন্টিমিটার, প্রস্থে ২ থেকে ৬ সেন্টিমিটার, ফলক ও কাণ্ডাবরক রোমযুক্ত
৩. ফুল : প্রায় ৩ সেন্টিমিটার লম্বা, দ্বিতীয় গুম্ম কিলক মঞ্জরির (spikelet) সমান, কিল মঞ্জরি (spike) শীর্ষের কাছাকাছি থেকে উৎপাদিত	ফুল প্রায় ২ সেন্টিমিটার লম্বা, দ্বিতীয় গুম্ম কিলক মঞ্জরির অর্ধেক, কিল মঞ্জরি শীর্ষ থেকে উৎপাদিত

১১। বড়চুঁচা

এটি মসৃণ, গুচ্ছযুক্ত, ত্রিকোণাকৃতির কাণ্ডবিশিষ্ট, ২০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার লম্বা একবর্ষজীবী বিরুৎ, সেজজাতীয় আগাছা। শিকড়গুলো হলদে লাল এবং আঁশযুক্ত। পাতার খোল পাতলা এবং কাণ্ডের গোড়ার দিকে আবৃত রাখে। পাতার ফলক সোজা তলোয়ারের মতো, পুষ্পকাণ্ড থেকে খাটো এবং প্রায় ৫ মিলিমিটার চওড়া।

হলদে-বাদামি রঙের ফল একিনজাতীয়, ডিম্বাকৃতি ত্রিকোণাকার এবং ১.০ থেকে ১.৫ মিলিমিটার লম্বা। বংশবিস্তার বীজের মাধ্যমে হয়ে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ : ১। বড়চুঁচা দমনের নিয়মাবলী মোটামুটি হলদে মুথার মতোই, যেমন- প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, কৃত্রিম জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ করা ইত্যাদি।

২। অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যার মধ্যে উচু জমিতে হাল্কা লাঙল ও আঁচড়া দিয়ে মাটি আলোড়িত করেও এ আগাছা দমন করা যায়। এছাড়া কাণ্ডসহ হাত বা নিড়ানি দিয়ে তুলেও দমন করা হয়।

৩। বীজ পাকার আগেই আগাছা দমন করা উচিৎ।

১২। ভেদাইল

ভেদাইলা একটি খাড়া, মূল ভূগর্ভস্থ কাণ্ড (রাইজোম), কন্দে (টিউবার) রূপান্তরিত এবং ২০ সেন্টিমিটার উঁচু বহুবর্ষজীবী বিরুৎ (সেজজাতীয়)। গোড়ার স্ফীত কন্দসহ কাণ্ডগুলো খাড়া, শাখাবিহীন, মসৃণ ও ত্রিকোণাকৃতি। মূল শায়িত কাণ্ড ছড়ানো, লম্বাটে, সাদা এবং শাঁসালো। কচি অবস্থায় সেগুলো পাতলা খোসা দিয়ে আবৃত থাকে এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে আঁশযুক্ত হয়। পাতা ঘন সবুজ, সোজা ও কিছুটা মোড়ানো, ৫ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৫ মিলিমিটার চওড়া।

পুষ্পবিন্যাস সরল বা যৌগিক আম্বেল (ছাতাকৃতি) যার বিপরীত দিকে ২ থেকে ৪টি মঞ্জরিপত্র রয়েছে। লালচে-বাদামি রঙের ফলের কীলক মঞ্জরি আম্বেলের শেষ প্রান্তে সাজানো থাকে। ১০ থেকে ৪০টি লালচে-বাদামি রঙের ফল একের পর এক ঘনভাবে সাজানো থাকে। বাইরের থোকাগুলো ৩ থেকে ৪ মিলিমিটার লম্বা ও এদের অগ্রভাগ ভোঁতা হয়।

ফল ডিম্বাকৃতি ১.৫ মিলিমিটার লম্বা। পাকা ফলের রঙ কালো। ভূমিজ কাণ্ড, কন্দ ও বীজ দিয়ে বংশবিস্তার হয়।

নিয়ন্ত্রণ : ১। কৃত্রিম জলাবদ্ধতা সৃষ্টি ও একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ।
২। হাল্কা লাঙল ও আঁচড়া দিয়ে এবং মূল কন্দসহ সম্পূর্ণ গাছ হাত, নিড়ানি বা খুরপির সাহায্যে উপড়িয়ে ফেলা।

১৩। হলদে মুথা

এটি একটি ২০ থেকে ৭০ সেন্টিমিটার লম্বা, মসৃণ, ঘন গুচ্ছযুক্ত এবং এক বর্ষজীবী বিরুৎ, সেজজাতীয় আগাছা। কাণ্ড মসৃণ, উপরের দিকে ত্রিকোণাকার। পাতার খোল নলের মতো এবং গোড়ার দিকে যুক্ত থাকে। নিচের দিকের খোলগুলো খড় থেকে বাদামি রঙের হয়। গোড়ার দিকে ৩ থেকে ৪টি পাতা, ১০ সেন্টিমিটার থেকে ৪০ সেন্টিমিটার লম্বা।

পুষ্পবিন্যাস ঘন, গোলাকার সরল বা যৌগিক আম্বেলজাতীয় (ছাতাকৃতি) যা ৫ সেন্টিমিটার থেকে ১৫ মিলিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট। গুচ্ছগুলো ১০ থেকে ৩০টি ফুল সম্বলিত ২ থেকে ৫ মিলিমিটার লম্বা ও ১.০ থেকে ১.৫ মিলিমিটার চওড়া সবুজ রঙের রৈখিক বা চক্র কীলক মঞ্জরি দিয়ে গঠিত।

ফল ০.৬ মিলিমিটার লম্বা ও কিছুটা চ্যাপ্টা বৃত্তাকার থেকে ডিম্বাকৃতি বাদামি রঙের 'একিন'। বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার হয়ে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ : ১. জৈবসার ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির সাথে আগাছার বংশ বিস্তারে সক্ষম বীজ ও কন্দ যেনো মিশে বা লেগে না থাকে সেদিকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ।
২. আগাছা পরিষ্কারের সময় কন্দসহ হাত, নিড়ানি বা কাঁচি দিয়ে তুলে হলদে মুথা দমন করা যায়।
৩. কৃত্রিম জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করে এ আগাছা দমন করা যায়।
৪. একই জমিতে বিভিন্ন জাতের ফসল পর্যায়ক্রমে উৎপন্ন করেও এ আগাছা দমন করা যায়।
৫. বীজ পাকার আগেই এ আগাছা তুলে ফেলা উচিত।

গাইচা ও গিটলা ঘাসের পার্থক্য

গাইচা	গিটলা ঘাস
১. পত্র ফলকের নিচের অংশ ও কাণ্ডাবরক পত্রমূল রোমযুক্ত	১. মসৃণ
২. পাতার আকার ১০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার, গাছ লম্বাটে বড়	২. পাতার আকার ৫ থেকে ১২ সেন্টিমিটার, গাছ তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রাকার
৩. নিম্ন পুষ্প বর্মপত্রিকা স্থূল	৩. নিম্ন পুষ্প বর্মপত্রিকা পাতলা
৪. অনিয়ম মঞ্জরি (Raceme) প্রধানত ৩টি, একটি শীর্ষীয়	৪. অনিয়ম মঞ্জরি ২টি, উভয়ই জোড়া অনুরূপ শীর্ষীয়

১৪। শিয়াললেজা

সবুজ শিয়াললেজা (Green Foxtail) *Setaria viridis*

সাধারণত মে–জুন মাসে বীজ উৎপাদিত হয়ে সেপ্টেম্বর–অক্টোবর মাসে পরিপক্ব বীজ উৎপন্ন করে। আউশ ধান, পাট, মধ্য–নিম্ন জমি, বাড়ি ও রাস্তার আনাচে–কানাচে এগুলো জন্মে থাকে। তবে আউশ ধানের জমিতেই এদের প্রকোপ বেশি।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : সরল বা শাখান্বিত বার্ষিক ঘাস বিশেষ। উচ্চতা ৬০ সেন্টিমিটার হতে পারে। কাণ্ডাবরক পত্রমূল ও পত্রফলক মসৃণ। পত্রফলক সরু।

লম্বায় প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার, কিল মঞ্জরি সাধারণত ৫ থেকে ৭ সেন্টিমিটার।

দমন পদ্ধতি : হাতে তুলে ও লাঙল চাষ দিয়ে দমন করা যায়। হলুদ ও সবুজ শিয়াললেজা গাছের মধ্যে প্রচুর মিল রয়েছে। তবে হলুদ শিয়াললেজা গাছ, মঞ্জরি, ফুল ও বীজ সবুজ শিয়াললেজা গাছের চেয়ে বড়।

বংশবিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

নিকটতম সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য আগাছা—

Setaria faberil viridis-এর চেয়ে গাছ আকারে বড়, পাতার উপরিভাগ রোগমুক্ত।

Setaria italica S. viridis-এর চেয়ে গাছ আকারে বড়, ফলক উপাঙ্গের বর্ণ পাটল।

হলুদ শিয়াললেজা (Yellow Foxtail) *Setaria glauca*

আউশ ও পাটের জমিতে বেশি জন্মাতে দেখা যায়। তবে আউশের জমিতে বেশি। এপ্রিল থেকে মে মাসে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বীজ উৎপাদন করে।

উদ্ভিদ বৈশিষ্ট্য : বর্ষজীবী বিরুৎ। কাণ্ড সাধারণত খাড়া, শাখান্বিত পাতা রেখাকার। অক্ষে কীলক মঞ্জরি সাজানো, এক ফুলবিশিষ্ট। কীলক মঞ্জরি সাধারণত ৫টি। প্রথম বর্ষপত্র ৩ শিরা বিশিষ্ট, দ্বিতীয়টি ৫ শিরাবিশিষ্ট। পুষ্প বর্ষপত্রিকা ডিম্বাকৃতি, বর্ণ হলদে বাদামি।

দমন পদ্ধতি : হাতে তুলে ও নিড়ানি দিয়ে এই আগাছা দমন করা যায়।

বংশবিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

১৫। **চেলা ঘাস** (Sea hard grass) *Farapholis strigosa*

আউশ ও পাটের জমিতে এই আগাছা ভালো জন্মায়। মার্চ–এপ্রিল মাসে বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং জুলাই মাসের মধ্যে পুনরায় পরিপক্ব বীজ উৎপাদন করে। লবণাক্ত এলাকায় এই আগাছার প্রকোপ খুবই বেশি।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বর্ষজীবী বিরুৎ। বিটপ চাবুকের ন্যায় বাঁকানো, মাটিতে গড়ানো গোছাকার। কীলক মঞ্জরি সরু দৃঢ়। এক ফুলবিশিষ্ট। কীলক মঞ্জরির অক্ষের ভিতরে বসানো, তাই বাইরে থেকে সহজে মঞ্জরি বোঝা যায় না। কীলক মঞ্জরি ৬ থেকে ৭ মিলিমিটার লম্বা, একান্তর ও গোড়ার দিকে মোটা। কাণ্ডাবরক কাণ্ডের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়ানো, লিগ্যুল পাতলা মঞ্জরি ৮ থেকে ১২ সেন্টিমিটার লম্বা। পুংকেশর ৩টি পাতা কেবল উৎপত্তির সময় চ্যাপ্টা, কিন্তু পরে অউল আকার (Awl shaped) ধারণ করে।

বংশবিস্তার : বীজ ও গোড়ার মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : কোদলানো, জমি চাষ, নিড়ানি ও হাতে বাছাই।

১৬। **দূর্বা** (Bermuda grass) *Cynodon dactylon*

এপ্রিল থেকে জুলাই মাসের মধ্যে ফুল উৎপাদিত ও বীজ পরিপক্ব হয়। মাঝারি থেকে উঁচু জমির প্রায় সব স্থানে এবং রবি ও খরিপ উভয় ঋতুতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জন্মাতে দেখা যায়। রবি ফসলের মধ্যে শাকসবজি প্রধান। খরিপ ঋতুতে শাকসবজি, আউস ও পাটের জমিতে দূর্বা জন্মায়।

অনুর্বর মাটি বালি স্তূপ, দৃঢ় মাটি সম্পন্ন রাস্তা, আঙিনা ইত্যাদি সব স্থানেই দূর্বা দেখা যায়। অরণ্যাবৃত মাটিতে দূর্বা কম জন্মে। দূর্বা জলাবদ্ধা সহ্য করতে পারে না, তবে খরা সহ্য করতে পারে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বহুবর্ষী বিরুৎ। কাণ্ড শায়িত, বহু শাখান্বিত, পর্ব গুচ্ছ মূলযুক্ত, চ্যাপ্টা, রোমহীন। পাতা রেখাকার, পত্রমূল হাল্কা সবুজ, পত্রমূল অল্প রোমযুক্ত। পুষ্পধারী কাণ্ড খাড়া পুষ্পমঞ্জরি অঙুলিবৎ, শাখান্বিত। আঙুলের সংখ্যা ৩ থেকে ৫টি। স্পাইকলেট একক ফুল বিশিষ্ট, লিগিউল সাদা আংটির মতো রোমযুক্ত। পুষ্প স্পাইকের উপরে দুই সারিতে বিন্যস্ত।

বংশবিস্তার : ধাবক, মূল কন্দ ও বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : দমনের জন্য নিড়ানি, কোদলানো, লাঙল চাষ ইত্যাদি অধিক প্রযোজ্য। দীর্ঘদিন ব্যাপী জলাবদ্ধতা ব্যতিত দূরিকরণ খুবই কঠিন। আজকাল উপযুক্ত আগাছানাশক প্রয়োগে দমন সহজতর হয়েছে। দুর্বা দমনের জন্য কি প্রকার আগাছানাশক ব্যবহার করা হয় তা জমির ফসল, ফসলের প্রকার ও বয়সের উপর নির্ভর করে।

১৭। **পানিকচু (নখা)**

পানিকচু বা নখা একটি এক বর্ষজীবী, আধাজলজ ৪০ থেকে ৫০ সেন্টিমিটার লম্বা এবং চওড়া পাতাবিশিষ্ট আগাছা। এই একবীজপত্রী আগাছার খাটো, মাংসল কাণ্ড এবং খুবই ছোট শিকড় রয়েছে। পাতাগুলো উজ্জ্বল গাঢ় সবুজ। গোলাকৃতি গোড়ার দিক ১০ থেকে ১৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ৩.৫ সেন্টিমিটার চওড়া। বোঁটাগুলো ১০ থেকে ১২ সেন্টিমিটার লম্বা, নরম, ফাঁপা।

পুষ্পবিন্যাস ৩ থেকে ৬ সেন্টিমিটার লম্বা। এতে কয়েকটি নীল বর্ণের প্রায় ১ সেন্টিমিটার লম্বা ফুল থাকে।

খোসা ঢাকা ফল প্রায় ১ সেন্টিমিটার লম্বা এবং তিন ভাগে বিভক্ত। বীজগুলো আয়তাকার এবং প্রায় ১ মিলিমিটার লম্বা। বীজ দিয়ে বংশবিস্তার করে থাকে।

নিয়ন্ত্রণ : ১। হাত দিয়ে তুলে বা হাল চাষ করে পানিকচু দমন করা যায়।
২। বীজ পাকার আগেই আগাছা দমন করলে বংশবিস্তার রোধ করা যায়।

১৮। লেপ্টোক্লোয়া (Leptochloa)

জলজ বা আধাজলজ একবর্ষ বা স্বল্পজীবী ৩০ সেন্টিমিটার থেকে ১.০ মিটার উঁচু ঘাস। শাখাযুক্ত গোড়া থেকে বেরিয়ে আসে। পাতা ও ছড়াগুলো কখনো কখনো লালচে থেকে বেগুনি বর্ণের হয়। পাতার ফলক চওড়া এবং আগার দিকে সূঁচালো, সরল, ১০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার লম্বা। লিগ্যুল ১ থেকে ২ মিলিমিটার লম্বা। পুষ্পবিন্যাস ১০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার লম্বা হয়। মঞ্জরি ধূসর সবুজ বা লাল বর্ণের হয়ে থাকে।

ফুল প্রায় ০.৮ মিলিমিটার লম্বা গোলাকৃতির ক্যারিওপসিস। বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার করে।

নিয়ন্ত্রণ : ১। গাছে ফুল বা ফল আসার আগেই চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।
২। বীজ পাকার আগেই দমন করতে পারলে বংশবিস্তার রোধ সম্ভব হয়।

১৯। চিচড়া (Chechra) *Scirpus mucronatus*

খরিফ ও রবি ঋতুতেই এ আগাছা জন্মায়। খরিপ ঋতুতে আউশ ধান ও পাটের জমিতে এদের প্রকোপ বেশি দেখা যায়। রবি ঋতুতে বোরো ধানেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোপা আমনের জমিতে এই আগাছা দেখা যেতে পারে। চিচড়া জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসে এই আগাছায় ফুল আসে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বহুবর্ষী বিরুৎ, কাণ্ড খাড়া, মসৃণ, শক্ত ও ত্রিকোণাকার। পাতা গোড়ায় প্রশাখাযুক্ত। কীলক মঞ্জরি বহু ফুলবিশিষ্ট। বীজ একিন (achene), বর্ণ ময়লা হলদে।

বংশবিস্তার : বীজ ও মোথার মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : এই আগাছা দমন করা বেশ কঠিন। গভীর লাঙল চাষ, মই এবং তারপর উপযুক্ত নিড়ানি দিয়ে এই আগাছা দমন করা যায়। জলাবদ্ধ পতিত জমিতে এই আগাছা বেশি জন্মাতে দেখা যায়।

নিকটবর্তী সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য আগাছা—
Scirpus actus, Scirpus atrovirens

২০। বিষকাটালি (Marshpepper smartweed) *Polygomum hydropiper)*

প্রায় সব ঋতুতে এই আগাছা দেখা যায়। এপ্রিল–মে মাসে ফুল আসে এবং জুন–জুলাই মাসে পরিপক্ব হয়। বাড়ির আঙিনা, অগভীর খাল–নালার পাড়, এমনকি তলদেশ ও রাস্তা পার্শ্ব স্থানে

এই আগাছার প্রকোপ বেশি। মাঠ বা কৃষি জমিতে এদের সরাসরি প্রকোপ কম। বাড়ির আশেপাশে জন্মালে এটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : একবর্ষী বিরুৎ, ৩০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার উঁচু। পাতা মসৃণ, ২ থেকে ১০ সেন্টিমিটার লম্বা, শীর্ষে স্পাইকবিশিষ্ট ফুল। শীর্ষ ২ থেকে ৭ সেন্টিমিটার লম্বা, ফুলের বর্ণ হলদে সবুজ, বৃত্যাংশ ৪টি। ফলের বর্ণ পাটল কালো, ১ সেন্টিমিটার প্রস্থ। গাছের গোড়া কিছুটা লালচে বর্ণের।

বংশবিস্তার : বীজের মাধ্যমে বিষকাটালি বংশবিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : হাতে টেনে তোলা বিষকাটালি দমনের প্রধান পদ্ধতি।

বিষকাটালির অন্যান্য প্রজাতি

Polygonum scandus, গাছ লতানো, বীজ কালো।

Polygonum cunvolvulus, গাছ লাতানো, বীজ ধূসর কালো।

Polygonum orientale, গাছ খাড়া, পাতা প্রশস্ত।

Polygonum erectum, গাছ খাড়া, কমলা ফুল।

২১। শোলা (Shola) *Aeschynomene aspera* ও লজ্জাবতী

নিম্ন জলাভূমি, বোনা আমন ও নিম্ন রোপা আমন জমি, বিল, ঝিল, ডোবা ইত্যাদিতে প্রচুর শোলা গাছ জন্মে। মার্চ–এপ্রিল মাস থেকেই বীজের অঙ্কুরোদগম শুরু হয়। সেপ্টেম্বর–অক্টোবর মাসে বীজ পরিপক্ব হয়। জলাবদ্ধ জমিতে এই আগাছা নাইট্রোজেন সংযোজনের মাধ্যমে মাটিতে উর্বরতাও কিছুটা বৃদ্ধি করে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : একবর্ষী খরিফ গুল্ম। পাতা অড পিন্নেট, প্রপত্র ঘন সন্নিবিষ্ট সোজা। ফুল আক্ষিক, কিছুসংখ্যক শীর্ষীয় হতে পারে। বৃত্তাংশ ৫টি। কিল ডিম্বাকার। পরাগধানী ১০টি, ৫টি করে ২টি গুচ্ছে বিদ্যমান থাকে। পড ২ থেকে ৮টি, চ্যাপ্টা খোপযুক্ত প্রতি খোপে ১টি বীজ থাকে। গাছের পাতা বাহ্যিক স্পর্শে সামান্য সংকুচিত হয়।

কাণ্ড শক্ত, ঈষৎ শাখান্বিত, ফলবৃন্ত ভিস্কিড (viscid) নয়, বৃতি ও বৃহদাকার দলমণ্ডল দৃঢ় রোমযুক্ত, পড একিনুলেট। গাছের তুলনায় শিকড় অনেক লম্বা। শিকড়ে প্রচুর ক্ষুদ্রাকার নডিউল বা বায়বীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী গুঁটি রয়েছে।

বংশবিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : এই আগাছা দমনের জন্য হাতে টেনে তোলা সর্বোত্তম।

সম্পর্কিত আগাছা

ভাতশোলা *Aeschynomene indica* কাণ্ড নরম, বহুল শাখান্বিত।

লজ্জাবতী (Sensitive plant) *Mimosa pudica*

চাষহীন ও চাষকৃত পতিত জমিতে এই আগাছা বেশি জন্মাতে দেখা যায়। জানুয়ারি–ফেব্রুয়ারি মাসে এর বীজ অঙ্কুরিত হয়, মে–জুন মাসে ফুল আসে, জুলাই–আগস্ট মাসে বীজ পরিপক্ব হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বার্ষিক, কাণ্ড কিছুটা লতানো, দ্ব্যগ্র শাখান্বিত কাটাযুক্ত। পাতা পক্ষল যৌগ। প্রপত্র সরু, লম্বাটে, সংখ্যায় ৫ থেকে ২০ জোড়া, হাতের স্পর্শে সঙ্কুচিত হয়।

উপপত্র কাঁটায় রূপান্তরিত হয়। বর্ণ ঈষৎ লালচে। ফুল উভয়লিঙ্গ, বৃত্তাংশ ৪টি, দল বা পাপড়ি ৪টি, বর্ণ গোলাপ, ফল পড়, দেখতে চ্যাপ্টা ও সন্ধিযুক্ত।

বংশবিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : কোদলানো, লাঙল চাষ ও আগাছানাশক দিয়ে দমন করা যায়।

২২। হেলেন্চা (Water Primerose) *Jussiaea repens*

গ্রীষ্মের শেষে এই আগাছা দেখা যায়। বর্ষা শেষে ফুল আসে নিম্ন জমির আমন ধানের ক্ষেতে এই আগাছাকে সাধারণত জন্মাতে দেখা যায়। এ ছাড়াও জলাভূমি, বাড়ি ও রাস্তা পার্শ্ব খাদে এই আগাছা বেশি জন্মায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বর্ষজীবী, জলজ বিরুৎ। কাণ্ড ব্রততি (creeping) লম্বা। ভাসমান মূল স্ফীত ও স্পঞ্জি। পাতা ডিম্বাকার, একান্তর, গাঢ় সবুজ, নতুন পাতা শাখার অগ্রভাবে পেয়ালার মতো গঠন করে। ফুল একক, সাদা, বৃত্যাংশ ৫টি সবুজ, দল ৫টি সাদা। ফল অধিক বীজযুক্ত। ভাসমান কাণ্ড এবং বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করতে পারে।

দমন পদ্ধতি : প্রধানত হাতে বাছাই।

২৩। কানাই : কানাইবাঁশি (Day flower or spiderwort) *Commelina benghalensis*

উষ্ণ ও অবউষ্ণ অঞ্চলে নিম্ন জমিতে কানাই বাঁশিকে বহুবর্ষী, কিন্তু অধিকতর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বর্ষজীবী আগাছা হিসেবে জন্মাতে দেখা যায়। কানাইবাঁশির শিকড়ে অনেক সময় নানা প্রকার ক্ষতিকার ক্রিমি আশ্রয় নিতে দেখা যায়। এই আগাছা যথেষ্ট খরা সহ্যশীল।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বহু বর্ষজীবী, সরস। কাণ্ড ব্রততি শাখান্বিত, পর্বে মূল সৃষ্টি হয়, পাতা একান্তরে, সরল সমান্তরাল শিরা বিন্যাস, ডিম্বাকার। কাণ্ড পত্রখোলা দ্বারা আবৃত। শাখার অগ্রভাগে ১ থেকে ৩টি ফুল থাকে। বৃত্যাংশ ৩টি, পাপড়ি ৩টি, পুংদণ্ড ৬টি, ফল ক্যাপস্যুল বীজ অনেক।

বংশবিস্তার : ভূ-নিম্নস্থ ফুল এবং বীজ দিয়ে বংশবিস্তার করে। এই আগাছা বীজ এবং পর্ব সন্ধিতে শিকড় সম্পন্ন লতানো কাণ্ডাংশ দিয়ে বংশবিস্তার করতে পারে। কানাইবাঁশির একটি গাছে এক মৌসুমে প্রায় ১ হাজার বীজ উৎপন্ন হতে পারে। বীজ বায়বীয় ফুল এবং ভূ-নিম্নস্থ খর্বধাবকে (stolon) উৎপাদিত হতে পারে। বায়বীয় ফুলের চেয়ে খর্বধাবকের বীজ আকারে বড়। এ বীজ বেশ কিছুদিন ব্যাপী সুপ্তভাবে মাটিতে অবস্থান করতে পারে।

দমন পদ্ধতি : কানাইবাঁশি দমনের জন্য বেনটাজন খুবই কার্যকর। এশিয়া ও আফ্রিকার ২৫টি প্রধান ফসলের জন্য এই আগাছা খুবই ক্ষতিকর।

নিকটতম সম্পর্কযুক্ত আগাছা—

C.ommelina commonusis
C.ommelina virginica

কানাইনালা (Kanai nala) *Cynotis axillaris*

বাংলাদেশে রবি ও খরিপ উভয় মৌসুমে এই আগাছা জন্মাতে দেখা যায়। খরিপ ঋতুতে আউশ ধান ও পাটের জমিতে, রবি ঋতুতে আমন জমিতে কানাই নালা জন্মাতে দেখা যায়। সাধারণত

জমিতে মার্চ–এপ্রিল মাসে এই আগাছার আবির্ভাব ঘটে এবং এপ্রিল–মে মাসে ফুল ও আগস্ট–সেপ্টেম্বর মাসে বীজ পরিপক্ব হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বর্ষজীবী বিরুৎ। কাণ্ড লতানো, তাজা, নরম, লতানো। পর্বসন্ধিতে বহুল প্রশাখা বিভক্ত। নিচের দিকে পর্বগুলো মূল্যায়িত। পাতা রেখাকার, সরল, একান্তর কাণ্ডারবক পত্রমূল আছে। পুষ্পবিন্যাস শুণ্ডাকার নিয়ত। ফুলের বর্ণ নীল, উভয় লিঙ্গ, নিয়মিত, বৃত্তাংশ ৩টি, যুক্তবৃত্তি, পাপড়ি ৩টি মুক্ত দল।

দমন পদ্ধতি : হাতে তোলা, কোদলানোসহ রাসায়নিক আগাছানাশক প্রয়োগ করেও এই আগাছা দমন করা যায়।

২৪। পানা : ক্ষুদিপানা (Duckweed) *Lemna polyrrhiza*

বাংলাদেশের নিম্ন জলাভূমি, বোনা ও রোপা আমন ধানের জমি, ঝিল, বিল, ডোবা ইত্যাদিতে প্রচুর ক্ষুদি পানা জন্মায়। মাটির উপর আস্তর সৃষ্টির করে। ফুল একলিঙ্গ, পরাগধানী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি। শিকড় শাখান্বিত (rootlets) পাতা প্রশস্ত–গোলাকার শিরাযুক্ত।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বহুবর্ষী বিরুৎ। শিকড় নেই বা থাকলে খুবই সংকুচিত, রাইযয়েড আকার। সমগ্র গাছটি একটি ক্ষুদ্র গোলাকার পাতাবিশিষ্ট। পাতার নিচের অংশ অনেক সময় লালচে হয়।

বংশবিস্তার : প্রধান কুঁড়ির সাহায্যে অঙ্গজভাবে বংশবিস্তার করে। বীজের মাধ্যমেও বংশবিস্তার করতে পারে। মে–জুন মাসে বৃষ্টিপাত শুরু ও পানি চলাচল শুরু হওয়ার সাথে সাথে এদের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং শীতকাল পর্যন্ত এদের বংশবৃদ্ধি চলতে থাকে।

দমন পদ্ধতি : ক্ষুদি পানা দমনের জন্য হাতে তোলা পদ্ধতিই উত্তম। তবে একই জমি থেকে সাপ্তাহান্তর কয়েকবার এই পানা পরিষ্কার করতে হয় এবং বাইরে থেকে যাতে পুনরায় প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে যত্নবান হতে হয়।

সম্পর্কযুক্ত আগাছা—

Lamna minor
Lamna trisulca L. শিকড় একক শাখাহীন, পাতার প্রান্ত দন্তর।

২৫। কচুরিপানা (Water hyacinth) *Eichhorina crassipes*

ফসলের মধ্যে বোনা আমন ধানে কচুরিপানা সবচেয়ে বেশি অবস্থান করে। নতুন পানির সাথে বোনা আমন ধানের জমিতে একবার কচুরিপানা ঢুকে। পাটের নিচু জমিতে জলী ও আউশের জমিতে পানি উঠলে সেখানেও কচুরিপানা অবস্থান করে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : ফুলের বর্ণ নীল, দেখতে ফানেলের মতো, ফুল উভয়লিঙ্গ, পরাগধানী সাধারণত ৬, অসমান, দ্বিখণ্ডিত (2-celled)। শিকড় আঁশযুক্ত গুচ্ছ। পাতার বোঁটা স্ফীত। পাতার ফলক কিডনির মতো বা গোলাকার

বংশবিস্তার : কচুরিপানা প্রধানত অফসটের (offsoot) মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। এদের বৃদ্ধি এতোই দ্রুত যে একটি মূল গাছ এক মৌসুমে কয়েক হাজার গাছ উৎপাদন করতে পারে।

কোনো কোনো সময় বীজের মাধ্যমেও বংশবিস্তার করে। শীতকালে কচুরিপানার বৃদ্ধিহার কিছুটা কম। তখন সামান্য পানিতে বা ভিজা জমিতে কচুরিপানা অবস্থান করতে পারে।

দমন পদ্ধতি : কচুরিপানা নিয়ন্ত্রণের জন্য বেশ কতকগুলো পদ্ধতি একক ও যৌথভাবে সম্পাদন করতে হয়। নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে হাতে তোলা জমি থেকে সরিয়ে দেয়া ও রাসায়নিক আগাছানাশক ব্যবহার করা। কচুরিপানা হাতে তোলার সময় লক্ষ্য রাখতে হয় যেনো পানি সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ ও দূরিকরণ করা হয় বা কমপোস্ট তৈরি করা হয়।

কচুরিপানা দূরিকরণ করতে হয় একই এলাকা থেকে সংলগ্ন সব জমির কচুরি পরিষ্কার করতে হয়। জমির নিকটবর্তী বিল-হাওড়-নদী-নালা থেকে যেনো নতুন কচুরি জমিতে প্রবেশ করতে না পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়।

বর্তমানের ব্যবহৃত রাসায়নিক আগাছানাশকের মধ্যে ২ থেকে ৪ডি (D) বেশ কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে। এক একর আক্রান্ত জমিতে ব্যবহারের জন্য ২ সের পরিমাণ ২ থেকে ৪ডি বা এমসিপি (মূল বস্তু) প্রয়োগ করতে হয়। বর্তমানে কচুরিপানা বিনষ্টের জন্য নানা প্রকার ভক্ষক কীট-পতঙ্গ ও রোগ জীবাণু ছড়ানোর পদ্ধতি চালু হচ্ছে।

সম্পর্কযুক্ত আগাছা-

Pontederia cordata-- গাছ লম্বাটে।

দশম অধ্যায়

ধানের পোকা দমন

ধান চাষ করে উচ্চ ফলন পেতে হলে চারা অবস্থা থেকে পাকা ও রোগ দমনের ব্যবস্থা করতে হয়। ধান পাকার সঠিক সময়ে তা কাটতে হয় এবং প্রক্রিয়াকরণ করতে হয়। এ অধ্যায়ে ধানের পোকা ও রোগ দমন এবং ধান কাটা বিষয়ে আলোচনা করা হলো। গ্রন্থের শেষাংশে ক্ষতিকর পোকা সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র সংযোজন করা হয়েছে।

১। পোকার প্রকরণ ও দমন পদ্ধতি

ধানের ফসল বহু ধরনের পোকার সাহায্যে আক্রান্ত হয়। এসব পোকার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পোকাগুলো হচ্ছে —

১. চারা ও বাড়ন্ত পর্যায়ে : মাজরা পোকা , গল মাছি, পামরী পোকা
২. থোড় পর্যায়ে : গান্ধী পোকা, ফড়িং ও গাছফড়িং
৩. পরিপক্ব পর্যায়ে : শীষ কাটা লেদাপোকা

ধানের জমিতে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে :

১. পোকা আক্রমণ প্রতিরোধ জাতের চাষ যেমন– চান্দিনা ও ব্রিশাইল জাতের ধানে মাজরা পোকার আক্রমণ কম হয়।
২. সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ
৩. জমি আগাছা মুক্ত রাখা

ধানের পোকার যান্ত্রিক দমন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে :

১. আলোর ফাঁদ দিয়ে মথ বিনষ্ট করা, যেমন– মাজরা পোকা দমন;
২. পাতার অগ্রভাগ কাটা, যেমন– পামরী পোকা দমন;
৩. জাল দিয়ে পোকা সংগ্রহ, যেমন– পামরী পোকা সংগ্রহ।

ধানের পোকার রাসায়নিক দমন পদ্ধতি : ধানের জমিতে পোকার আক্রমণ বেশি হলে নির্ধারিত মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। ধানের জমিতে ব্যবহারের জন্য কয়েকটি প্রধান কীটনাশকের ব্যবহার মাত্রা নিচে উল্লেখ করা হলো।

২। বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক এবং প্রয়োগ মাত্রা (উদাহরণ)

কীটের নাম	কীটনাশকের নাম	আকার	প্রতি শতকে প্রয়োগ মাত্রা
পামরী, গান্ধী, পাতা মোড়ানো, পাতা শোষক, চুঙ্গি, থ্রিপস, গল মাছি, ছাতরা পোকা	ম্যালাথিয়ন ৫৭, রগর ৪০, সুমিথিয়ন ৫০, এমএলটি ৫৭	তরল	৪ থেকে ৫ মিলি

বাদামি গাছফড়িং	ডায়াজিনন ১৪, বাসুডিন ১০, ফুরাডান ৩, ডাইমেক্রন ১০০, কার্বিক্রন ৫০	দানাদার, তরল	৮০ থেকে ১০০ গ্রাম ৪ থেকে ৫ গ্রাম
লেদাপোকা, শীষ কাটা লেদাপোকা	ডিডিভিপি, ডাইক্লোরোভস, ভেপোনা ১০০, নগস ১০০	তরল	৮ থেকে ১০ মিলি

৩। মাজরা পোকা

ধান গাছে বিভিন্ন ধরনের পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের পেক্ষাপটে বিষয়টি আরো ব্যাপক ও ভয়াবহ। বিশেষ করে ধান চাষের আধুনিক প্রযুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে এই বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। নিচে ধান গাছের কয়েকটি প্রধান পোকার বিবরণ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

পোকার নাম : **মাজরা পোকা**

ইংরেজি নাম : Rice stem borer

বৈজ্ঞানিক নাম : *Scirpophega* sp.,
Chilo sp.
Sesamia sp.

অন্যান্য প্রজাতি : হলুদ মাজরা পোকা (*Scirpophega incertulus), Scirpophaga innonata.*
কালো মাথা মাজরা পোকা *(Chilo polycrisus)*
গোলাপি মাজরা পোকা *(Sesamia inferense)*

ক্ষতির ধরন : মাজরা পোকার কীড়া ধান গাছের কাণ্ডের ভেতর থেকে খেতে শুরু করে। ক্রমে ক্রমে এরা গাছের ডিগ পাতার গোড়া খেয়ে শেষ করে। এর ফলে ডিগ পাতা মারা যায়। একে ডেড হার্ট (dead heart) বলে। ধান গাছে শীষ আসার পূর্ব পর্যন্ত এ ধরনের ক্ষতি মারাত্মক হতে পারে। মরা ডিগ হাত দিয়ে টান দিলে সহজেই উঠে আসে। এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত গাছের কাণ্ডে মাজরা পোকা আক্রমণের কারণে ছিদ্র এবং আক্রান্ত স্থানে পোকার মল দেখা যায়। শীষ আসার পর মাজরা পোকা ক্ষতি করলে সম্পূর্ণ শীষ শুকিয়ে যায়, যা শ্বেত শীষ, মরা শীষ বা হোয়াইট হেড (white head) নামে পরিচিত।

আক্রমণের লক্ষণ

১. ধানগাছ মাজরা পোকার আক্রমণ হলে আক্রান্ত স্থানে পোকা খাওয়ার চিহ্ন, পোকার মল এবং কীড়া দেখতে পাওয়া যায়।
২. অনেক ক্ষেত্রে কাণ্ডের বহিরাংশের রঙ বিবর্ণ হওয়ার চিহ্ন এবং পোকা বাইরে বের হওয়ার চিহ্ন দেখা যায়। এসব বৈশিষ্ট্য সব ধরনের মাজরা পোকার জন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচিত হলেও বিভিন্ন ধরনের মাজরা পোকার জন্য বিশেষ বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন–

(ক) হলুদ মাজরা পোকার ক্ষেত্রে পাতার উপরে ডিম এবং ডিমের গাদার উপর হাল্কা ধূসর আবরণ দেখা যায়।

(খ) গোলাপি মাজরা পোকার ক্ষেত্রে পাতার খোলের ভেতরের দিকে ডিম দেখা যায়।

(গ) কালোমাথা মাজরা পোকার ক্ষেত্রে ডিমের গাদার উপরে মাছের আঁইশের মতো সাদা আবরণ থাকে।

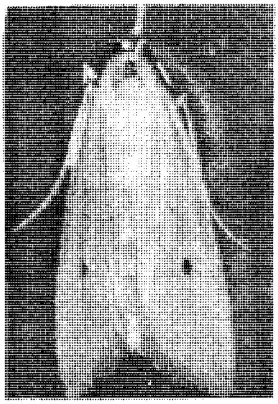

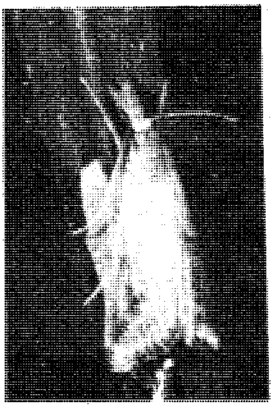

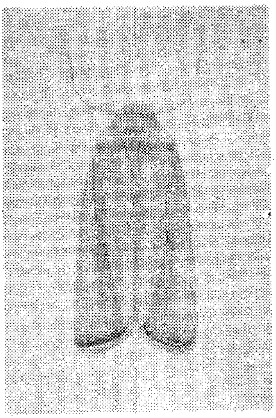

(ঘ) ডিম ফোঁটার আগে এটি গাঢ় রঙ ধারণ করে।

(ঙ) মাজরা পোকার কীড়া ডিম ফুটে বের হওয়ার পর ধীরে ধীরে ধান গাছের কাণ্ডের ভেতর প্রবেশ করে।

(চ) প্রথমাবস্থায় এক একটি ধানের গোছার মধ্যে অনেকগুলো গোলাপি ও কালোমাথা মাজরা পোকার কীড়া দেখা যায়।

(ছ) হলুদ মাজরা পোকার কীড়া কাণ্ডের মধ্যে যে কোনো স্থানে পাওয়া যায়।

মথের বৈশিষ্ট্য : মাজরা পোকার মথ আলোর চারপাশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেলে বোঝা যায়, এসব মথ ক্ষেতের ধানগাছে ডিম পাড়তে শুরু করেছে।

নিয়ন্ত্রণ : মাজরা পোকা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. নিয়মিতভাবে ক্ষেত পর্যবেক্ষণের সময় মাজরা পোকার মথ ও ডিম সংগ্রহ করে বিনষ্ট করে ফেললে মাজরা পোকার সংখ্যা ও ক্ষতি অনেকখানি হ্রাস পায়।

২. মাজরা পোকার পূর্ণবয়স্ক মথের প্রাদুর্ভাব বেড়ে গেলে ধানক্ষেত হতে ২০০ থেকে ৩০০ মিটার দূরে আলোক ফাঁদ পেতে মাজরা পোকার মথ সংগ্রহ করে মেরে ফেলা যায়।

৩. যেসব এলাকায় হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ বেশি, সেসব এলাকায় সম্ভব হলে হলুদ মাজরা পোকা প্রতিরোধসম্পন্ন ধানগাছ, যেমন— চান্দিনা চাষ করা যায়।

৪. বিভিন্ন ধরনের ওষুধ ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করেও বিভিন্ন জাতের মাজরা পোকা দমন ও নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪। **গলমাছি বা নলিমাছি**

ইংরেজি নাম : Gal midge

বৈজ্ঞানিক নাম : *Orciolia oryzae*

আক্রমণের ধরন : গলমাছি বা নলিমাছি গাছের যে পাতাটা গল বা পেঁয়াজ পাতার মতো হয়ে যায় তারই গোড়ায় বসে গলমাছির কীড়াগুলো খায়। কীড়াগুলো এই গলের মধ্যেই পুত্তলিতে পরিণত হয় এবং এই গলের একেবারে উপরে ছিদ্র করে পুত্তলি থেকে পূর্ণবয়স্ক গলমাছি বেরিয়ে যায়। শুধু পুত্তলির কোষটা সেখানে লেগে থাকে।

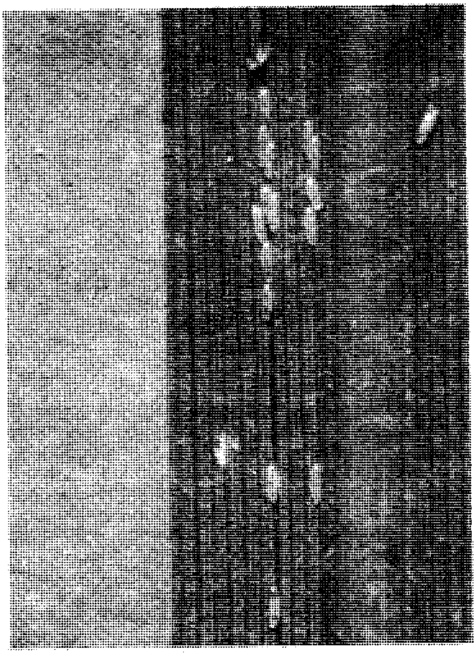

আক্রমণের লক্ষণ : গলমাছি বা নলিমাছি আক্রমণের ফলে ধানগাছের মাঝখানের পাতাটা পেঁয়াজ পাতার মতো নলাকার হয়ে যায়। এ কারণে গলমাছি বা নলিমাছি পোকার ক্ষতির নমুনাকে পেঁয়াজপাতা গল বা নল বলা হয়। এ গল বা নলের প্রথমাবস্থায় রঙ হাল্কা উজ্জ্বল সাদা বলে একে সিলভার শুঁট বা রুপালি পাতা বলা হয়। পেঁয়াজপাতা গল বড় বা ছোট হতে পারে। ছোট হলে শনাক্ত করতে অনেক সময় অসুবিধা হয়। গল হলে সে গাছে আর শীষ বের হয় না।

ধান বর্ষা মৌসুমের শেষের দিকে রোপণ করলে প্রভূত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। বর্ষা মৌসুমে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকলে শুষ্ক মৌসুমে সেচের আওতাভুক্ত ধানক্ষেত পুনরায় আক্রান্ত হতে পারে।

বংশক্রম ও জীবন প্রণালী : গলমাছি বাৎসরিক বংশক্রম মৌসুমী আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। শুষ্ক মৌসুমে গলমাছি নির্জীব থাকে এবং ঝরা ধান বা ঘাসের মধ্যে পুত্তলিপর্ব অবস্থায় বেঁচে থাকে। বর্ষা মৌসুম শুরু হলেই পূর্ণবয়স্ক গলমাছি তৎপর হয়ে উঠে এবং ঘাসজাতীয় বিকল্প গাছের খাদ্য খেয়ে এক বা একাধিক বংশ অতিক্রম করে। পূর্ণবয়স্ক গলমাছি দেখতে একটি মশার মতো। স্ত্রী গলমাছির উদরটি উজ্জ্বল লাল রঙের হয়। এরা রাতে আলোতে আসে, কিন্তু দিনে বের হয় না। স্ত্রী গলমাছি সাধারণত পাতার নিচের পাশে ডিম পাড়ে, তবে মাঝে মধ্যে পাতার খোলের উপরও ডিম পাড়ে।

ঘাসজাতীয় গাছে গলমাছির এক একটি জীবনচক্র সম্পূর্ণ হতে ৯ থেকে ১৪ দিন এবং ধানের উপর ৯ থেকে ২৪ দিন সময় লাগে। ধানের চারা অবস্থা থেকে যদি আক্রমণ শুরু হয় তাহলে কাইচথোড় অবস্থা আসা পর্যন্ত সময়ে এ পোকা কয়েকবার জীবনচক্র সম্পূর্ণ করতে পারে।

নিয়ন্ত্রণ : এ পোকা দমনের জন্য যথানিয়মে রাসায়নিক ওষুধ ব্যবহার করতে হয়।

৫। বাদামি গাছফড়িং

ইংরেজি নাম : Brown plant hopper

বৈজ্ঞানিক নাম : *Nilaparbvata lugens*

আক্রমণের ধরন : বাদামি গাছফড়িং খুব তাড়াতাড়ি বংশ বৃদ্ধি করে, ফলে এ পোকার সংখ্যা এত বেড়ে যায় যে আক্রান্ত ক্ষেতে বাজ পড়ার মতো হপারবার্নের সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত গাছগুলো প্রথমে হলদে এবং পরে শুকিয়ে মারা যায়। বাদামি গাছফড়িং গ্রাসিস্ট্যান্ট, র‍্যাগেট স্ট্যান্ট ও উইল্টেড স্ট্যান্ট নামক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের লক্ষণ : লম্বা পাখাবিশিষ্ট পূর্ণবয়স্ক বাদামি ফড়িংগুলো প্রথমে ধানক্ষেত আক্রমণ করে। এরা পাতার খোলে এবং পাতার মধ্য শিরায় ডিম পাড়ে। ডিমগুলোর উপর পাতলা চওড়া একটা আবরণ থাকে। ডিম ফুটে বাচ্চা (নিম্ফ) বের হতে ৭ থেকে ৯ দিন সময় লাগে। বাচ্চাগুলো ৫ বার খোলস বদলায় এবং পূর্ণবয়স্ক ফড়িং-এ পরিণত হতে ১৩ থেকে ১৫ দিন সময় নেয়। প্রথম পর্যায়ের (ইন্সটার) বাচ্চাগুলোর রঙ সাদা এবং পরের পর্যায়ের বাচ্চাগুলো বাদামি। বাচ্চা থেকে পূর্ণবয়স্ক বাদামি গাছফড়িং ছোট পাখনা এবং লম্বা পাখনাবিশিষ্ট হতে পারে।

ধানে শীষ আসার সময় ছোট পাখাবিশিষ্ট ফড়িং-এর সংখ্যাই বেশি থাকে এবং স্ত্রী পোকাগুলো গাছের খুব গোড়ার দিকে থাকে। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে লম্বা পাখনাবিশিষ্ট ফড়িং-এর সংখ্যাও বাড়তে থাকে, যারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উড়ে যেতে পারে।

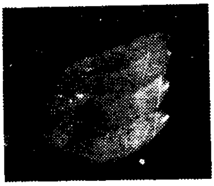

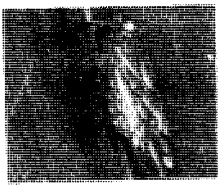

নিয়ন্ত্রণ : (১) যেসব এলাকায় সবসময় বাদামি গাছফড়িং-এর উপদ্রব হয় সেসব এলাকায় তাড়াতাড়ি পাকে (যেমন– চান্দিনা) এমন জাতের ধান চাষ করতে হয়।

(২) ধানের চারা ৩০ থেকে ৪০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে লাগাতে হয়।

৬। সাদা-পিঠ গাছফড়িং

ইংরেজি নাম : White back plant hopper

বৈজ্ঞানিক নাম : *Sogatela furcifera*

আক্রমণের ধরন : সাদাপিঠ গাছফড়িং গাছের রস চুষে খেয়ে কদাচিৎ হপারবার্ন সৃষ্টি করে। পোকার সংখ্যা যদি খুব বেশি বেড়ে যায় তাহলে বাইরের পাতাগুলো পুড়ে যাওয়ার মতো হয়ে যায়।

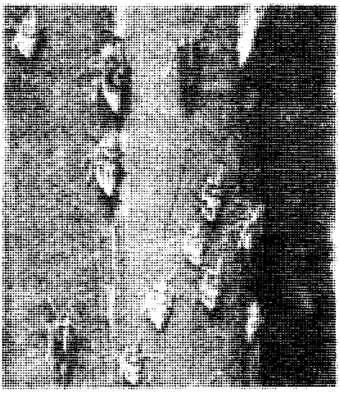

সাদাপিঠ গাছফড়িং অধিকাংশ সময় বাদামি গাছফড়িং-এর সাথে দেখতে পাওয়া যায় এবং সেজন্য এ দু'জাতের পোকাকে শনাক্ত করতে ভুল হয়। সাদাপিঠ গাছফড়িং-এর বাচ্চাগুলো সাদা থেকে বাদামি কালো ও সাদা মিশ্রিত রঙের হয়ে থাকে। পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী ফড়িংগুলো ছোট পাখাবিশিষ্ট।

নিয়ন্ত্রণ : এ পোকা দমনের জন্য ওষুধ ব্যবহার করতে হয়।

৭। সবুজ পাতাফড়িং

ইংরেজি নাম : Green leaf hopper (GHL)

বৈজ্ঞানিক নাম : *Nephotatixs* spp.

আক্রমণের ধরন : সবুজ পাতাফড়িং বেটে ধান, ক্ষণস্থায়ী হলদে রোগ, টুংরো এবং হলুদ বেটে নামক ভাইরাস রোগ ছড়ায়। পূর্ণবয়স্ক ফড়িংগুলো ৩ থেকে ৫ মিলিমিটার লম্বা এবং গায়ে উজ্জ্বল সবুজ রঙের সাথে বিভিন্ন কালো দাগ থাকে। এরা পাতার মধ্য শিরায় বা পাতার খোলে ডিম পাড়ে। ধান উৎপাদনকারী প্রায় সব দেশেই এদের পাওয়া যায়।

নিয়ন্ত্রণ : ধানক্ষেত থেকে ২০০ থেকে ৩০০ মিটার দূরে আলোক ফাঁদে সবুজ পাতাফড়িং এবং আঁকাবাঁকা পাতাফড়িং আকৃষ্ট করে মেরে ফেললে এদের সংখ্যা অনেকাংশে কমিয়ে ফেলা যায়।

৮। থ্রিপ্‌স

ইংরেজি নাম : Thrips

বৈজ্ঞানিক নাম : একাধিক প্রজাতি।

পোকার ধরন : পূর্ণবয়স্ক থ্রিপ্‌স পোকা খুবই ছোট, ১ থেকে ২ মিলিমিটার লম্বা। ডিম পাড়ার জন্য স্ত্রী পোকার পেছনে করাতের মতো ধারালো একটা অঙ্গ আছে যা দিয়ে এরা পাতার মধ্যে ডিম ঢুকিয়ে দিতে পারে। ডিমগুলো সব একই আকারের, খুবই ছোট। প্রথম অবস্থায় ডিমগুলোর রঙ স্বচ্ছ থাকে এবং ডিম ফোটার আগে হলদে হয়ে যায়। ডিম থেকে সদ্য ফোটা বাচ্চাগুলো প্রথমে স্বচ্ছ এবং পরে হলদে রঙ ধারণ করে।

আক্রমণের ধরন ও লক্ষণ : সদ্য ফোটা বাচ্চাগুলো মাঝখানের কচি পাতা, পাতার খোল এবং নতুন ফোটা ধানের শীষে চলে গিয়ে খাওয়া শুরু করে। পূর্ণবয়স্ক থ্রিপ্স পোকা এবং তাদের বাচ্চারা পাতার উপরে ক্ষত সৃষ্টি করে পাতার রস চুষে খায়। ফলে পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে যায়। পাতায় খাওয়ার জায়গাটা হলদে থেকে লাল দেখা যায়। থ্রিপ্স পোকা ধানের চারা অবস্থায়, কুশি ছাড়া অবস্থায় এবং শীষ আসার সময়ও আক্রমণ করতে পারে। শীষ আসার সময় আক্রমণ করলে ধান চিটা হয়ে যায়।

নিয়ন্ত্রণ : (১) নাইট্রোজেনজাতীয় সার, যেমন— ইউরিয়া কিছু পরিমাণ উপরিপ্রয়োগ করে এই পোকার ক্ষতি কিছুটা রোধ করা যায়।

(২) ওষুধ ব্যবহার করে এ পোকা দমন করা যায়।

৯। **পামরী পোকা**

ইংরেজি নাম : Hispa

বৈজ্ঞানিক নাম : *Diclodispa armigera*

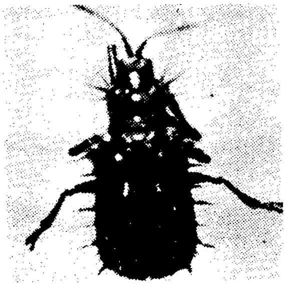

আক্রমণের ধরন ও লক্ষণ : পূর্ণবয়স্ক পামরী পোকা পাতার সবুজ অংশ কুরে কুরে খাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পাতার উপর লম্বালম্বি কয়েকটি সমান্তরাল সাদা দাগ দেখতে পাওয়া যায়। পূর্ণবয়স্ক পামরী ও তাদের কীড়াগুলো উভয়েই ধানগাছের ক্ষতি করে। পূর্ণ বয়স্ক পামরী পোকার গায়ের রঙ কালো এবং পিঠে কাঁটা আছে। সাধারণত বাড়ন্ত গাছ এ পোকা দিয়ে বেশি আক্রান্ত হয়। স্ত্রী পামরী পোকা পাতার নিচের দিকে ডিম পাড়ে। কীড়াগুলো পাতার দুই পর্দার মধ্যে সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। অনেকগুলো কীড়া এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা শুকিয়ে যায়। কীড়া এবং পুত্তলিগুলো সুড়ঙ্গের মধ্যেই থাকে।

পামরী পোকা ৩ থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে জীবনচক্র সম্পন্ন করে।

নিয়ন্ত্রণ : (১) গাছে কুশি ছাড়ার শেষ সময় পর্যন্ত পাতার গোড়ার ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার উপর থেকে ছেটে দিয়ে পামরী পোকার কীড়া মেরে ফেলা যায় এবং পরবর্তী আক্রমণ রোধ করা যায়।

(২) কীটনাশকের অভাবে ক্ষেতে সাবানের ইমাল্শন বা তামাকের ক্বাথ ছিটিয়ে এ পোকা দমন করা যায়।

১০। শীষকাটা লেদাপোকা

ইংরেজি নাম : Ear cutting caterpillar

বৈজ্ঞানিক নাম : *Mythimna separata*

আক্রমণের ধরন : শীষকাটা লেদাপোকার স্বভাব অনুযায়ী এরা এক সাথে বহু সংখ্যায় থাকে বলে ইংরেজিতে এদের আরমি ওয়ার্ম বা সৈনিক পোকা বলে। এরা এক ক্ষেত খেয়ে আর এক ক্ষেত আক্রমণ করে। লেদাপোকা বিভিন্ন জাতের ঘাস খায়। শুধু কীড়াগুলো ক্ষতি করতে পারে। এ পোকা ধানের শীষের গোড়া থেকে কেটে দেয়, এজন্য এর নাম শীষকাটা লেদাপোকা। মেঘলা আবহাওয়ায় এদের আক্রমণ খুব বেশি হয়।

নিয়ন্ত্রণ : (১) ধান কাটার পর এ পোকার কীড়া ও পুত্তলি ক্ষেতের নাড়া বা মাটির ফাটলের মধ্যে থাকে। এজন্য ধান কাটার পর নাড়া পুড়িয়ে দিতে হয়।

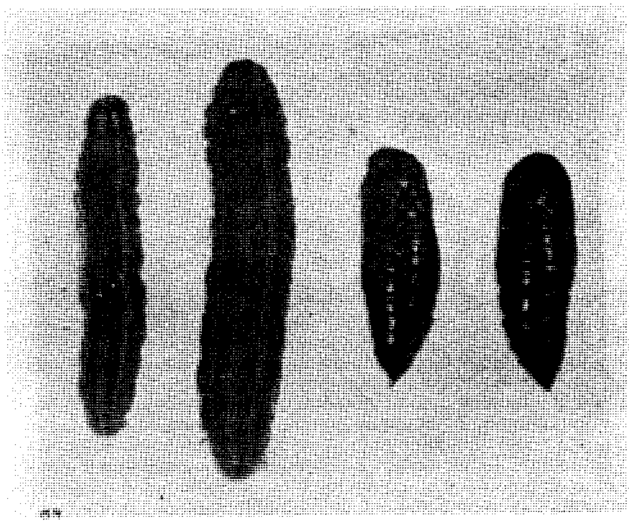

(২) আক্রান্ত ক্ষেতে কিছুটা বেশি করে সেচ দিয়ে এবং পাখির খাওয়ার সুবিধার জন্য ক্ষেতের বিভিন্ন স্থানে ডালপালা পুঁতে দিয়ে এ পোকার সংখ্যা কমানো যায়।

(৩) রাসায়নিক স্পর্শ বিষ প্রয়োগ।

১১। ছাতরা পোকা

ইংরেজি নাম : Meally bug

বৈজ্ঞানিক নাম : *Bravinea rahei*

আক্রমণের ধরন : শুকনো আবহাওয়ায় বা খরার সময়ে এবং যেসব জমিতে বৃষ্টির পানি মোটেই দাঁড়াতে পারে না– সে ধরনের অবস্থায় ছাতরা পোকার আক্রমণ বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এরা গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ খাটো হয়ে যায়। আক্রমণ বেশি হলে ধানের শীষ বের হয় না।

স্ত্রী ছাতরা পোকা খুব ছোট, লালচে সাদা রঙের নরম দেহবিশিষ্ট, পাখনাবিহীন এবং গায়ে সাদা মোমজাতীয় পদার্থের আবরণ থাকে।

নিয়ন্ত্রণ : আক্রমণের প্রথম দিকে শনাক্ত করতে পারলে আক্রান্ত গাছগুলো উপড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে এ পোকার আক্রমণ ও ক্ষতি ফলপ্রসূভাবে কমানো যায়।

১২। স্কিপার পোকা

ইংরেজি নাম : Skipper

বৈজ্ঞানিক নাম : *Pillowpidus matheous*

আক্রমণের ধরন : এ পোকার কীড়াগুলো ধানের পাতার পাশ থেকে খেতে খেতে মধ্য শিরার দিকে আসে। সবুজ-শুঁড় লেদাপোকা, সেমিলুপার এবং এ পোকার খাওয়ার ধরন ও ক্ষতির নমুনা একই রকম।

জীবনচক্র : পূর্ণবয়স্ক স্কিপার একটি মথ। এর শুঁড় দুটো দেখতে অনেকটা আংটার মতো। এরা বেশ তাড়াতাড়ি আঁকাবাঁকাভাবে উড়ে। এ পোকার পুত্তলি মোড়ানো পাতার সাথে রেশমি সুতার মতো আঠা দিয়ে আটকানো থাকে।

নিয়ন্ত্রণ : রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ।

১৩। পাতামাছি

ইংরেজি নাম : Leaf fly

বৈজ্ঞানিক নাম : *Hydralea philipina*

আক্রমণের ধরন : পাতামাছির কীড়া ধানগাছের মাঝখানের পাতা গাছ থেকে পুরোপুরি বের হওয়ার আগেই পাতার পাশ থেকে খাওয়া শুরু করে। মাঝখানের পাতা যতো বাড়তে থাকে ক্ষতিগ্রস্ত অংশ ততোই স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায়। চারা থেকে শুরু করে কুশি ছাড়ার শেষ অবস্থা পর্যন্ত ধানগাছ এই পোকা দিয়ে আক্রান্ত হতে পারে।

জীবনচক্র : পূর্ণবয়স্ক পাতামাছি ২ মিলিমিটার লম্বা হয়। এরা পাতার উপরে একটি করে ডিম পাড়ে। ডিম ফোটার পর কীড়াগুলো কচি মাঝ পাতা খেতে শুরু করে। পাতামাছির জীবনচক্র ৪ সপ্তাহে পূর্ণ হয়।

নিয়ন্ত্রণ : রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ।

১৪। চুঙ্গি পোকা

ইংরেজি নাম : Case worm

বৈজ্ঞানিক নাম : *Nymphula depunctalis*

আক্রমণের ধরন : চুঙ্গি পোকা ধানগাছের কুশি ছাড়ার শেষ অবস্থা আসার আগে কীড়াগুলো পাতার সবুজ অংশ লম্বালম্বিভাবে খায়। আক্রান্ত ক্ষেতের গাছের পাতা সাদা দেখা যায়। চারা অবস্থায় এ পোকা বেশি ক্ষতি করে।

জীবনচক্র : পূর্ণবয়স্ক চুঙ্গি পোকা ৬ মিলিমিটার লম্বা। চুঙ্গি পোকা রাতে তৎপর এবং আলোতে আকর্ষিত হয়। কীড়াগুলো বড় চারাগাছ এবং নতুন ক্ষেতে বেশি দেখতে পাওয়া যায়। এরা পাতার উপরের দিকটা কেটে চুঙ্গি তৈরি করে এবং এর মধ্যে থাকে। কাটা পাতা দিয়ে তৈরি চুঙ্গিগুলো বাতাসে বা পানিতে ভেসে ক্ষেতের এক পাশে জমা হয়।

চুঙ্গি পোকা প্রায় ৩৫ দিনে একটা জীবনচক্র সম্পূর্ণ করে।

নিয়ন্ত্রণ : (১) চুঙ্গি পোকার কীড়া পানি ছাড়া শুকনো জমিতে বাঁচতে পারে না। এজন্য আক্রান্ত ক্ষেতের পানি সরিয়ে দিয়ে এ পোকার সংখ্যা কমানো যায়।
(২) রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ।

১৫। পাতামোড়ানো পোকা

ইংরেজি নাম : Leaf roller
বৈজ্ঞানিক নাম : *Naphalochrosis medinalis*
আক্রমণের ধরন : এ পোকা পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে, ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পাতায় সাদা লম্বা দাগ দেখা যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পাতার কিনারা দিয়ে বিশেষ করে পাতার লালচে রেখা রোগ শুরু হতে পারে।

পূর্ণবয়স্ক স্ত্রী পোকা পাতার মধ্যশিরার কাছে ডিম পাড়ে। কীড়াগুলো পাতার সবুজ অংশ খায় এবং বড় হওয়ার সাথে সাথে তারা পাতা লম্বালম্বিভাবে মুড়িয়ে একটা নলের মতো করে। মোড়ানো পাতার মধ্যেই কীড়াগুলো পুত্তলিতে পরিণত হয়।

নিয়ন্ত্রণ : রাসায়নিক দমন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

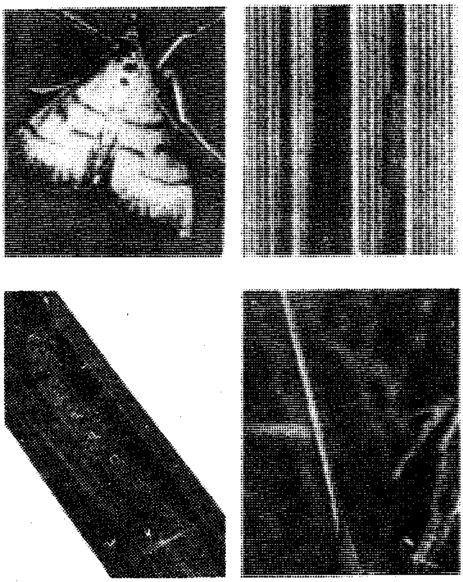

১৬। গান্ধীপোকা

ইংরেজি নাম : Bug

বৈজ্ঞানিক নাম : *Leptocorhisa oratorious acuta*

আক্রমণের ধরন : গান্ধীপোকা ধানের দানা আক্রমণ করে। পূর্ণবয়স্ক এবং বাচ্চা পোকা (নিম্ফ) উভয়েই ধানের ক্ষতি করে। ধানের দানায় যখন দুধ সৃষ্টি হয় তখন ক্ষতি করলে ধান চিটা হয়ে যায়।

পূর্ণবয়স্ক গান্ধীপোকা ধূসর রঙের এবং কিছুটা সরু। পাগুলো ও শূঁড় দুটি লম্বা। এরা ধানের পাতা ও শীষের উপর সারি করে ডিম পাড়ে। সবুজ রঙের বাচ্চা এবং পূর্ণবয়স্ক গান্ধীপোকার গা থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ বের হয়।

এছাড়া বিটলজাতীয় বিভিন্ন পোকার আক্রমণও লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

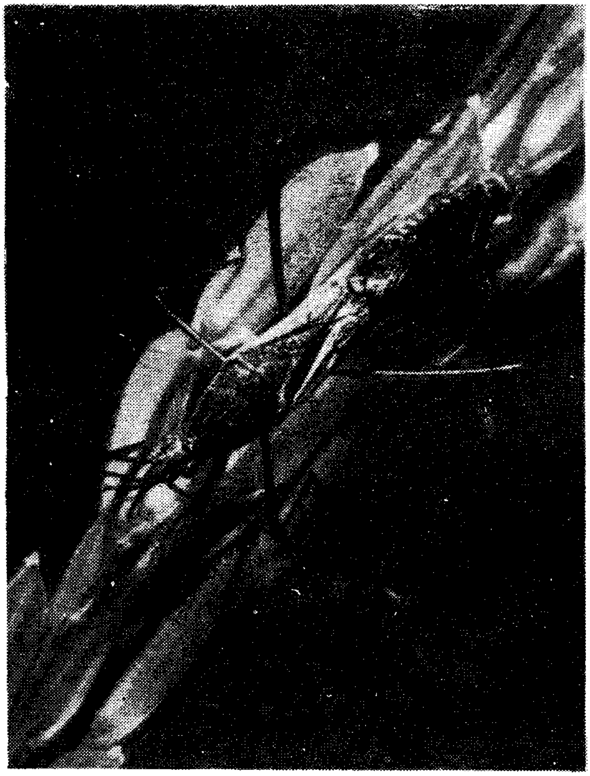

নিয়ন্ত্রণ : (১) এ পোকার সংখ্যা যখন খুব বেড়ে যায় তখন ক্ষেতে ২০০ থেকে ৩০০ মিটার দূরে আলোক ফাঁদ বসিয়ে আকৃষ্ট করে মেরে ফেললে এদের সংখ্যা অনেক কমিয়ে ফেলা যায়।

(২) রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ।

১৭। লেদাপোকা

ইংরেজি নাম : Caterpillar

বৈজ্ঞানিক নাম : *Spodoptera litura, Spooptera marutia, Spodoptera exempta Spodoptera exiqua*

আক্রমণের ধরন : লেদাপোকা কেটে কেটে খায় বলে ইংরেজিতে এদের কাটুই পোকা বলে। এই প্রজাতির পোকা সাধারণত শুকনো ক্ষেতের জন্য বেশি ক্ষতিকর। কারণ এদের জীবনচক্র শেষ করার জন্য শুকনো জমির দরকার হয়। প্রথমাবস্থায় কীড়াগুলো শুধু পাতাই খায়, কিন্তু বয়স্ক কীড়া সম্পূর্ণ পাতাই খেয়ে ফেলতে পারে। এরা চারা গাছের গোড়াও কাটে।

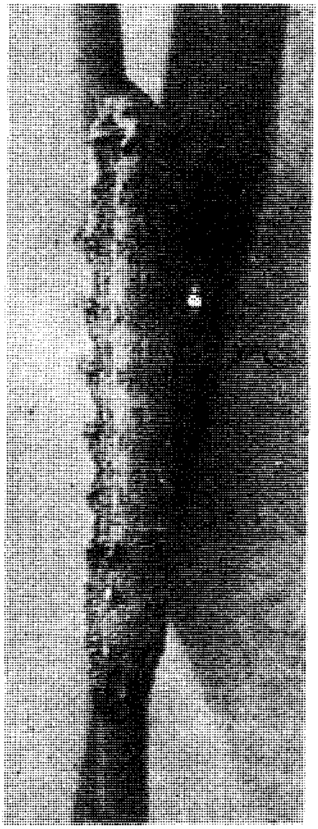

নিয়ন্ত্রণ : (১) ধান কাটার পর ক্ষেতের নাড়া পুড়িয়ে দিলে বা জমি চাষ করে ফেললে এ পোকার সংখ্যা অনেক কমিয়ে ফেলা যায়।

(২) আক্রান্ত ক্ষেত সেচ দিয়ে ডুবিয়ে দিয়ে এবং পাখির খাওয়ার জন্য ক্ষেতে ডালাপালা পুতে দিয়েও এদের সংখ্যা কমানো যায়।

(৩) রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ।

১৮। উরচুঙ্গা

ইংরেজি নাম : Mole cricket

বৈজ্ঞানিক নাম : *Gryllotalpa africana*

আক্রমণের ধরন : উরচুঙ্গা গাছের গোড়া কেটে দেয়, ফলে গাছ মারা যায়। অনেক সময় এদের ক্ষতি মাজরা পোকার ক্ষতির সাথে মিলে যেতে পারে। কিন্তু মাজরা পোকা কাণ্ডের ভেতরটা খায়।

পানি আটকিয়ে রাখা যায় না এমন ধানক্ষেতে উরচুঙ্গা একটা সমস্যা। ক্ষেত ডুবিয়ে দিলে উরচুঙ্গা আইলে বা উঁচু জায়গায় চলে যায়।

নিয়ন্ত্রণ : (১) সেচ দিয়ে ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়ে এ পোকার আক্রমণ রোধ করা যায়।
(২) রাসায়নিক ওষুধ প্রয়োগ।

১৯। ক্ষতিকর ইঁদুর

ইংরেজি নাম : Rat

বৈজ্ঞানিক নাম : *Bandicota* spp.

আক্রমণের ধরন : গাছের যে কোনো বয়সেই ইঁদুর ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে গাছে কাইচথোড় আসার সময়। এসময় তারা গাছ কেটে ফেলে এবং কাইচথোড়ের গোড়ার দিকটা খেয়ে ফেলে।

ধানক্ষেতের বিভিন্ন জায়াগায় এক বিরাট অংশে ইঁদুর বাস করে, শুধু ক্ষেতের পাশের দিকটা বাদ দিয়ে মাঝখানের অংশ সম্পূর্ণ ক্ষতি করে ফেলতে পারে।

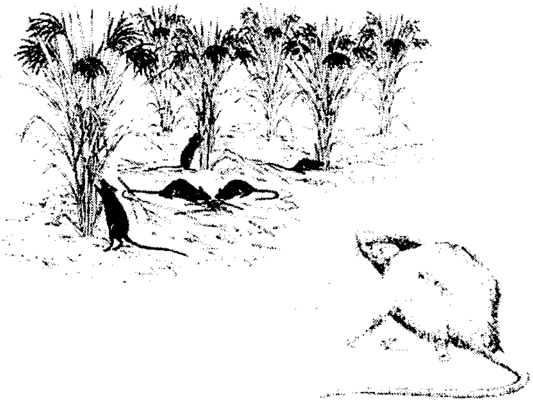

নিয়ন্ত্রণ : (১) যেসব এলাকায় ইঁদুরের উপদ্রব বেশি, সেসব এলাকার ক্ষেতের চারপাশের আইল পরিষ্কার রাখলে ইঁদুরের আস্তানা করতে অসুবিধা হয়, ফলে ইঁদুরের উপদ্রবও কম থাকে।

(২) বিভিন্ন ফাঁদের সাহায্যে ইঁদুর মেরে তাদের সংখ্যা কমানো যেতে পারে।

(৩) এছাড়া জিঙ্ক ফসফাইডের বিষটোপ ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করা যায়।

২০। ক্ষতিকর পাখি

ইংরেজি নাম : Birds

আক্রমণের ধরন : শীষ বের হওয়ার পরপরই পাখি ক্ষতি করতে পারে। বেশি ক্ষতি হয় ধানের দানায় দুধ আসার পর বা দানা শক্ত হওয়ার পর। ধান পাকার সময় আক্রমণ করলে পাখিরা সম্পূর্ণ দানা খেয়ে ফেলে।

নিয়ন্ত্রণ : (১) পাখিদের ভয় দেখানোর জন্যে ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার চওড়া কাগজের বা কাপড়ের ফালি ক্ষেতের ৩ থেকে ৪ হাত উপর দিয়ে টাংগিয়ে দিয়ে পাখির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

(২) খালি কেরোসিন টিনের সাহায্যে শব্দ করে পাখি তাড়ানো যেতে পারে।

২১। মাজরা পোকা ও গলমাছি **দমনের অনুমোদিত কীটনাশক ও প্রয়োগমাত্রা**

কীটনাশকের নাম	**প্রতি হেক্টরে প্রয়োগমাত্রা**
ফসফামিডন (১০০ তরল)	৮৫০.০০ মিলিলিটার
ডাইক্রটোফস (৮৫ তরল)	৮৪০.০০ মিলিলিটার
ডাইক্লোরোভস (১০০ তরল)	৫০০.০০ মিলিলিটার
মনোক্রোটোফস (৪০ তরল)	১.৫০ লিটার

ডায়াজিনন (৬০ তরল)	১.৭০ লিটার
ফেনভেলারেট (২০ তরল)	২৫০ মিলিলিটার
এস-ফেনভেলারেট (৫ তরল)	২৫০ মিলিলিটার
ফেনথোয়েট (৫০ তরল)	১.৭০ লিটার
ফেনথিয়ন (৫০ তরল)	১.১২ লিটার
ফেনিট্রোথিয়ন (৫০ তরল)	১.১২ লিটার
কুইনালফস (২৫ তরল)	১.৫০ লিটার
কার্বোসালফান (২০ তরল)	১.৫০ লিটার
কারবারিল (৮৫ পাউডার)	১.৭ কেজি
ক্লোরোপাইরিফস (২০ তরল)	১.৫০ লিটার
ডায়াজিনন (১৪ দানাদার)	১৩.৫০ কেজি
ডায়াজিনন (১০ দানাদার)	১৬.৮০ কেজি
কুনালফস (৫ দানাদার)	১৬.৮০ কেজি
কার্বোফুরান (৩ দানাদার)	১৬.৮০ কেজি
কার্বোফুরান (৫ দানাদার)	১০.০০ কেজি
ফেনথোয়েট (৫ দানাদার)	১৯.৯৬ কেজি
ডাইমোথোয়েট (৪০ তরল)	১.১২ লিটার
ফেনিট্রোথিয়ন (৫০ তরল)	১.০০ লিটার
ম্যালাথিয়ন (৫৭ তরল)	১.০০ লিটার
অক্সিডিমেটন মিথাইল (২৫ তরল)	১.১২ লিটার
ফজালোন (৩৫ তরল)	১.০০ লিটার
ফেনথিয়ন (৫০ তরল)	১.০০ লিটার
সাইপারমেথ্রিন (১০ তরল)	৫০০ মিলিলিটার
আলফামেথ্রিন (২ তরল)	৫০০ মিলিলিটার
পিরিমিফস মিথাইল (৫০ তরল)	১.০০ লিটার
এমআইপিসি (৭৫ পাউডার)	১.১২ কেজি
ফরমোফিয়ন (২৫ তরল)	১.১২ লিটার

ধানে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (Integrated Pest Management in Rice)

কোনো ফসল উৎপাদন কার্যক্রমে ফসল শত্রু দমনের সম্ভাব্য কম সমস্যাপূর্ণ স্বল্প ব্যয় ও বান্ধব পদ্ধতিসমূহের গ্রহণযোগ্য সমন্বিত প্যাকেজকে সমন্বিত বালাইদমন ব্যবস্থাপনা বলে (The Integrated Pest Management or IPM may be defined the package consisting an acceptable combination of less hazardous, economic and friendly methods of pest control in a crop production schedule).

প্রতিটি ফসলের বা ফসল বিন্যাসের জন্য স্বাভাবিকভাবে আইপিএম পদ্ধতি ভিন্ন হয়। ধান উৎপাদন কার্যক্রমে আইপিএম পদ্ধতি অবলম্বন করার জন্য যে পরিকল্পনা তৈরি করা হয় তাকে ধানের সমন্বিত বালাই দমন বলে।

ধানে আইপিএম-এর বৈশিষ্ট্য

সংজ্ঞা অনুসারে ধান উৎপাদনে আইপিএম-এর বৈশিষ্ট্যসমূহকে নিচে উল্লেখ করা যায়।

১. পদ্ধতি জটিলতা মুক্ত হবে যাতে অধিকাংশ কৃষক এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে।
২. পদ্ধতি অবলম্বনে ব্যয় কম হবে যাতে ফসলের উৎপাদন ব্যয় ও আয় লাভজনক পর্যায়ে থাকে।
৩. আইপিএম তুলনামূলক পরিবেশ ঘনিষ্ট হবে যাতে প্রাকৃতিক জৈব চক্র বিঘ্নিত না হয়।

ফসল শত্রুর প্রকার

ফসলের বিভিন্ন প্রকার শত্রুর মধ্যে রয়েছে —

১. পোকা-মাকড় (Insect pests).

২. পরজীবী রোগ (Parasitic diseases).
৩. অপুষ্টি রোগ (Deficiency diseases).
৪. আগাছা (Weeds).
৫. ক্ষতিকর প্রাণী (Animal pests).
৬. বিবিধ শত্রু।

ফসলের শত্রু দমনের পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে

১. কারিগরি বা ভৌত পদ্ধতি (Mechanical or physical methods).
২. রাসায়নিক পদ্ধতি (Chemical methods).
৩. জৈবিক পদ্ধতি (Biological methods).
৪. বিবিধ পদ্ধতি।

বাংলাদেশে ধান চাষের আইপিএম-এর গুরুত্ব

বাংলাদেশে ধানের চাষের IPM-এর গুরুত্ব বেশি, কারণ—

১. দেশের প্রায় ৮৫% জমিতে কোনো না কোনো জাতের বা মৌসুমের ধানের চাষ হয়।
২. ধানের উৎপাদন হারের প্রায় ৩০% থেকে ৬০% ফসল শত্রু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
৩. ধানের শত্রু দমনে মারাত্মক বিযাক্ত ও পরিবেশ বিনষ্টকারী ব্যয়বহুল দ্রব্য বেশি ব্যবহৃত হয়।
৪. জমিতে বা এলাকায় প্রায় সারা বছরই ধান ফসল থাকে বলে ফসল শত্রুর জীবনচক্র সহজে অব্যাহত থাকে এবং এতে শত্রুর আক্রমণ বেশি হয়।
৫. ধান ফসল সর্বাধিক সংখ্যক ফসল শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়।
৬. বাংলাদেশে শত্রু দমনের রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করতে হয়।
৭. বাংলাদেশে ফসল শত্রু দমনের উপযোগী জৈবিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের সুযোগ এদেশে রয়েছে।

ধানে আইপিএম পদ্ধতি অবলম্বনের ধাপ

ধানের ফসল শত্রু দমনে বিভিন্ন পদ্ধতি নিম্নরূপভাবে অবলম্বন করা যায়—

১. পোকার আক্রমণ ও রোগসহিষ্ণু জাতের চাষ।
২. জমি সঠিকভাবে তৈরি করা অর্থাৎ চাষের সময় মাটিতে রোদ লাগানো।
৩. সুষম সার প্রয়োগ।
৪. সঠিক দূরত্বে বীজ রোপণ।
৫. হাতে বাছাই করে আগাছা দমন।
৬. হাতে বাছাই করে পোকাক্রান্ত ও রোগাক্রান্ত গাছ অপসারণ (ভৌত ও জেবিক পদ্ধতি)।
৭. সঠিকভাবে পোকা, রোগ ও অপুষ্টি রোগ নির্ণয়।
৮. শত্রুর আক্রমণের তীব্রতা ও অর্থনৈতিক মাত্রা নির্ণয়।

৯. ধানের জমিতে পানি, ব্যাঙ, মাছ, উপকারী পোকা ইত্যাদি বিবেচনা করা।

১০. সমন্বিত দমন পদ্ধতির প্যাকেজ হিসেবে তীব্র আক্রমণে প্রয়োজনের ন্যূনতম হারে রাসায়নিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন।

ধানে আইপিএম পদ্ধতি অবলম্বনের এসব বিষয় ধান চাষের বিভিন্ন অধ্যায়েও আলোচনা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজন করা হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

ধানের উপকারী পোকামাকড়

ধানের জমিতে বহু ধরনের পোকার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদের সবগুলোই ক্ষতিকর নয়। বরং এদের মধ্যে অনেক উপকারী পোকা রয়েছে। ইতোপূর্বে ধানের ক্ষতিকর পোকার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে ধানের কয়েকটি প্রধান উপকারী পোকার সচিত্র পরিচিতি দেওয়া হলো।

১। ধানের উপকারী পোকার বৈশিষ্ট্য

১. এগুলো অন্য ক্ষতিকর পোকা খায়।
২. ক্ষতিকর পোকার ডিম, শূককীট, মূককীট ক্ষতিগ্রস্ত করে।
৩. অনেক মাকড়সা সরাসরি অন্য পোকা শিকার করে।
৪. অনেক ছত্রাক ক্ষতিকর পোকা আক্রমণ করে তাদের বিনষ্ট করে।

এসব কারণে ধানে পোকা দমনের জন্য কীটনাশক ব্যবহারে সাবধান থাকতে হয় যাতে নির্বিচারে উপকারী পোকা বিনষ্ট না হয়। পরিবেশ রক্ষার জন্য এসব উপকারী পোকা খুবই প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে জীব বৈচিত্র্য ও জৈবিক পরিবেশ রক্ষায় এদের প্রভাব অনস্বীকার্য।

২। উপকারী পোকার ধরন

উপকারী পোকামাকড়ের কার্যাবলীর প্রধান প্রধান ধরন হচ্ছে :

১. পরভোজী পোকামাকড় (Predator) : মাকড়সা, লেডিবার্ড বিটল, গাছফড়িং ;
২. পরজীবী পোকা (Parasite) ;
৩. রোগজীবাণু : ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস।

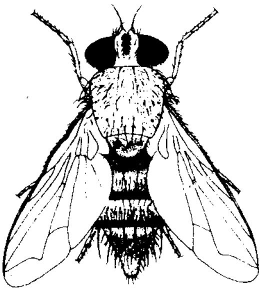

১. **মাছি পোকা**
স্কিপার পোকা পরজীবী
Argyrophyllus negrotibialis, (ট্যাকনিডি গোত্র) : ধূসর, শিকার পোকার উপর ডিম পাড়ে। ঘাড়ে ও পেটে কাঁটার মতো লোম।

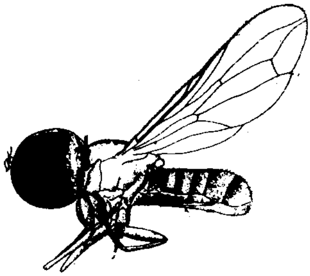

২. **মোটা মাথা মাছি** *Tomosvariala subvirisens,*
গোত্র : Pipunculideae.
পাতাফড়িং-এর পরজীবী পোকা।

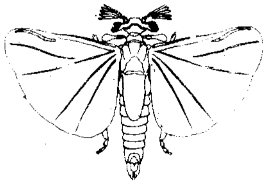

৩. স্ট্রেপসিপটেরা
Strepsiptera sp.
পাতা ও গাছফড়িং–এর পরজীবী।

৪. নেকড়ে মাকড়সা
Licosa pseudoanuleta,
গোত্র : Licosideae.
মাজরা পোকার পরভোজী পোকা।

BAMSDOC Library
Dhaka

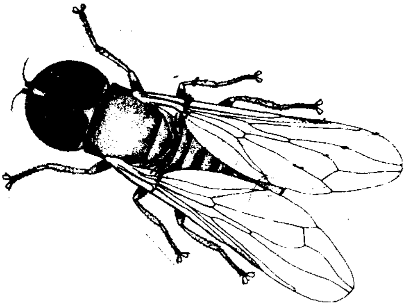

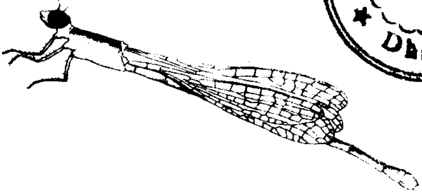

৫. পিপুন মাছি
Pipunculus mutilatus
গোত্র : Pipunculideae.
পাতাফড়িং–এর পরজীবী পোকা।

৬. ড্যামসেল ফ্লাই (ছায়া)
Agriochnemis pigmi
গোত্র : Synagrionideae
পরভোজী পোকা।

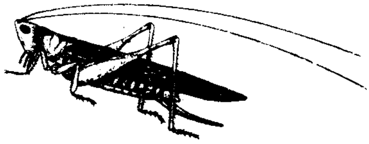

৭. ঘাস ফড়িং
Conocephaluslongipenis,
গোত্র : Tetigonideae.
পরভোজীপোকা।

৮. বোলতা
Cardiochiles philipinsis
গোত্র : Braconideae.
পাতা মোড়ানো পোকার কীড়ার পরজীবী।

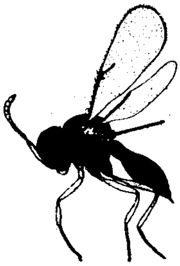

৯. **ছোট বোলতা**
Six lacunatus
গোত্র : Solionideae.
ব্ল্যাক বাগের ডিমের পরজীবী পোকা।

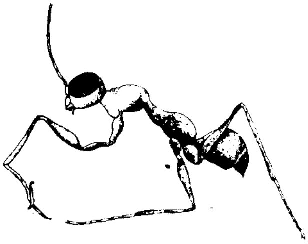

১০. **বড় বোলতা**
Haplogonatopus apicalis
গোত্র : Drynideae.
Pseudogonatopus sp.
পাতা ও গাছফড়িং-এর পরভোজী বা পরজীবী পোকা।

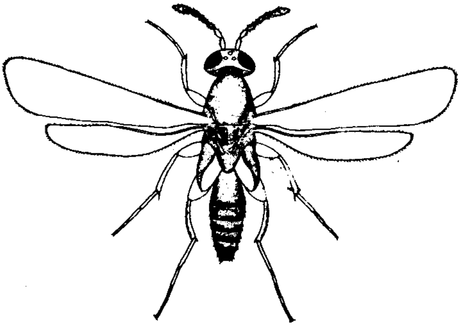

১১. **সরু বোলতা**
Elusmus sp.
ইলাসমিডি গোত্র : Elusmideae.
পাতা মোড়ানো পোকার কীড়ার পরজীবী পোকা।

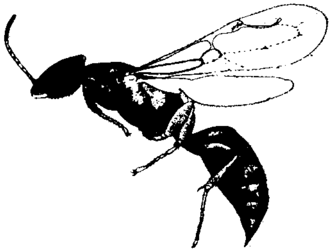

১২. **গোনাই বোলতা**
Goniojus triangulifer
গোত্র : Bothylideae.
পাতামোড়ানো পোকার কীড়ার পরজীবী পোকা।

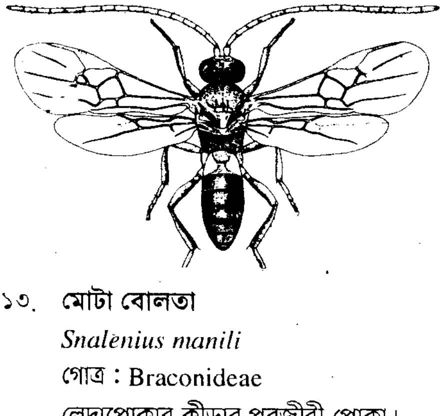

১৩. **মোটা বোলতা**
Snalenius manili
গোত্র : Braconideae
লেদাপোকার কীড়ার পরজীবী পোকা।

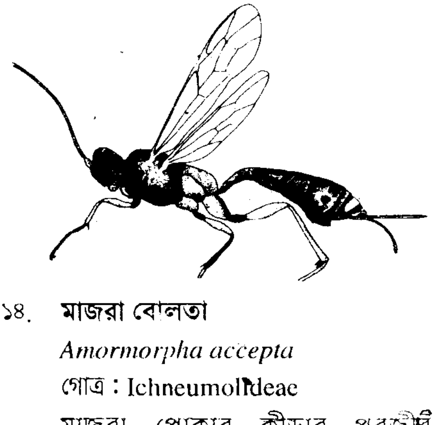

১৪. **মাজরা বোলতা**
Amormorpha accepta
গোত্র : Ichneumolideae
মাজরা পোকার কীড়ার পরজীবী পোকা।

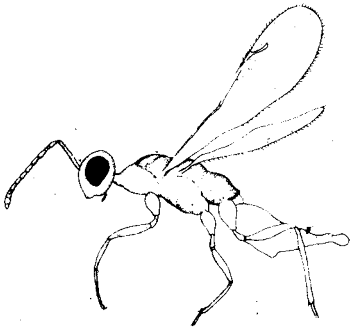

১৫. **ফড়িং বোলতা**
Panstenon colaris,
গোত্র : Toromalideae
পাতাফড়িং ও গাছফড়িং-এর ডিমের পরভোজী পোকা।

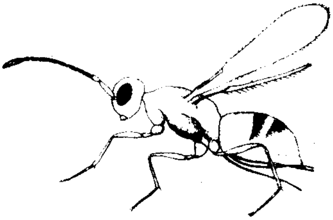

১৬. পেট বোলতা
Gonatoserus sp.
গোত্র : Mymerideae
পাতাফড়িং ও গাছফড়িং-এর ডিমের পরজীবী পোকা।

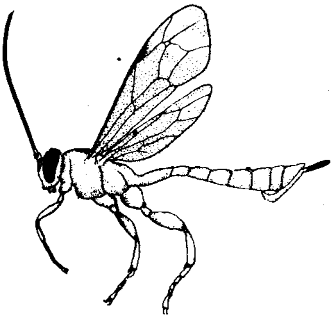

১৭. **বাঁকা বোলতা**
Xanthopimpola `lavoliniata,
গোত্র : Ecnirvmenideae.
মাজরা পোকার কীড়ার পরজীবী পোকা।

১৮. খাটো বোলতা
Cotesia angustibasis
গোত্র : Braconideae
পাতামোড়ানো পোকার পরজীবী পোকা।

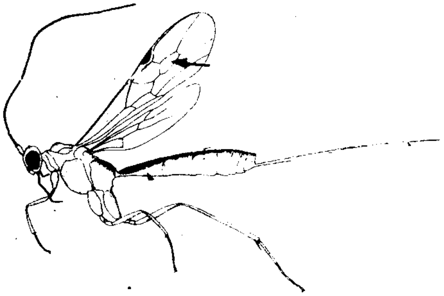

১৯. লেজ বোলতা
Macrocentrus philipensis.
গোত্র : Braconideae
পাতামোড়ানো পোকার পরজীবী পোকা।

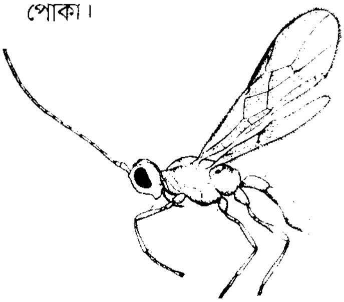

২০. অপিয়াস বোলতা : *Opius* sp.
গোত্র : Braconideae
পাতা মাছির কীড়ার পরজীবী পোকা।

২১. **কালো বোলতা**
Brachy merialesus
গোত্র : Calsidideae
বিভিন্ন পোকার কীড়া ও পুত্তুলির পরজীবী পোকা।

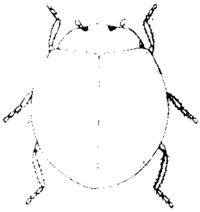

২২. **লেডি বিটল :** *Micruspis* sp.
গোত্র : Coccinalideae
গাছফড়িং–এর পরজীবী পোকা।

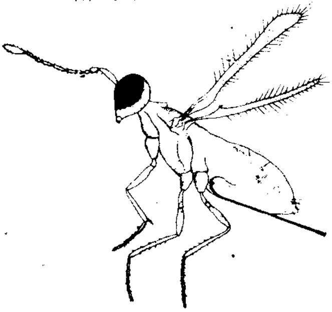

২৩. **এনা বোলতা**
Anagrus optabilis
গোত্র : Mymerideae
পাতা ও গাছফড়িং–এর ডিমের পরজীবী পোকা।

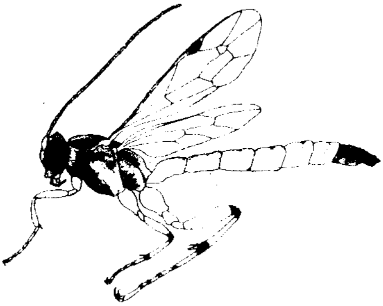

২৪. **লম্বা বোলতা**
Etoplectis narangi
গোত্র : Ichnumonideae
বিভিন্ন পোকার কীড়ার পরজীবী পোকা।

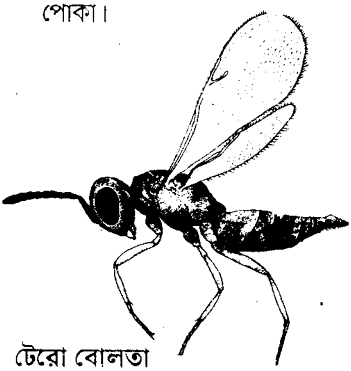

২৫. **টেরো বোলতা**
Trichomalopsis apontaloetina
গোত্র : Toromalideae
বিভিন্ন পোকার ডিম ও পুত্তুলির পরজীবী পোকা।

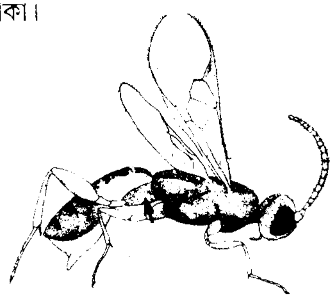

২৬. **কোটেসিয়া বোলতা**
Cotesia flavipes
গোত্র : Braconedeae
বিভিন্ন পোকার কীড়ার পরজীবী পোকা।

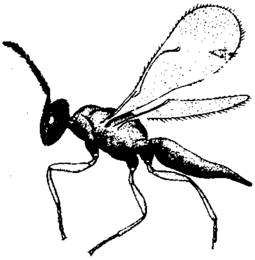

২৭. **টেট্রা বোলতা**
Tetrasticus shoenbi
গোত্র : Eeulophydeae
মাজরা পোকার ডিমের পরভোজী বা পরজীবী পোকা।

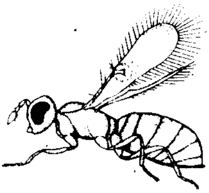

২৮. **ওলি বোলতা**
Oligocita naius
গোত্র : Trichogramatideae
পাতা ও গাছ ফড়িং-এর ডিমের পরজীবী পোকা।

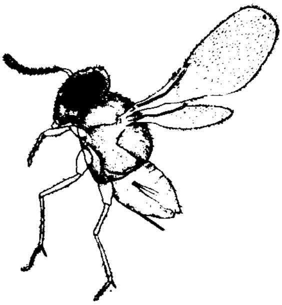

২৯. **খাটো কপি বোলতা**
Copidosomansis nacoli,
গোত্র : Indirtideae
পাতামোড়ানো পোকার ডিমের পরজীবী পোকা।

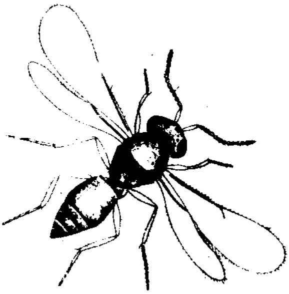

৩০. **টেলি বোলতা**
Telenomus roani,
গোত্র : Sclionideae
মাজরা পোকার ডিমের পরজীবী পোকা।

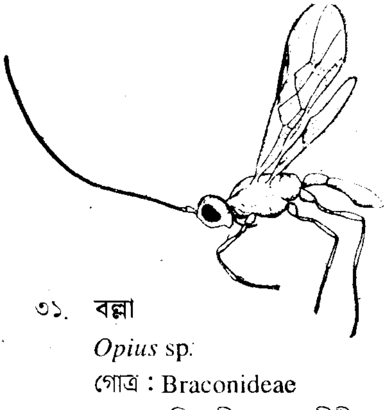

৩১. **বল্লা**
Opius sp.
গোত্র : Braconideae
পাতা মাছির কীড়ার পরজীবী পোকা।

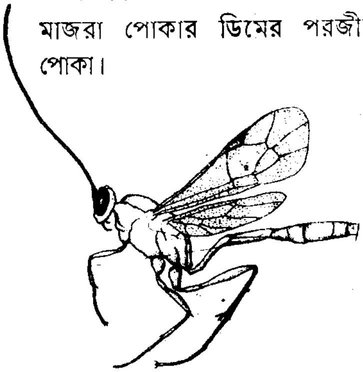

৩২. **ফিল বোলতা**
Temelucha philipensis
গোত্র : Ichneumonideae
বিভিন্ন পোকার কীড়ার পরজীবী পোকা।

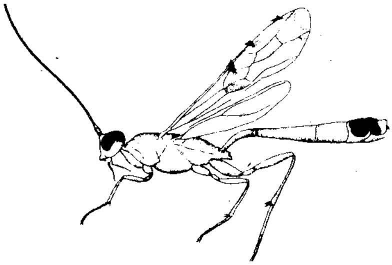

৩৩. **লম্বা লেজ বোলতা**
Stenobracon nisevili
গোত্র : Braconideae.
মাজরা পোকার কীড়ার পরজীবী পোকা।

৩৪. **ক্যারপ্স বোলতা**
Carops brachypterum
গোত্র : Ichneumonideae.
বিভিন্ন পোকার কীড়ার পরজীবী পোকা।

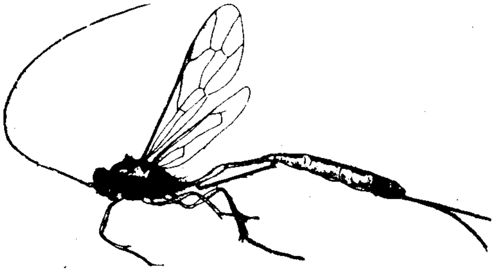

৩৫. **ট্রাইকোমা বোলতা**
Trichoma naphalochrosis
গোত্র : Ichneumonideae
পাতা মোড়ানো পোকার কীড়ার পরজীবী পোকা।

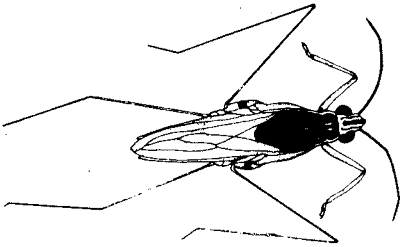

৩৬. **ওয়াটার বাগ**
Limnogonus `osarum
গোত্র : Jarideae
ফড়িংজাতীয় পোকায় কীড়ার পরজীবী পোকা।

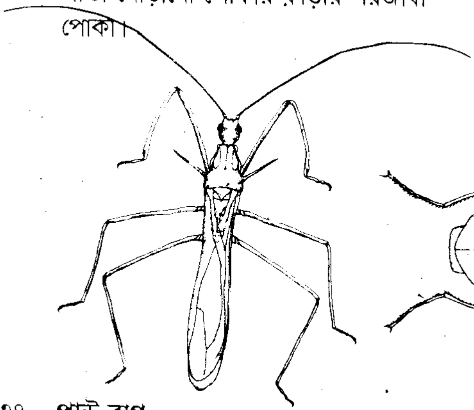

৩৭. **প্লান্ট বাগ**
Polytocsus fuscovitatus
গোত্র : Rhoduvideae
মথ ও প্রজাতির কীড়ার পরভোজী পোকা।

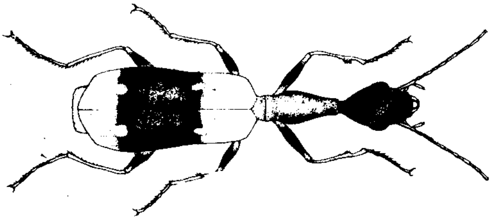

৩৮. **গ্রাউন্ড বিটল**
Ophionia negrofaciata
গোত্র : Carabideae
পাতা মোড়ানো পোকার কীড়ার পরজীবী পোকা।

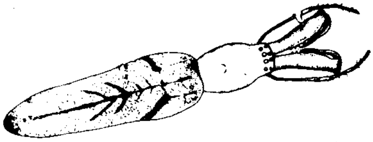

৩৯. **অর্ব মাকড়সা**

Argiopi catenulata

গোত্র : Aranideae

পরভোজী মাকড়সা।

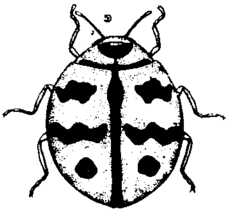

৪০. **লেডি বিটল**

Harmonia octomaculata

গোত্র : Coccinelideae

ধানের পোকার পরভোজী পোকা।

৪১. **জ্যাম্পিং মাকড়সা**

Fidipus sp.

গোত্র : Solticideae

পরভোজী মাকড়সা।

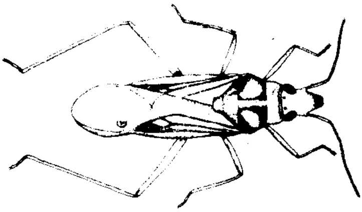

৪২. **মেসো ওয়াটার বাগ**

Mesovalia vitigera

গোত্র : Mesovalideae

সাধারণ পরভোজী পোকা।

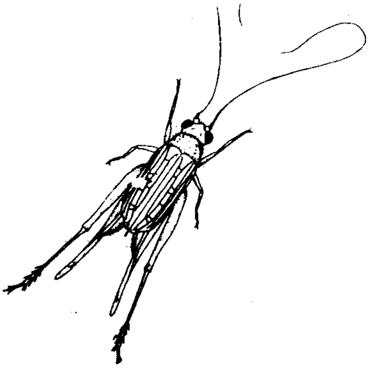

৪৩. **উরচুঙ্গা**

Metioche vitaticolis

গোত্র : Gryllideae

সাধারণ পরভোজী পোকা।

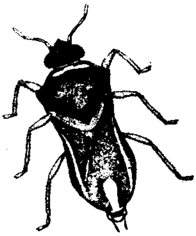

৪৪. **মাইক্রো ওয়াটার বাগ**

Microvalia doglasi

গোত্র : Valideae

সাধারণ পরভোজী পোকা।

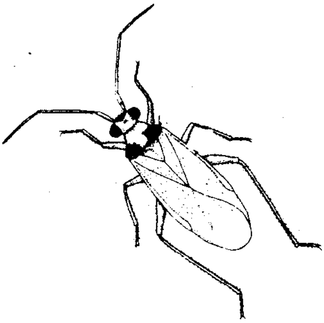

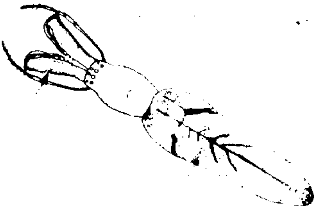

৪৫. **প্ল্যান্ট মিরিড বাগ**
Cirtorinus lividipenis
গোত্র : Mirideae
সাধারণ পরভোজী পোকা।

৪৬. **লম্বামুখী মাকড়সা**
Tetragonatha maxilosa
গোত্র : Tetragonathideae
পরভোজী মাকড়সা।

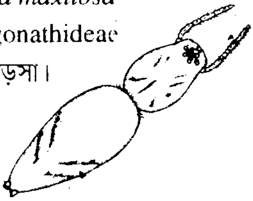

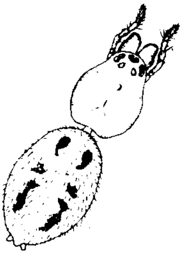

৪৭. **ডোয়ার্ফ মাকড়সা**
Atypena formosana
গোত্র : Linyphideae
পরভোজী মাকড়সা।

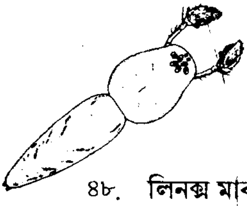

৪৮. **লিনক্স মাকড়সা**
Oxiopes javanas
গোত্র : Oxiopedeae
পরভোজী মাকড়সা।

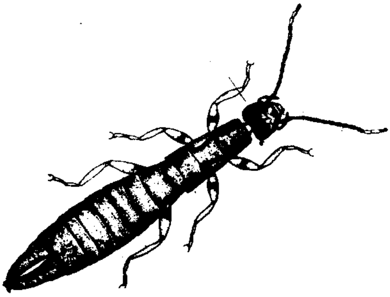

৪৯. **পিপড়া**
Solenopsis jeminata
গোত্র : Formicideae
পরভোজী পোকা।

৫০. **ইয়ারউইগ**
Euborelia stali
গোত্র : Carcinophorideae
পরভোজী পোকা।

দ্বাদশ অধ্যায়

ধানের রোগ দমন

ধান ফসল জীবাণুর সাহায্যে আক্রান্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ধানের উচ্চ ফলন পেতে হলে এসব রোগ নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

১। প্রকরণ ও দমন পদ্ধতি

ধানের প্রধান প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে : টুংরো (Tungro), ব্লাস্ট (Blast) রোগ, বাদামি দাগ রোগ, লাল রেখা (Nerrow stripe) রোগ, খোল ধসা (Sheath blight) রোগ, উফরা (Ufra) রোগ ইত্যাদি। এসব রোগ সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে।

এসব রোগে আক্রান্ত হলে ধানের কাণ্ড শিকড়, পাতা, থোড় ও দানা বিনষ্ট হয়ে ফলন কমে যায়। ধানের জমিতে রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করা যায়।

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা

১. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের চাষ : যেমন— চান্দিনা, দুলাভোগ, বিশাইল প্রভৃতি জাতে টুংরো রোগ কম হয়। মালা ও গাজী জাতে বাদামি দাগ রোগ কম হয়।

২. বীজ শোধন : যেমন— এগ্রোসান ওষুধ দিয়ে বীজ শোধন করলে পরবর্তীকালে রোগের আক্রমণ কম হয়।

৩. আগাছা দমন : যেমন— সুষ্ঠুভাবে আগাছা নিয়ন্ত্রণে টুংরো রোগের আক্রমণ কম হয়।

৪. পোকা দমন : যেমন— পাতা ফড়িং পোকা দমন করলে টুংরো রোগের প্রকোপ কমে যায়।

৫. সুষ্ঠু সার প্রয়োগ : যেমন— জমিতে ইউরিয়া, ফসফেট, পটাশ, জিপসাম ও দস্তাজাতীয় সার সুষমভাবে প্রয়োগ করলে রোগের আক্রমণ কম হয়।

রোগ দমনের কারিগরি পদ্ধতি

১. রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা।

২. জৈবিক দমন পদ্ধতি।

৩. পূর্ব ফসলের নাড়া পুড়ে ফেলা।

BAMSDOC Library Dhaka

রাসায়নিক পদ্ধতি

জমিতে রোগ দেখা দিলে রোগনাশক দ্রব্য প্রয়োগ করা। রোগনাশকের মধ্যে রয়েছে কিউপ্রাভিট ৫০ এবং হিনোসান ৫০ যথাক্রমে প্রতি শতকে ১৫ গ্রাম ও ৪ মিলিলিটার হারে প্রয়োগ।

২। মাঠ সমস্যা নিরূপণ

জমিতে ধানের চাষ করার পর ফসলে পোকা ও রোগের আক্রমণ এবং পুষ্টি ঘাটতি বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। তখন ধানের গাছ ও এর বিভিন্ন অংশ দেখে সমস্যা নিরূপণ করে প্রতিকার ব্যবস্থা

নিতে হয়। জমিতে পুষ্টি ঘাটতি সৃষ্টি হলে তাতে রোগ ও পোকানাশক ওষুধ দিয়ে লাভ হয় না। আবার ফসল রোগ ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে এর সঠিক সমস্যা নিরূপণে ব্যর্থ হয়ে বেশি পরিমাণ সার দিলে উল্টো আরও বেশি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। তাই এখানে ধানের রোগ-পোকা ও পুষ্টি নির্দেশনা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে, পুষ্টি ঘাটতির ক্ষেত্রে জমিতে সংশ্লিষ্ট কিরূপ সার প্রয়োগ করা হয়েছিল তা বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

১. ধানের কচি চারাগাছ আক্রান্ত	১১
২. বয়স্ক গাছ আক্রান্ত ২.১. পত্রফলক বেশি আক্রান্ত ২.২. সম্পূর্ণ চারা গাছ ঝলসানো	৯ ৩ ৬
৩. সাধারণ বিবর্ণতা পত্রফলকে দাগ	৪ ৫
৪. পাতা কমলা হলদে, নতুন পাতায় মোজাইক দাগ পাতা হলদে, গাছ খাটো, কুশির মতো গঠনের হয় নিচের পাতা বেশি হলদে পাতা হলদে, গাছ কিছুটা খাটো গাছ সবুজ, নিচের পাতার অগ্রভাগ হলদে-বাদামি গাছ গাঢ়, সবুজ খাটো পাতায় হলদে-বাদামি দাগ, পাতার মধ্যে শিরা সাদা	টুংরো দাগ হলদে চেঁটে নাইট্রোজেনের অভাব গন্ধকের অভাব পটাশিয়ামের অভাব ফসফরাসের অভাব দস্তার অভাব
৫. পাতায় দাগ, দাগের কেন্দ্র ধূসর ও কিনারা বাদামি দাগ গোলাকার দাগ ডিম্বাকার পাতার আগা ও কিনারা শুকনো পাতার শিরা বরাবর লালচে দাগ	বাদামি দাগ পাতা ব্লাস্ট পাতা ধসা রোগ পাতার লালচে রেখা রোগ
৬. পাতা ঝলসানো, মাঝে মাঝে মৃত চারার গঠন অস্বাভাবিক	চারা ধসানোর ৭
৭. আক্রান্ত চারা লম্বা হলদে বর্ণ	বাদামি রোগ
৮. চারার গোড়া পঁচা, দুর্গন্ধ, ছাতা গুঁটি আছে	গোড়া পঁচা/কৃসেক রোগ
৯. পত্রফলকে দাগ গাছের বিভিন্ন অংশ আক্রান্ত	১০ ১১
১০. পাতার দাগ আগা থেকে শুরু ডিগ পাতার আগায় দাগ শুরু পাতার মাঝখানে দাগ শুরু	পাতা ধসা রোগ পাতা ফোসকা রোগ ৫
১১. গাছের কাণ্ড আক্রান্ত ১১.১ পানি স্তর বরাবর দাগ ও পচন ১১.২ গাছে গোড়া ও ফলে পঁচন ও দুর্গন্ধ	কাণ্ড পঁচা রোগ গোড়া পঁচা রোগ
১২. শীষের গোড়া আক্রান্ত	শীষ ব্লাস্ট

ধানের রোগ সমস্যা ও সমাধান

১) ছত্রাকঘটিত রোগ ২) ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ
৩) কৃমিঘটিত রোগ ৪) ভাইরাসজনিত রোগ
৫) অপুষ্টিজনিত রোগ

৩। ছত্রাকজনিত : বাদামি দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক — *Dreschlera oryzae*

রোগের বাহক : বীজ, মাটি, রোগাক্রান্ত খড়, নাড়া ও বাতাস।

রোগের লক্ষণ : এ রোগ পাতাতে দেখা দেয় ; তবে বীজের খোসা, খোল ও ছড়ার শাখা-প্রশাখায়ও হতে পারে। পাতায় প্রথমে ছোট বাদামি দাগ হয়। দাগের মাঝখানটা অনেক সময় সাদাটে ও কিনারা বাদামি রঙের হয় । অনেকগুলো দাগ একত্রে মিশে একটি বড় দাগের সৃষ্টি করে।

রোগের পরিবেশ

১. আক্রমণপ্রবণ জাতের ধান চাষ করা ;
২. মাটিতে পটাশ সার কম হওয়া।
৩. বীজ রোগক্রান্ত থাকা।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. বিপ্লব, ব্রিশ্যাইল, প্রগতি, মুক্তা, প্রভৃতি জাতে ধান চাষ করা ;
২. সুস্থ বীজ বপন করা ;
৩. বীজ ৫০^0 সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৩০ মিনিটের জন্য গরম পানিতে শোধন করা ;
৪. জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ পটাশ সার ব্যবহার করা।

৪। ব্লাস্ট রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক – *Piricularia oryaze*

রোগের বাহক : বীজ, বাতাস ও পোকা।

রোগের লক্ষণ : ব্লাস্ট রোগ ধান গাছের তিনটা অংশে অক্রমণ করে। সে অনুসারে এ রোগকে পাতা ব্লাস্ট, গিঁট ব্লাস্ট ও শীষ ব্লাস্ট বলা হয়।

পাতা ব্লাস্ট : চারা অবস্থায় ধানের পাতা আক্রান্ত হয়। প্রথমে পাতায় ছোট ছোট ডিম্বাকৃতির দাগ সৃষ্টি করে। পরে এ দাগ দু'প্রান্তে লম্বা হয়ে চোখের আকৃতি ধারণ করে। দাগের চারদিকের প্রান্ত গাঢ় বাদামি রঙের হয় এবং মধ্যভাগ সাদা ছাই রঙের দেখায়।

গিঁট ব্লাস্ট : গাছে থোড় বের হবার আগে থেকেই দেখা দেয়। এ অবস্থায় ছত্রাক গাছের কাণ্ডের গিঁটে এবং খোল ও পাতার সংযোগস্থলে আক্রমণ করে কালো দাগ সৃষ্টি করে। কালক্রমে আক্রান্ত গিঁটের উপরের অংশ ভেঙে ঝুলে পড়ে।

শীষ ব্লাস্ট : শীষের গোড়ায় কালো দাগের সৃষ্টি করে। এতে বীজ চিটা বা অপুষ্ট হয়। মাঠে এমনি অনেক শীষ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়।

রোগের অনুকূল পরিবেশ

১. ধান আক্রমণপ্রবণ জাতের হওয়া ;
২. মাটি বেলেজাতীয় ও শুকনো থাকা ;
৩. মাটিতে পটাশ সার কম ও ইউরিয়া সার (নাইট্রোজেন) বেশি হওয়া ;
৪. আবহাওয়া রাতে ঠাণ্ডা, দিনে গরম ও সকালে পাতায় শিশির বেশি পড়া ;

প্রতিকার ব্যবস্থা

৫. ওষুধ প্রয়োগে দমন যেমন— বেনলেট, টপসিন-মিথাইল, হিনোসান ইত্যাদি প্রতি হেক্টরে ২.৫ কেজি ছিটানো ;
৬. জমি শুকনো না রাখা,
৭. ইউরিয়া কম এবং পটাশ সার বেশি ব্যবহার করা ;
৮. সুস্থ গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করা ;
৯. হোমাই নামক ওষুধ ১ লিটার পানিতে ৩ গ্রাম ওষুধ মিশিয়ে ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজ শোধিত হয়।

৫। ফল্‌স স্মার্ট রোগ (False smut)

রোগের কারণ : ছত্রাক— *Ustilaginoidea virense*

রোগের লক্ষণ : লক্ষীর গু চিনতে অসুবিধা হয় না। এ রোগ বীজে দুধ অবস্থার সময় হতে দেখা দেয়। একটি ছড়ার ২টি থেকে ৪টি বীজকে ছত্রাকটি একটি সবুজ সোনালি রঙের 'বলের' ন্যায় করে ফেলে যা দূর থেকে স্পষ্টভাবেই শনাক্ত করা যায়। এ বলটি একটি পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে, তবে বাড়ার সাথে সাথে পর্দাটি ফেটে যায় এবং অসংখ্য ছোট ছোট স্পোর বাতাসের সাথে উড়ে যায়।

আক্রমণের অনুকূল অবস্থা

১. বীজ রোগাক্রান্ত থাকা ;
২. ধান আক্রমণপ্রবণ যেমন— পাজাম, বালাম, বিআর ৭, লাল, চিকন ইত্যাদি জাতের হওয়া ;
৩. আবহাওয়া আর্দ্র থাকা।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. সুস্থ গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করা ;
২. আক্রমণরোধী জাতের ধান লাগানো ;
৩. শীষ বের হবার সময় রাসায়নিক ওষুধ যেমন বেনলেট, টপসিন-মিথাইল প্রতি হেক্টরে ২ থেকে ৩ কেজি প্রয়োগ।

৬। গোড়া পঁচা বা বাকানি রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক *Fusariam moniliformae*

রোগের বাহক : বীজ, মাটি, পানি ও বাতাস।

রোগের লক্ষণ : এ রোগের দু'রকম লক্ষণ দেখা দেয়। প্রথমটি গোড়া পচা ও দ্বিতীয়টি বাকানি। গোড়া পচা হলে গাছের গোড়ায় পচন ধরে। প্রথম অবস্থায় বাকানি হলে গাছ অন্যান্য

গাছের তুলনায় প্রায় ২ থেকে ৩ গুণ বেশি লম্বা ও চিকন হয়। দেখতে হাল্কা সবুজ রঙের ও দুর্বল মনে হয়। এ রোগ চারা অবস্থায় বীজতলায় বা রোপা জমিতে সাধারণত দেখা যায়। বাংলাদেশে সকল মৌসুমেই এ রোগ হয়, তবে আউশ মৌসুমে কিছুটা বেশি হয়।

রোগের অনুকূল পরিবেশ

১. আক্রমণপ্রবণ জাতের ধান চাষ করা ;
২. মাটিতে রোগজীবাণু থাকা ;
৩. রোগাক্রান্ত বীজ ব্যবহার।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. বিপ্লব, ব্রিশাইল, প্রগতি, মুক্তা, ইত্যাদির চাষ করা ;
২. বীজ শোধন করা, যেমন— ১ ভাগ হোমাই ওষুধ ১০০০ ভাগ পানিতে মিশিয়ে বীজ এক রাত ভিজিয়ে রেখে বপন করা ;
৩. মাঠে বাকানি দেখা দিলে জমি থেকে তুলে সে স্থানে অন্য সুস্থ গাছ লাগানো।

৭। চারা পোড়া (Seedling blight) বা ঝলসানো রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক *Sclerotium rolfsie*

রোগের বাহক : আক্রান্ত নাড়া, আগাছা ও পচা আবর্জনা।

রোগের লক্ষণ : বীজ অঙ্কুরিত হবার পর চারা ধীরে ধীরে শুকিয়ে মরে যেতে পারে বা পরবর্তীকালে পুড়ে যাবার মতো মনে হয়। শিকড় এবং চারার গোড়ার দিকটা কালচে রঙের হয় এবং অনেক সময় ছত্রাক বাড়ার জন্য সাদাটেও দেখায়। রোগাক্রান্ত চারা দূর হতে হলদে দেখায় এবং পাতা কুঁচকে যাওয়ার মতো মনে হয়।

রোগের পরিবেশ

১. ধানগাছ আক্রমণপ্রবণ জাতের হলে ;
২. মাটিতে ছত্রাক গুটিকা থাকলে ;
৩. গরম ও আর্দ্র আবহাওয়া হলে।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. প্রতি কেজি বীজে ২ থেকে ৪ গ্রাম ব্রাসিকল বা ভিটাভেক্স থিরাম দিয়ে বীজ শোধন করে বোনা ;
২. রোগ দেখা দিলে জমি বা বীজতলা পানিতে কিছু দিন ডুবিয়ে রাখা।

৮। চারাধসা (Seedling/Damping off)

রোগের কারণ : ছত্রাক *Aclis* sp.

রোগের বাহক : বীজ অঙ্কুরিত হবার সময় যদি বীজতলা পানিতে ডুবে থাকে এবং আবহাওয়া যদি ঠাণ্ডা বা শীতল হয় তা হলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

রোগের লক্ষণ : অঙ্কুরিত বীজ পঁচে যায় এবং তার চারপাশে খয়েরি ছত্রাককাণ্ড লেগে থাকে। অঙ্কুরিত হবার পরও বীজ ছত্রাককাণ্ড দেখা যায় এবং তখন চারা ধীরে ধীরে ধসে পড়ে। বীজতলায় মরিচা পড়া লক্ষণ দেখায়।

রোগের পরিবেশ

১. ধান আক্রমণপ্রবণ জাতের হওয়া ;
২. মাটিতে ছত্রাক কাণ্ড বা জুস্পোর (zoospore) থাকা ;
৩. আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকা ;
৪. বীজতলা বীজ অঙ্কুরিত হবার সময় পানিতে ডুবে থাকা।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. বীজ শোধন করে বপন করা (প্রতি কেজি বীজে ৪ গ্রাম ক্যাপটান অথবা ১ গ্রাম তুঁতে অথবা ২ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড ভালোভাবে মিশিয়ে শোধন করা)।
২. বোরো মৌসুমে আক্রমণপ্রবণ জাত লাগানো হতে বিরত থাকা।

৯। পাতার সরু বাদামি দাগ (Narrow brown leaf spot) **রোগ**

রোগের কারণ : ছত্রাক— *Cercospora orygae*

রোগের বাহক : বীজ, আক্রান্ত খড়, নাড়া, আগাছা ও বাতাস।

রোগের লক্ষণ : এ রোগ প্রধানত পাতায়ই দেখা যায়। তবে পাতার খোলে, বীজের বোঁটায় এবং বীজেও হতে পারে। পাতায় সরু বাদামি দাগ পড়ে। ফলে পাতা শুকিয়ে মরে যায়। এ রোগ বয়স্ক গাছে বেশি দেখা যায়।

আক্রমণের অনুকূল অবস্থা

১. ধান আক্রমণপ্রবণ জাতের হওয়া ;
২. আবহাওয়া গরম ও আর্দ্র থাকা।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. আক্রমণরোধী জাতের চাষ ;
২. খড়, নাড়া পোড়ানো ;
৩. সুস্থ বীজের ব্যবহার।

১০। খোলপোড়া বা খোল ঝলসানো রোগ (Sheath blight)

রোগের কারণ : ছত্রাক — *Rhizoctonia solani*

রোগের বাহক : ছত্রাক গুটি বা স্ক্লেরোশিয়ামময় মাটি, রোগাক্রান্ত নাড়া, খড় এবং পানি। এ রোগে গাছ প্রাথমিকভাবে পানিতে ভাসমান ছত্রাক গুটিকা দিয়ে আক্রান্ত হয়।

রোগের লক্ষণ : প্রথমে ছোট গোলাকার ও লম্বাটে ধরনের ধূসর রঙের দাগ পড়ে এবং তা বড় হয়ে সমস্ত খোল ও পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। দাগগুলোর কেন্দ্রস্থল খয়েরি রঙ ও বাদামি রঙের হয়। গাছ পোড়া বলে মনে হয় ও বসে যায়। এজন্য জমিতে মাঝে মাঝে গোলাকার বসে যাওয়া এলাকা দেখা দেয়।

রোগের অনুকূল পরিবেশ

১. আক্রমণপ্রবণ জাতের ধান লাগানো হলে ;
২. চারা বেশি ঘন লাগালে রোপণ দূরত্ব কম হলে (১০×১০ বা ১০×১৫ সেন্টিমিটার) ;

৩. ইউরিয়া সার বেশি দিলে ;
৪. আবহাওয়া গরম ও আর্দ্র হলে।

রোগের প্রতিকার ব্যবস্থা

১. ব্রিশাইল, সুফলা, প্রগতি ও মুক্তা এবং দেশী জাতের ধান চাষ করা ;
২. চারা কিছুটা দূরে দূরে লাগানো (২৫×২০ বা ২৫×১৫ সেন্টিমিটার) ও প্রতি গোছায় ২ থেকে ৪টি চারা লাগানো ;
৩. সুষম সার ব্যবহার করা এবং ইউরিয়া বেশি না দেয়া ;
৪. রোগ দেখা দিলে জমির পানি শুকিয়ে ফেলা এবং পরে আবার পানি দেয়া ;
৫. বেনলেট, হোমাই বা টপসিন-মিথাইল প্রতি হেক্টর ২ থেকে ৩ কেজি ;
৬. ধান কাটার পর রোগাক্রান্ত গাছের নাড়া জমিতে ছড়িয়ে ফেলা।

১১। কাণ্ডপচা (Stem rot) রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক— *Sclerotium orygae*

রোগের বাহক : মাটি, রোগাক্রান্ত নাড়া-খড় ও পানি। জমিতে পানি দেয়ার পর জীবাণু পানির উপর ভেসে আসে ও কুশিতে লেগে সেখানে আক্রমণ রচনা করে।

রোগের লক্ষণ : কুশি গজানোর শেষ অবস্থায় মাঠে দেখা দেয়। প্রথমে কুশির বহিঃখোলে কালো দাগ দেখা যায়। পরে এ দাগ ভিতরের খোলে ও কাণ্ডে প্রবেশ করে। পরবর্তী সময়ে কাণ্ড চিড়লে কালো গোলাকার দানা দেখা যায়। কাণ্ডকে পচিয়ে দেয় বলে গাছ ঢলে পড়ে। ফলে ধান চিটা ও অপুষ্ট হয়।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. বিপ্লব, ব্রিশাইল, আশা, প্রগতি, মুক্তা, প্রভৃতি জাতের ধান চাষ করা ;
২. রাসায়নিক ওষুধ যেমন— বেনলেট/ ফুন্ডাজল, হোমাই, টপসিন-মিথাইল প্রতি হেক্টরে আড়াই কেজি ২ বার শীষ গজানো ও থোর অবস্থায় ছিটিয়ে দেয়া ;
৩. রোগ দেখা দিলে জমির পানি শুকিয়ে পরে আবার পানি দেয়া ;
৪. জমিতে কম ইউরিয়া ও বেশি পটাশ সার ব্যবহার করা ;
৫. রোগাক্রান্ত জমির খড় ও নাড়া ধান কাটার পর জমিতে পুড়ে ফেলা।

১২। পাতাফোস্কা (Leaf scald) রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক—*Gerlachia oryzae or Rhimecosporium oryzae*

রোগের বাহক : বাতাস, পোকামাকড় ও বীজ।

রোগের লক্ষণ : থোড় অবস্থায় মাঠে দেখা দেয়। প্রথমে ডিগ পাতার আগায় শুরু হয়। দাগ খুব ধীরে ধীরে বাড়ে এবং আগা থেকে নিচের দিকে নামে।

আক্রমণের অনুকূল পরিবেশ

১. ধান আক্রমণপ্রবণ জাতের হওয়া ;
২. আবহাওয়া আর্দ্র থাকা ;

৩. জমিতে ইউরিয়া সার বেশি দেওয়া ;
৪. রোগাক্রান্ত জমির বীজ ব্যবহার করা।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. বিপ্লব, ব্রিশাইল, আশা, মুক্তা, সুফলা ইত্যাদি কম আক্রমণপ্রবণ জাতের ধান চাষ করা;
২. ইউরিয়া সার কম ব্যবহার করা ;
৩. রোগ দেখা দিলে কিছুদিনের জন্য জমি শুকিয়ে রাখা।

১৩। খোলপচা (Sheath rot) রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক— *Cesocladium oryzae*

রোগের বাহক : বাতাস, আক্রান্ত পাতা, পোকামাকড় ও বীজ।

রোগের লক্ষণ : গাছের ডিগ পাতার থোড় অবস্থায় দেখা যায়। প্রথমে খোলে ছোট ছোট বাদামি দাগ হয়। দাগগুলো ধীরে ধীরে বেড়ে একত্রে মিশে সম্পূর্ণ খোলকে ঘিরে ফেলে। অনেক সময় শীষ অর্ধেক বের হতে পারে বা একেবারেই বের হতে পারে না।

রোগের অনুকূল পরিবেশ

১. গাছ আক্রমণপ্রবণ জাতের হওয়া ;
২. জমিতে নাইট্রোজেন বা ইউরিয়া সার অতিরিক্ত ব্যবহার করা ;
৩. আবহাওয়া গরম ও আর্দ্র থাকা ;
৪. রোগাক্রান্ত বীজ বপন করা ;

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. বিপ্লব, প্রগতি, মুক্তা, দেশী জাতের ব্যবহার ;
২. জমিতে ইউরিয়া সার কম ব্যবহার করা ;
৩. জমির পানি শুকিয়ে কিছুদিন পর পানি দেয়া।

১৪। ব্যাকটেরিয়াজনিত : পাতাপোড়া

পাতা পোড়া বা পাতা ঝলসানো (Bacterial leaf blight) রোগ

রোগের কারণ : ব্যাকটেরিয়া *Xanthomonas campestris*

রোগের বাহক : পোকা, বাতাস ও সেচের পানি।

রোগের লক্ষণ

১. **চারা গাছ :** এ রোগ চারায় এবং বয়স্ক গাছে ভিন্ন লক্ষণ সৃষ্টি করে। চারা অবস্থায় একে চারাপচা (কৃসেক) এবং বয়স্ক অবস্থায় একে পাতাপোড়া রোগ বলে। কৃসেক রোগ হলে চারার বাইরের পাতা শুকিয়ে খড়ের রঙ ধারণ করে। চারাটি গোড়ার দিকে ভেঙে দু'আঙুল দিয়ে চাপ দিলে পুজের মতো দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ বের হয়।

২. **বয়স্ক গাছ :** বয়স্ক গাছে ছোট ছোট দাগ দেখা দেয়। এ দাগগুলো ধীরে ধীরে বড় হয়ে পাতার দু'প্রান্ত দিয়ে নিচের দিকে অগ্রসর হয়। পরে সম্পূর্ণ পাতাটি আক্রান্ত হয়ে গেলে তা ধূসর বাদামি বর্ণে পরিণত হয়ে ঝলসানো বা পাতাপোড়া বলে মনে

হয়। রোগ সমস্ত জমিতে ছড়িয়ে পড়লে পুড়ে গেছে বলে মনে হয়। রোগপ্রবণ জাত, পূর্বাচী, আইআর ৮ ইত্যাদি।

রোগের অনুকূল পরিবেশ

১. গাছ আক্রমণপ্রবণ জাতের হওয়া ;
২. ইউরিয়া সার বেশি দেওয়া ;
৩. চারা উঠানোর সময় শিকড়ে ক্ষত হওয়া ;
৪. উচ্চ তাপমাত্রা ও বাতাসে অত্যধিক আর্দ্রতা থাকা ;
৫. ঝড়ো হাওয়ার ফলে পাতায় ক্ষত থাকা।

রোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা

১. রোগ কম হয় এমন জাত যেমন– বিপ্লব, চান্দিনা, ব্রিশাইল, প্রগতি, মুক্তা ইত্যাদি লাগানো ;
২. ইউরিয়া সার প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবহার না করা ;
৩. রোগ দেখা দিলে জমির পানি শুকিয়ে ৭ থেকে ১০ দিন পর আবার পানি দেয়া।
৪. ধান কাটার পর জমিতে নাড়া ও খড় পুড়ে ফেলা।

১৫। লালচে রেখা (Bacterial leaf streak) রোগ

রোগের কারণ : ব্যকটেরিয়াম— *Xanthomonas campestris*

রোগের বাহক : পোকা, বাতাস, বীজ, পানি, মাটি, খড় ও নাড়া।

রোগের লক্ষণ : পাতায় শিরা বরাবর রেখা দেখা দেয়। রেখাগুলো প্রথমে চিকন ও ছোট হয়। দেখতে হাল্কা রঙের, সূর্যের দিকে ধরলে দাগগুলোর ভিতর দিয়ে আলো দেখা যায়। পরে সমস্ত পাতা আক্রান্ত হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত পাতাগুলো পরে কমলা হলদে রঙের দেখায়।

রোগের অনুকূল পরিবেশ

১. আক্রমণপ্রবণ জাতের ধান গাছ লাগানো ;
২. চারা ও কুশি অবস্থায় ঝড়োহাওয়া বা ঝড়োবৃষ্টি হওয়া ;
৩. পোকা দ্বারা পাতায় ক্ষত থাকা ;
৪. আশেপাশে রোগাক্রান্ত গাছ থাকা ;
৫. ইউরিয়া সার বেশি দেওয়া।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. ব্রিশাইল, আশা, সুফলা, প্রগতি, মুক্তা, ময়না, গাজী, মোহিনী ও শাহীবালাম ধান চাষ করা ;
২. পোকার সাহেয্যে পাতায় যেন ক্ষত হতে না পারে সেজন্য জমিতে পোকা দমন করা।

১৬। কৃমিজনিত রোগ : উফ্‌রা বা ডাক পোড়া রোগ

রোগের কারণ : কৃমি— *Detylenchus angustus*

রোগের বাহক : পানি, মাটি, রোগাক্রান্ত নাড়া ও খড় সেচের পানির সাথে বা আষাঢ়ী পানির সাথে ভেসে এরা এক গাছ থেকে অন্য গাছে আক্রমণ করে।

রোগের লক্ষণ : এ কৃমি ধানগাছের আগার কচি অংশের রস শুষে খায়, ফলে লক্ষণ পাতার গোড়ায় সাদা দাগের ন্যায় দেখা দেয়। সাদা দাগ ক্রমে বাদামি রঙের হয়। ফলে অনেক সময় থোড় হতে ছড়া বের হতে পারে না বা বের হলেও আংশিক বের হয়। তবে ধান অপুষ্ট হয়। ছড়া বের হতে না পারলে তা ভিতরে মোচড়ানো অবস্থায় থাকে। এ রোগ সাধারণত জলী আমন ধানে বেশি হয়।

রোগের অনুকূল পরিবেশ

১. ধান গাছ আক্রমণপ্রবণ জাতের হওয়া ;

২. যেসমস্ত এলাকায় অতীতে উফরা রোগ হয়েছে এসব এলাকায় জমিতে ধান লাগানো।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. রায়দা এবং বাজাইল ধান পরপর কয়েকবার চাষ করা।

২. রোগাক্রান্ত জমির ফসল কাটার পর নাড়া ও খড় জমিতে পুড়ে ফেলা।

৩. ফুরাডান ৩ জি নামক দানাদার ওষুধ হেক্টর প্রতি ৩৩ কেজি হিসেবে কিউরেটর বা মেক–আপজাতীয় ওষুধ ও ব্যবহার করা যেতে পারে ;

৪. বছরের প্রথম বৃষ্টির পর জমি চাষ দিয়ে ১৫ থেকে ২০ দিন ফেলে রাখা।

৫. ধানের আগার অংশ যেখানে কৃমি বেশি থাকে সে অংশ কেটে পুড়ে ফেলা।

১৭। ভাইরাসজনিত : টুংরো রোগ

রোগের কারণ : ভাইরাস — রাইস টুংরো ভাইরাস

রোগের বাহক : সবুজ পাতাফড়িং *Nephotettix virense* রোগের বিস্তার খুব দ্রুত।

রোগের লক্ষণ : চারা অবস্থায় এ রোগের আক্রমণ শুরু হয়।

প্রথমে পাতায় শিরা বরাবর হাল্কা হলদে রেখা দেখা দেয়।

পরে পাতার উপর দিক থেকে ২–৩ দিনের মধ্যে সমস্ত পাতা কমলা রঙের হয়ে যায়।

কুশি কমে যায়। গাছ দুর্বল হয়, তাই গাছ টান দিলেই উঠে যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করা যেমন– ব্রিশাইল, প্রগতি, ইরিশাইল, লতিশাইল।

২. কীটনাশক দিয়ে বাহক পোকা দমন করা।

ধানের অপুষ্টিজনিত রোগ দমন

১। নাইট্রোজেনের অভাবজনিত রোগ/লক্ষণ

এ মৌলের অভাবে গাছ প্রথমে হাল্কা সবুজ রঙের ও পরে হলদেটে হয়। গাছ খাটো হয় এবং কুশি গজানো বন্ধ হয়ে যায়। গাছ দেখতে অনেকটা টুংরো রোগের লক্ষণের মতো মনে হয়, কিন্তু টুংরো রোগ হলে বেশ কিছু সংখ্যক গাছ মারা যাওয়ায় জমিতে খুব ফাঁক ফাঁক অবস্থায় গাছগুলো অবস্থান

করতে দেখা যায় ; আর নাইট্রোজেনের অভাব হলে সারা মাঠের গাছে সমভাবে এ লক্ষণ দেখা দেয়।

প্রতিকার ব্যবস্থা : এ অবস্থা দেখা মাত্র জমিতে ইউরিয়া সার ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে জমিতে সেচ দিয়ে ভিজিয়ে রাখলে ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে এ অভাব দূর হয়ে যায়।

২। ফসফরাসের অভাবজনিত রোগ/লক্ষণ

রোগের কারণ : মাটিতে গ্রহণযোগ্য ফসফরাস বা ফসফেটের অভাব থাকলে এবং মাটিতে ক্ষারত্ব বা অম্লত্ব খুব বেশি হলে গাছে ফসফরাসের অভাব হয়। আবার অনুর্বর কাঁকরময় লাল মাটিতে ফসফরাসের অভাব দেখা দেয়।

রোগের লক্ষণ : ফসফরাসের অভাবে ধান গাছ গাঢ় সবুজ ও খাটো, পাতা চিকন ও ছোট হয়। নতুন পাতা পুরানো পাতার চেয়ে সতেজ দেখায়।
পুরানো পাতা বাদামি রঙের হয়।

প্রতিকার ব্যবস্থা : ফসফরাসের অভাব দেখা দিলে জমিতে ফসফরাসজাতীয় সার, যেমন— সুপার ফসফেট বা ট্রিপল সুপার ফসফেট হিসেবে ব্যবহার।

৩। পটাসিয়ামের অভাবজনিত রোগ/লক্ষণ

ক্ষার মাটি, কাঁকরময় লাল মাটি, অম্লমাটি আবার জমির উপরিভাগের মাটি সরিয়ে নিলেও পটাশের অভাব দেখা দেয়।

লক্ষণ : গাছের বাড়-বাড়তি ও কুশির সংখ্যা কমে যায়।
পাতা ছোট হয়ে নেতিয়ে পড়ে, কেবল গাঢ় সবুজ রঙের হয়।
বয়স্ক পাতায় শিরার মধ্যবর্তী স্থানে পাতার আগা থেকে ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।
পটাসিয়ামের অভাব হলে পাতার বাদামি দাগ রোগ বেশি হয়।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. পটাশ সার ব্যবহার করলে এর অভাব দূর হয়ে যায়। জমিতে প্রতি হেক্টরে ৭০ থেকে ৯০ কেজি এমপি সার জমি তৈরির সময় দেয়া।
২. ধান কাটার পর নাড়া শুকিয়ে জমিতে পুড়ে ফেললে পটাসিয়ামের অভাব অনেকটা দূর হয়।

৪। গন্ধকের অভাবজনিত রোগ

জমির মাটিতে উপর্যুপরি ধান চাষের ফলে গন্ধকের অভাব দেখা দেয়। জমির উপরিভাগের মাটি সরিয়ে ফেললে কখনও গন্ধকের অভাব হয়।

জমিতে জৈব সার কম ব্যবহার করার ফলেও গন্ধকের অভাব দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ : অভাব হলে বীজতলায় চারা হলদেটে হয়ে যায়।
চারার বাড়-বাড়তি কমে যায়। পাতা ছোট হয়।
কুশির সংখ্যা কমে যায়। ধান দেরিতে পাকে।
চিটা ও অপুষ্ট ধান বেশি হয়।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. ধানের দুটি মৌসুমের মধ্যবর্তী সময়ে জমি ভালভাবে শুকিয়ে ফেলা ;
২. প্রতি হেক্টরে ১০০ কেজি হিসেবে জিপসাম ব্যবহার করা।

৫। দস্তার অভাবজনিত রোগ বা লক্ষণ

যেসব জমিতে মাটির ক্ষারত্ব বেশি, সারাবছর জমি ভেজা বা জলাবদ্ধ থাকে ও এ অবস্থাতেই দস্তার অভাব থাকে, যেসব মাটিতে জৈব পদার্থ খুব বেশি বা ফসফেট সার বেশি ব্যবহার করা হয়েছে সে সমস্ত জমিতে ধানগাছে দস্তার অভাব দেখা দেয়।

লক্ষণ : গাছে নতুন পাতার গোড়ার দিকে এবং মধ্যশিরার দু'কিনারা দিয়ে সাদাটে রঙ হয়। পুরানো পাতায় মরিচা রঙের মতো হয় ও পরে কমলা হলদে রঙ হয়।
ফলে মাঠ মরিচা রঙ ধারণ করে। মাঠে চারার বাড়–বাড়তি অসমান হয়।
নিচু জায়গায় চারা বসে যায়।
ধান পাকতে দেরি হয় বা ফলন কম হয়।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. দস্তার অভাব দেখা দিলে জমি পুরাপুরি শুকিয়ে নেওয়া। তবে তার সাথে জিঙ্ক সালফেট প্রতি ৭ থেকে ৮ কেজি ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া।
২. চারা অবস্থায় শতকরা ০.৫ ভাগ জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ প্রয়োগ।
৩. দুই মৌসুমের মধ্যবর্তী সময়ে জমি ভালভাবে শুকিয়ে চাষ দেওয়া।

৬। ধান পাকার লক্ষণ

ধান পাকার উপযুক্ত সময়ে ধান কাটলে ফসলের অপচয় কম হয়। ধান পাকার প্রধান প্রধান লক্ষণ হলো :

ক) কোনো শীষের উপরের অর্ধেক দানার ৮০% শক্ত হয়।
খ) শীষের নিচের অর্ধেক দানার ২০% শক্ত হয়।

উপর্যুক্ত সময়ে ধান কাটার সুফল হয়– এতে অপচয় কম হয় ; কারণ—

ক) দানা ঝরে পড়ে না।
খ) পাখি দানা খাওয়ার সুযোগ কম পায়।
গ) শীষকাটা লেদাপোকা ক্ষতি কম করতে পারে।

উচ্চ ফলনশীল ধানের ক্ষেত্রে ধান পাকার পরও পাতার অংশবিশেষ সবুজ থাকতে পারে। তবে ধান সোনালি রঙ ধারণ করে। শীষের মাথা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। কোনো কোনো ধানগাছও হেলে পড়তে পারে।

প্যাডেল থ্রেশার দিয়ে ধান মাড়াই করলে ধান গাছের গোড়ায় কেটে ছোট ছোট আঁটি বাঁধতে হয়। অন্যথায় গাছের মাঝামাঝি ধান কাটলেই চলে। ধান রাখার জায়গা না থাকলে শুকনো দিনে ধান কাটাই ভাল।

৭। ধানের ফলন নির্ণয়

ধান পেকে যাওয়ার পর কেটে মাড়াই ঝাড়াই করার আগেই এর আনুমানিক ফলন নির্ণয় করা যায়। ধানের ফলন নির্ণয়ের সূত্র হলো :

কোনো জমিতে ৩টি স্থানে দৈবচয়ন করে সেখান থেকে ৩টি হিসেবে নিয়ে গড় করে ধানের ফলন নির্ণয় করা যায়।

বর্গমিটারে শীষ সংখ্যা × ১০টি শীষের ধানের সংখ্যা × ২৫ × ৪০

$$\text{ফলন নির্ণয় সূত্র ধানের ফলন} = \frac{\text{কেজি/সের}}{১০০ \times ১০০০ \times ১০}$$

উদাহরণ : ১০ × ১৮০০ × ২৫ × ৪০

$$\text{শতকে ধানের পরিমাণ} = \frac{১০ \times ১৮০০ \times ২৫ \times ৪০}{১০০ \times ১০০০ \times ১০} = ১৮ \text{ কেজি}$$

ধান কাটার পর যথাশীঘ্র মাড়াই করতে হয়। তারপর শুকিয়ে গোলায় রাখতে হয় বা শুকনো স্থানে রাখতে হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

গম চাষ

১। ভূমিকা

বৃটিশ আমলে তদানীন্তন বাংলায় ১৯৪৩ সালে ভয়ানক দূর্ভিক্ষ হয়। এ দূর্ভিক্ষের পর অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানের মাধ্যমে বাংলায় গম চাষের পরিকল্পনা নেয়া হয়। তবুও নানা কারণে এখানে গম চাষ তেমন প্রসার লাভ করে নাই। সত্তর দশক থেকে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা ও কুমিল্লা এলাকায় গম চাষ শুরু হয়।

ষাটের দশকের গোড়ার দিকে আন্তর্জাতিক গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত বেশ ক'টি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পরীক্ষার জন্য এদেশে আঁনা হয়। ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ এ তিন বছর পরীক্ষা করে দেখা যায় জাতগুলোর গড় ফলন আমাদের দেশে প্রচলিত জাত অপেক্ষা অনেক বেশি।

স্বাধীনতার পরপরই যে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় তা পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে খাদ্য ঘাটতি পরিপূরণ করে। আমদানির বেশিরভাগ ছিল গম।

বিজ্ঞানীগণ নিশ্চিত ছিলেন যে, এসব উন্নত প্রযুক্তি যথাযথ প্রয়োগ করে বাংলাদেশের চাষী গম আবাদ করে বেশ লাভবান হতে পারবেন।

১৯৭৪ সালে সরকারি পর্যায়ে গম আবাদের একটি পরিকল্পনা নেয়া হয় এবং সোনালিকা (কল্যাণসোনা) জাতের বীজ আমদানি করে চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। প্রথম বছর প্রায় ৮০,০০০ হেক্টর জমিতে উচ্চ ফলনশীল জাতের গম আবাদ হয়।

পরবর্তী বছরগুলোতে আবাদ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৪ সালে প্রায় সাত লাখ হেক্টর জমিতে গম চাষ করা হয়। এভাবে বাংলাদেশ একটি চাল উৎপাদনকারী দেশ হতে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্রে গম উৎপাদনকারী দেশ হিসেবেও স্থান লাভ করে।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমাণ জমিতে গম আবাদ হচ্ছে তার প্রয়োজনীয় সবটুকু বীজ দেশে উৎপাদিত হচ্ছে। প্রায় ৮০ ভাগ বীজ কৃষক কর্তৃক উৎপাদিত ও সংরক্ষিত হচ্ছে এবং বাকি ২০ ভাগ বীজ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন সরবরাহ করে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে ১৯৯৬–১৯৯৭ সালে প্রায় ৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে ১৪.৫ লক্ষ টন গম উৎপাদিত হয়েছে। বাংলাদেশের জেলাভিত্তিক গমের মোট আবাদী জমির পরিমাণ ও উৎপাদন পরবর্তী পৃষ্ঠার সারণিতে উপস্থাপিত হলো।

গম উৎপাদন তথ্য

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	—	—	—	—
চট্টগ্রাম	২৬০	১৩০	৩২৫	১৬০
কুমিল্লা	১১৫৫৯০	১০৪১১০	১১৯৬৭০	১০৫৭৮০
খাগড়াছড়ি	—	—	—	—
নোয়াখালি	১৩২০	৭০০	১৪১০	৮৫০
রাঙ্গামাটি	২০	২০	১৫	১০
সিলেট	৯৮৭০	৭০৪০	৪৪০০	২৮২০
ঢাকা	৮৪৪২০	৬৯২৪০	৮৯৬৪০	৭১৪৪০
ফরিদপুর	১২৪৬৯০	৮৯৬৪০	১৩২৬৬০	১০১৬১০
জামালপুর	৬৮৮১০	৫২৪৫০	৭০৮৯০	৫৫৬৭০
কিশোরগঞ্জ	৩৫৭০০	২৬৪৬০	৩৫৮৪০	২৭৯৬০
টাঙ্গাইল	৬১২০০	৪৬৭২০	৬২২২০	৪৭৯১০
বরিশাল	১৪৩৮০	১০১৫০	১৫৫৭০	১১২৯০
যশোর	১৬১৮৪০	১৪১৫৪০	১৪৮০৪০	১৩৪৭৮০
খুলনা	১২৪৬০	১০৯৭০	৭৫৯০	৬৭৭০
কুষ্টিয়া	১২৪৭৭০	১০৭৫৪০	১২৭২৫০	১১৭৭০০
পটুয়াখালী	(৫)	(৩)	—	—
বগুড়া	৪৮৭০০	৪৬৮৬০	৫২৮৩০	৫০৯২০
দিনাজপুর	২৩০৬৫০	১৬৮৭৫০	২৪৭৯২০	১৯৭৮৫০
পাবনা	২৩৭৮৬০	১৬২৩০০	২৪৪২১০	১৯২২৫০
রাজশাহী	১৮০৫৯০	১৫৪১০০	১৭৮৪৫০	১৫২৫৪০
রংপুর	১৮০৫৬০	১৪৫৯২০	১৮২৪৬০	১৫৭৮০০
বাংলাদেশ	**১৭৩২৪৩০**	**১৩৯৭১৩০**	**১৭৪৯০৪০**	**১৪৫৪১০০**

সূত্র : সিমিট ১৯৯৬

২। বাংলাদেশে গম আবাদের সম্ভাবনা

গম চাষের জন্য ঠাণ্ডা আবহাওয়া দরকার। কিন্তু বাংলাদেশে ঠাণ্ডা আবহাওয়ার স্থায়ীত্ব কম। পরবর্তী পর্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, এসব ধারণার সাথে বাস্তব অবস্থার কোনো মিল নেই। বাংলাদেশের চাষী গমকে একটি লাভজনক ফসল হিসেবে মনে করে এবং এদেশের সাধারণ মানুষ গমকে একটি প্রধান খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে। দেশের চাহিদা পূরণ করার জন্য গত ২,০০০ সাল নাগাদ বর্তমান চাহিদার উপর আমাদের আরও ৪ হতে ৫ লাখ টন গমের প্রয়োজন নির্ধারণ করা হয়েছিল। যদি দেশের গমের উৎপাদন বাড়ানো না যায় তাহলে বিদেশ হতে আমদানি করে চাহিদা পূরণ করতে হবে। পরিসংখ্যান হতে দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশে মোট আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ১ কোটি (১০ মিলিয়ন) হেক্টর। তারমধ্যে ৫০ লাখ হেক্টর জমিতে শীতকালীন নানা রকম ফসল ও শাকসবজির আবাদ হয়। অর্থাৎ প্রায় ৫০ লাখ হেক্টর জমি পতিত থাকে।

পরিসংখ্যান হতে আরও জানা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের গমের ফলন গত কয়েক বছরের গড় হেক্টর প্রতি ২ টনের মতো। অন্যান্য গম উৎপাদনকারী দেশগুলোর যেসব তথ্য আমাদের হাতে আছে তা হতে জানা যায় আমাদের দেশের গমের ফলন খুব একটা খারাপ নয়। কৃষকের জমিতে বেশ কয়েক বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে গমের ফলন হেক্টর প্রতি ৩ টনে বাড়ানো সম্ভব। বাংলাদেশের যেসব এলাকায় নভেম্বর মাসের মধ্যে গম বোনা যায় এবং সেচ সুবিধা আছে সেসব এলাকায় উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে গমের বর্তমান মোট উৎপাদনকে ২০ লাখ টনে উন্নীত করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়। শুধু দরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। ১৯৭৪ থেকে ৭৬ সালে প্রথম যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল এবং ৮৪ সাল পর্যন্ত যা বজায় ছিল, সেরকম উদ্যোগ যদি আর একবার নেয়া হয় তাহলে গমের উৎপাদন যথেষ্ট বাড়ানো যাবে, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। পৃথিবীর কয়েকটি দেশে গমের গড় ফলন—

দেশের নাম	ফলন (টন/হেক্টর)
বাংলাদেশ	১.৮
ভারত	২.৪
পাকিস্তান	২.০
নেপাল	১.৪
মায়ানমার	১.১
যুক্তরাষ্ট্র	২.৫
মেক্সিকো	৪.১
উন্নয়নশীল দেশের গড় ফলন	২.৫
উন্নত দেশের গড় ফলন	৩.১
পূর্ব ইউরোপ ও ইউএসএসআর এর গড় ফলন	১.৯
বিশ্বের গড় ফলন	২.৪

সূত্র : সিমিট ফ্যাক্টস এ্যান্ড ট্রেন্ডস, ১৯৯৫/৯৬

৩। গম চাষের সুবিধা

বাংলাদেশে খাদ্য সঙ্কট পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় খাদ্য ফলন হিসেবে গম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে গমের গুরুত্ব নিচে উল্লেখ করা হলো।

১। বাংলাদেশে গমের ফলন সন্তোষজনক প্রতি শতকে ১৫ থেকে ২০ কেজি।

২। খাদ্য হিসেবে গম বাংলাদেশে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।

৩। পানি ধারণ ক্ষমতা কম থাকার ফলে যেখানে ধান চাষ সম্ভব নয় সেখানেও গম হয়।

৪। সেচ চাহিদা কম।

৫। গম চাষে ব্যয় কম, তাই ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকও এর চাষাবাদ করতে পারে।

৬। গম কাটার পর জমিতে পাট বা আউশ ধানের চাষ করা যায়।

৭। গমের চাষ মৌসুমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কম।

৮। গমের দানার সবটুকুই খাওয়া যায়, তুষ বা কুড়া হয় না।

৯। গমের গাছ দিয়ে ঘর ছাওয়া যায়, বেড়াও দেওয়া যায়।

১০। গমের নরম গাছ গবাদি পশুও খায়।

১১। গমের ভূষি পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

১২। গম স্বল্পকালীন ফসল, ১০০ থেকে ১১৫ দিনের মধ্যেই কাটা যায়।

১৩। ধান ও চালের অনুপাত ১০ ঃ ৭ অথচ গমের সবটুকুই আটা হয়।

১৪। ১ হেক্টর জমির ধানের পানি দিয়ে ৩ হেক্টর জমিতে গম চাষ করা যায়।

১৫। গমে রোগ পোকার আক্রমণ কম।

RAMDOC Library Dhaka

৪। গম ও ধান পরবর্তী গম চাষ এলাকা

দেশের নাম	মোট গমের জমি (হাজার হেক্টর)	ধান পরবর্তী গমের জমি (হাজার হেক্টর)	ধান পরবর্তী গমের জমি %
বাংলাদেশ	৫২৬	৪৪৭	৫
পাকিস্তান	৭৩২২	১৪৬৪	০
ভারত	২৪৩৯৫	৬৩৯৩	৬
নেপাল	৪৭২	৩৭৮	০
দক্ষিণ এশিয়া	৩২৭১৫	৪৬৮২	৭
চীন	২৯৪৬৮	৮৯৭৮	০

সূত্র : CIMMYT ১৯৯৪

৫। গম জমির আয়তন ও উৎপাদন

বছর	গম জমির আয়তন (হাজার হেক্টর)	মোট উৎপাদন (হাজার টন)	উৎপাদন (টন/হেক্টর)
১৯৮১–৮২	৫৪	৯৬৭	১.৮১
১৯৮২–৮৩	৫১	১০৯৫	২.১০

১৯৮৩–৮৪	৫১	১২১১	২.২৮
১৯৮৪–৮৫	৬৫	১৪৬৪	২.১৭
১৯৮৫–৮৬	৫৩	১০৪০	১.৯৫
১৯৮৬–৮৭	৫৪	১০৯১	১.৮৬
১৯৮৭–৮৮	৫৭	১০৪৮	১.৭৫
১৯৮৮–৮৯	৫৬	১০২১	১.৮১
১৯৮৯–৯০	৫২	১৯০	১.৫০
১৯৯০–৯১	৫৯	১০০৮	১.৬৮

BBS ১৯৯২

৬। বাংলাদেশে গম চাষেয় কয়েকটি সমস্যা

বাংলাদেশে গম উৎপাদনের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলো হচ্ছে :

১. গমের দানা চিটা হওয়া
২. জাত উচ্চ তাপ সহনশীল না হওয়া
৩. পাতার দাগ রোগের ব্যাপকতা
৪. জমির লোনাজনিত ক্ষয়ক্ষতি
৫. বিবিধ প্রাকৃতিক সমস্যা।

এখানে উল্লিখিত সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কিত কারিগরি ব্যবস্থাপনা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

১. দানার চিটা সমস্যা

(ক) গবেষণার ফলাফল হতে জানা যায় যে, গম গাছের জীবনচক্রের একটি বিশেষ সময় নিশান পাতা বের হওয়ার পর হতে লিগ্যুল বের হওয়ার সময় পর্যন্ত (পাঁচ দিন) গাছ বাইরের আবহাওয়ার প্রতি বেশ সংবেদনশীল থাকে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে যদি গাছ মাটি হতে বোরন নামক উপাদান না পায় তাহলে চিটা হয়।

গমে চিটা সমস্যা সমাধান কল্পে বাংলাদেশ, চীন, নেপাল, পাকিস্তান ও থাইল্যান্ড এই পাঁচটি দেশ একযোগে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

(খ) ঘন কুয়াশা, বাতাসে বেশি আদ্রতা এবং উচ্চ তাপ মাটি হতে গাছের বোরন গ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে ফলে ফসলে ৩০ ভাগ পর্যন্ত চিটা হতে পারে।

(গ) গাছের শীষে ০.০৫% বোরিক এসিড ছিটিয়ে প্রয়োগ করলে যে শীষগুলোতে সম্পূর্ণ চিটা হতো সেগুলোতে ২০ থেকে ৬০ ভাগ দানা হতে পারে।

২. উচ্চ তাপ সহনশীল জাত উদ্ভাবন

উচ্চ তাপ গমের ফলনসমূহ ক্ষতি করে। উপযুক্ত জাত উদ্ভাবনের এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। বর্তমানে যে জাতগুলো আছে সেগুলোর কিছুটা উচ্চ তাপ প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে। তা না হলে বাংলাদেশে গমের আবাদ কখনই সম্প্রসারিত হতো না।

এ ব্যাপারে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা চলছে।

৩. পাতার দাগ রোগের প্রতিকার

টিল্ট প্রয়োগ করলে এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, কাজেই আগামী মৌসুমে কৃষকের জমিতে টিল্ট প্রয়োগ করে এর আর্থিক দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মাত্র কয়েক বছর হতে এ সমস্যা ব্যাপক আকারে দেখা গেছে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমস্যাটি সমাধানকল্পে গবেষণা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

৪. দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকার জন্য সঠিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন

আশির দশকে গমে লবণাক্ততার উপর বেশ কিছু গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল এবং নোয়াখালীর চর এলাকায় বেশ কয়টি পরীক্ষা করা হয়েছিল। মাঠ পরীক্ষার সাথে সাথে গবেষণাগারে লবণাক্ততা পরীক্ষা শুরু করা হয়। অভিজ্ঞতা হতে বলা যেতে পারে যে, সরাসরি মাঠে লবণাক্ততার উপর গবেষণা সেরকম ফলপ্রসূ হয় না। প্রাথমিক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় এ গবেষণা পরিচালিত করতে হয়।

ইতিমধ্যে ভারত যেসব লবণাক্ত সহিষ্ণুজাত উদ্ভাবন করেছে সেগুলোও বাংলাদেশে আনা হয়েছে। এ জাতগুলো নিয়ে লবণাক্ততার উপর আরও পরীক্ষা করা যেতে পারে।

লবণাক্ত সব এলাকাতেই গমের চাষ হয় না। লেখকের গবেষণা ফলাফল থেকে বলা যায়, যেসব জমিতে লবণাক্ততার পরিমাণ কম সেখানে কাঞ্চন ও আকবর জাত মোটামুটি ভাল ফলন দেয়। যাহোক কৃষকের খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমান জাতগুলো নিয়ে গমের আবাদ এসব এলাকায় সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

চতুর্দশ অধ্যায়

গমের পরিচিতি

গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান দানা ফসল। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক জাতের গম উদ্ভাবন ও উন্নত জাতের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গম ফসলের বিভিন্ন জাত, গম শীষ, শাইকলেট ও দানার তুলনামূলক সনাক্তকরণ সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজন করা হয়েছে— যা থেকে গম সম্পর্কে আরও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব।

১। উৎপত্তি ও বিস্তার

গম সম্ভবত দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়া প্রথম চাষাবাদ হয়েছিল, সর্বাধিক উল্লেখিত স্থান ইরাকের ইউফ্রেটস (Euphartes) ও টাইগ্রিস (Tigris) উপত্যকা।

গমের উৎপত্তির অন্যান্য স্থান হচ্ছে ইরাক-ইরান এলাকার জারমো (Jarmo) করিম শাহির (Karim Shahir)। প্রাচীন পারস্য, গ্রিস এবং মিশরে ঘনীভূত (carbonized) গম দানা পাওয়া গেছে। অতএব গম অত্যন্ত প্রাচীন ফসল। বর্তমানে গম পৃথিবীর সর্বাধিক জমিতে চাষকৃত ফসল।

গমের বিভিন্ন প্রজাতির পরিচিতি নিচে উল্লেখ করা হলো।

সারণি ১৭.১ : গমের বিভিন্ন প্রজাতির পরিচিতি

প্রজাতি	ইংরেজি নাম	ক্রোমোসোম সংখ্যা	বৈশিষ্ট্য
1. *Triticum aestivum*	Common	2n = 42	রুটি তৈরির
2. *Triticum duram* *Triticum dicoccum*	Duram wheat Emmer	2n = 28 2n = 28	গম বিবিধ ব্যবহার
3. *Triticum sphaerococcum*	Shot Eincorn	2n = 42 2n = 14	
4.*Triticum monococum*			

গমের এই ৪টি উপপ্রজাতি রয়েছে। এর মধ্যে *Turanicum* নামে একটি উপপ্রজাতি বন্য। বাকি সবগুলো উপজাতি আবাদযোগ্য। বাংলাদেশে *Triticum. aestivum* প্রজাতির চাষাবাদ বেশি হয়ে থাকে।

২। গমের জাত নির্বাচন

গমের জাত নির্বাচনের উপর গম চাষের সফলতা নির্ভর করে। গম জাতের মধ্যে কোনোটি আগাম আবার কোনোটি কিছুটা বিলম্বে বপন করলেও চলে। এছাড়া বাংলাদেশ সকল স্থানে গমের ফলন সমান হয় না। এজন্য গম চাষের জন্য এর জাত নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গমের সনোরো, মেক্সি, পাক, দোয়েল, পাভন, আনন্দ, কাঞ্চন, বরকত, আকার ও অঘ্রাণী জাতসমূহ মোটামুটি সারা দেশেই ভাল জন্মে।

গমের বলাকা জাতটি উপকূলীয় এলাকায় ভাল। নূরী জাতসমূহ রাজশাহী বিভাগ ও ময়মনসিংহ জেলায় ভাল জন্মে। টেনোরি জাতের গম যশোর, ঢাকা, ফরিদপুর ও কুমিল্লা ভাল জন্মায়।

চিত্র ১৪.১ : গম গাছ

৩। গমের শ্রেণিবিন্তার

গমের দানার গঠন অনুসারে গমকে নিম্নরূপ শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১. গমের দানার গঠন অনুসারে

(ক) নরম (Soft) গম : দানায় গ্লুটিন কম। শিল্পে বেশি ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ *Triticum aestivum*

(খ) শক্ত (Hard) গম : দানায় গ্লুটিনের পরিমাণ ৪০%-এর বেশি। পাউরুটি ও চাপাতি তৈরির জন্য ভাল। উদাহরণ *Triticum durum.*

২. দানার বর্ণ অনুসারে

(ক) লাল বা হলদে গম : ইনিয়া, জোপাটেকো, সনোরা, টেনোরি, সোনালিকা

(খ) সাদা গম : বলাকা, দোয়েল, নরটেনো, কাঞ্চন, আনন্দ, আরবর, বরকত, অগ্রণী আনন্দ।

৩. ক্রোমাসোম সংখ্যা অনুসারে

(ক) ডিপ্লয়ড (Diploid)- *Triticum monococcum*

(খ) টেট্রাপ্লয়ড় (Tetraploi)- *Triticum durum*

(গ) হেক্সাপ্লয়ড (Hexaploid)- *Triticum aestivum*

৪। গম জাতের উচ্চতা, দানার বৈশিষ্ট্য ও জীবনকাল

জাতের নাম	গাছের উচ্চতা (সেমি)	দানার রঙ ও আকার	জীবনকাল (দিন)
আনন্দ	১০০ থেকে ১০৫	সাদা, ছোট	১০৩ থেকে ১০৮
কাঞ্চন	১০০ থেকে ১১০	সাদা, বড়	১০৬ থেকে ১১২
বরকত	৯৫ থেকে ১০৫	সাদা, মধ্যম	১০৫ থেকে ১১০
আকবর	৯০ থেকে ১০০	সাদা , মধ্যম	১০৩ থেকে ১০৮
সোনালিকা	৯০ থেকে ১০০	সোনালি, বড়	১০০ থেকে ১০৪
কল্যান সোনা	৯০ থেকে ১০০	সোনালি, বড়	১০০ থেকে ১১০
ইনিয়া – ৬৬	৯৫ থেকে ১০৫	লাল	১০৫ থেকে ১০৭
পাভন – ৭৫	৮৫ থেকে ৯৫	সাদা	১১২ থেকে ১১৭
বলাকা	৮০ থেকে ৯০	সাদা	১০৫ থেকে ১১০
অগ্রনী	৯০ থেকে ১০০	হাল্কা বাদামি মধ্যম	১০০ থেকে ১১০
সওগাত	৯০ থেকে ১০০	হল্কা বাদামি বড়	১০০ থেকে ১০৪
প্রতিভা	৯০ থেকে ১০০	হাল্কা বাদামি, মধ্যম	১০৫ থেকে ১১০

৫। গম জাতের ফলন বৈশিষ্ট্য

জাতের নাম	ফলন (টন/হেক্টর)	কুশির সংখ্যা	শীষের দৈর্ঘ্য ও দানার সংখ্যা
আনন্দ	৩.৫ থেকে ৪.৫	৬ থেকে ৮	১৩ থেকে ১৭
কাঞ্চন	৪ থেকে ৫	৭ থেকে ১০	১৭ থেকে ২০
বরকত	৩ থেকে ৪	৪ থেকে ৭	১৩ থেকে ১৬
আকবর	৪ থেকে ৪.৫	৬ থেকে ৯	১৫ থেকে ২০
সোনালিকা	৩ থেকে ৪	৫ থেকে ৭	১৩ থেকে ১৫
কল্যাণ সোনা	৩ থেকে ৪	৪ থেকে ৬	১৩ থেকে ১৬
ইনিয়া – ৬৬	২.৫ থেকে ৩.৫	৩ থেকে ৬	১২ থেকে ২৫
পাভন – ৭৫	২ থেকে ৩	৩ থেকে ৬	১৫ থেকে ১৮

বলাকা	৩ থেকে ৪	৪ থেকে ৭	১৪ থেকে ১৮
অগ্রনী	৪ থেকে ৪.৫	৭ থেকে ১০	১২ থেকে ১৬
সওগাত	৪ থেকে ৪.৫	৭ থেকে ১০	১২ থেকে ১৪
প্রতিভা	৪ থেকে ৪.৫	৭ থেকে ১০	১৩ থেকে ১৫

*বীজ হারের উপর নির্ভর করে আরও কম-বেশি হতে পারে

বাংলাদেশে চাষকৃত জাতসমূহের মধ্যে বর্তমানে সোনালিকা এবং কাঞ্চন অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আনন্দ, বরকত ও আকবর ফলন বেশি। বলাকা ও অঘ্রাণী জাত ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

দক্ষিণাঞ্চলে লোনামাটি সহনশীল এবং উষ্ণতর আবহাওয়া উপযোগী গম জাত উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা চলছে।

৬। গম গাছের বৃদ্ধি পর্যায়

জমিতে বীজ বোনার পর অঙ্কুরিত চারা ধীরে ধীরে বড় হয়ে পুনরায় শীষে ও দানা উৎপাদন করে জীবনকাল পূর্ণ করে। গম গাছের জীবনকালকে কৃষিতাত্ত্বিক বিবেচনা বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায়ে নির্ভর করা যায়। নিম্নে গাছের প্রধান বৃদ্ধি পর্যায়সমূহ আলোচনা করা হলো।

১। **চারাপর্যায়** (Seedling stage) : বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর ১ থেকে ২ দিন পর্যন্ত এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে।

২। **মুকুট শিকড় উৎপাদন পর্যায়** (Crown root stage) : বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে গমগাছের গোড়ায় মুকুট শিকড় উৎপাদিত হয়।

৩। **কুশি উৎপাদন পর্যায়** (Tillaring stage) : মুকুট বের হওয়ার পর ২০ থেকে ২৫ দিন পর্যন্ত গম গাছের গোড়া থেকে কুশি উৎপাদিত হয়।

৪। **দ্রুত বৃদ্ধি পর্যায়** (Rapid growth stage) : গাছ দ্রুত বড় হয়।

৭। গম গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ের গুরুত্ব

গমের ফলন বৃদ্ধির জন্য এর বৃদ্ধি পর্যায় মুকুটকে পরিচর্যা করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ :

১. গমের চারা অবস্থায় জমি আগাছা মুক্ত করতে হয়।

২. গম গাছের মুকুট শিকড় উৎপাদন অবস্থায় জমিতে সেচ ও সার দিতে হয়।

৩. জমিতে থোড় উৎপাদন ও শীষ বের হওয়ার পর্যায়ে পানিসেচ ও পুষ্টি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়।

৪. গমের দানা পরিপক্ব হওয়ার পর্যায়ে জমিতে যাতে অতিরিক্ত পানি না থাকে বা জলাবদ্ধতা দেখা না দেয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।

গমের বীজ জমিতে বপনের পর অঙ্কুরোদগম পর্যায়ে পানির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হয়। গম পাকা অবস্থায়ও পানি যাতে মাটিতে চুইয়ে যেতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।

গম গাছ যথাযথভাবে বড় হওয়ার জন্য বাড়ন্ত অবস্থায় সার ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়।

৮। **গমের বৃদ্ধি পর্যায় সময়সীমা ও এর কৃষিতাত্ত্বিক তাৎপর্য :** এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত ছকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	বৃদ্ধি পর্যায় (Growth stage)	গাছের বয়স দিন	কৃষিতাত্ত্বিক তাৎপর্য
১	অঙ্কুর পর্যায়	৬ থেকে ৭	
২	চারা পর্যায় অঙ্কুর	১৭ থেকে ২২	আগাছা দমন করা
৩	মুকুট শিকড়	১৭ থেকে ২২	সার ও পানিসেচ দেয়া
৪	কুশি উৎপাদন পর্যায়	২০ থেকে ৪৫	সার ও পানিসেচ দেয়া
৫	দ্রুত বৃদ্ধি পর্যায়	৩৫ থেকে ৬০	আগাছা দমন করা পোকা ও রোগ দমন
৬	থোড় পর্যায় – গর্ভ – শীষ বের হওয়া – ফুল আসা ও ফোটা	৫ থেকে ৮০	সার দেওয়া
৭	দানা পুষ্টি পর্যায় ৫০ থেকে ৬০ দিন	৭০ থেকে ৯০	পানি সেচ দেয়া
৮	পরিপক্ব পর্যায়	৯০থেকে ১২০	ফসল কাটা

পঞ্চদশ অধ্যায়

গম চাষ পদ্ধতি

১। জমি ও মাটি নির্বাচন

উঁচু ও মাঝারি উঁচু দোআঁশ মাটি গম চাষের জন্য উপযুক্ত। লোনা মাটি, বেলে মাটি ও এঁটেল মাটিতে গম ভাল হয় না। গমে জমি সমতল হওয়া দরকার যাতে পানি সেচ দিলে কোথাও জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয়। আগাম কাটার উপযুক্ত রোপা আমন ও বোনা আমন ধানের জমিতে গমের চাষ করা যায়।

জমি প্রস্তুতকরণ ও সার প্রয়োগ

জমি নির্বাচনের পর মাটির জো অবস্থা বা সামান্য ভিজা থাকা অবস্থায় চাষ দিতে হয়। এক/দেড় মাসের মধ্যে ৪ থেকে ৫টি চাষ ও মই দিয়ে গমের জমি প্রস্তুত করা যায়।

জমি চাষ করার সময় আগাছা মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয় যাতে জমিতে জৈব সার প্রয়োগ করতে হলে তা জমি প্রস্তুতকালে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। জৈব সার ছাড়াও টিএসপি, ফসফেট, জিপসাম ও দস্তা সার জমি প্রস্তুতের সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়।

জমির মাটি খুব ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয়। জমিতে শেষ চাষ দেওয়ার পর লাঙল দিয়ে ঢালের দিকে কয়েকটি আড়াআড়ি ফালি কাটতে হয় যাতে পানি নিষ্কাশনের সুবিধা হয়।

২। বীজ নির্বাচন ও বপন

গম চাষে ভাল ফল পেতে হলে রোগমুক্ত ও পুষ্ট বীজ বাছাই করতে হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ৭৫% থেকে ৮০% হওয়া প্রয়োজন, নতুবা জমিতে পর্যাপ্ত সংখ্যাক গাছ পাওয়া যায় না। বীজ সন্দেহজনক হলে একটি পেট্রিডিশে ভিজা খবরের কাগজ পদ্ধতিতে এর অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা পরীক্ষা করে নেওয়া যায়।

এ পদ্ধতি পেট্রিডিশের তলায় ৩ থেকে ৪ ফর্দ খবরের কাগজ বিছিয়ে তার উপর ৫০টি বীজ দিয়ে উপরে পুনরায় ৩ থেকে ৪টি খবরের কাগজ দিয়ে তা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিতে হয়। এভাবে ৪ থেকে ৬ দিনের মধ্যে বীজ গজায়। গজানো বীজের সংখ্যা হিসেব করে অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নির্ণয় করতে হয়।

বীজ বপন সময়

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহে নভেম্বর মাসে এবং দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে ডিসেম্বর মাসে বীজ বপণ করতে হয়। নিম্নরূপ সময়সীমার পরে বীজ বপন করলে গমের ফলন কমে যায়।

অঙ্কুর : ৬ থেকে ৭ দিন,
চারাবৃদ্ধি ও মুকুট শিকড় : ১৩ থেকে ১৪ দিন,
কুশি উৎপাদন ও ডগা ছাড়া : ২৩ থেকে ২৪ দিন,

ফুল ও শীষ : ১৪ থেকে ১৫ দিন,
নিষেক ও বীজ উৎপাদন : ৫০ থেকে ৬০ দিন, (মোট ১১৫ থেকে ১২০ দিন)।

বীজ বপন হার

গম বীজ ছিটিয়ে বা সারিতে বীজ বপন করা যায়। নিচে গম বীজ বপনের হার উল্লেখ করা হলো।

বীজ বোনার সময়	বপন পদ্ধতি	বীজের পরিমাণ (গ্রাম / শতক)	
		সেচসহ	সেচবিহীন
নভেম্বর	ছিটিয়ে বপন	৫০০	৪০০
	সারিতে বপন	৪০০	৩৫০
ডিসেম্বর	ছিটিয়ে বপন	৬০০	৫০০
	সারিতে বপন	৫০০	৪৫০

বীজ বপন পদ্ধতি

ছিটিয়ে বীজ বপন করলে জমিতে বীজ বপনের পর জমিতে এমনভাবে একটি চাষ দিতে হয় যাতে অধিকাংশ বীজ ৪ থেকে ৫ সেন্টিমিটার গভীরতায় থাকে। সারিতে বীজ বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব হয় ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার ও বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হয় ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার। সারিতে বীজ বুনলে বীজ বপন যন্ত্র দিয়ে অতিদ্রুত বীজ বপন করা যায়। বীজ বপন যন্ত্র হস্তচালিত হতে পারে। আবার যন্ত্র হস্তচালিত হতে পারে।

বীজ শোধন

গমের বীজ নিয়োগ করার ভিটাভেক্স (Vitavex) দ্রব্য দিয়ে বীজ শোধন করে তারপর বপন করা যায়। প্রতি কেজি বীজের জন্য ৪ থেকে ৫ গ্রাম শোধন দ্রব্য ব্যবহার করা যায়। ভিটাভেক্স দিয়ে বীজ শোধন করলে গমের গোড়ায় তার কৃমির (wire worm) আক্রমণ হয় না।

৩। সার প্রয়োগ

গম চাষ করে উত্তম ফলন পেতে হলে জমিতে অবশ্যই জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হয়। গমের জমিতে প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো। সেচ সুবিধার ভিত্তিতে সারের পরিমাণ কম বেশি হয়ে থাকে।

গমের জমিতে সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ গ্রাম/শতক		
	সেচযুক্ত	অল্প সেচ	সেচহীন
ইউরিয়া	১,২০০	৮০০	৫০০
টিএসপি	৮০০	৬০০	৩০০
এমপি	৩০০	২০০	১০০
জিপসাম	৮০০	৬০০	৩০০
দস্তা সার	৫০	৩০	১৫
জৈব সার (কেজি)	২৫	২০	১৫

সেচযুক্ত চাষে ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় ব্যবহার করতে হয়। ইউরিয়া সারের এক–তৃতীয়াংশ জমি প্রস্তুতের সময় এক–তৃতীয়াংশ চারা গজানোর ১৭ থেকে ২০ দিন পর এবং বাকি এই তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় প্রয়োগের ২৫ থেকে ৩০দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হয়।

সেচবিহীন অবস্থায় সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়।

আগাছা দমন

গমের জমিতে আগাছা দমন মাটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গমের জমিতে চারা অবস্থায় ও দ্রুত বৃদ্ধি পর্যায়ে ২ থেকে ৩ বার আগাছা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করলে ২০% থেকে ৩০% ফলন বাড়ে। বীজ বপনের পর থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত গমের জমি আগাছা মুক্ত রাখা দরকার।

গমের জমি বহু ধরনের শীতকালীন ও বার্ষিক আগাছার সাহায্যে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর মধ্যে বেশকিছু আগাছার বিবরণ ও দমন পদ্ধতি ধান চাষ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে আরও কয়েকটি আগাছার বিবরণ দেওয়া হলো।

৪। বড় দুধিয়া (Milk purslane) *Euphorbia hirta*

বাংলাদেশে রবি ও খরিফ ঋতুতে এই আগাছা জন্মে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বার্ষিক বিরুৎজাতীয় আগাছা। কাণ্ড লতানো, বৃততী, রোমযুক্ত, কাণ্ড ছিড়লে দুধের মতো ঘন তরল দ্রব্য বের হয়। পাতা সরল, সবৃন্তক। বৃন্ত খাটো, উপপত্র ছোট। কাক্ষিক ঘন সন্নিবিষ্ট, পুংকেশর ১ থেকে ৫টি বীজের গর্ভদণ্ড ৩টা।

বংশবিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : চাষ ও হাতে বাছাই।

সম্পর্কযুক্ত আগাছা : *Euphorbia microphylla.*

ছোট দুধিয়া, গাছের বর্ণ সবুজ বা লাল, বড় দুধিয়ার চেয়ে পাতা, কাণ্ড ও ফুলের আকার অনেক ছোট। গাছ গড়ানো, বহু শাখান্বিত ও বিস্তৃত।

বড় দুধিয়া ও ছোট দুধিয়া আগাছার পার্থক্য

বড় দুধিয়া	ছোট দুধিয়া
১. গাছ খাড়া	১. গাছ গড়ানো
২. কাণ্ডের পাতা দৃঢ় রোমযুক্ত (Hispid), পুষ্প ক্ষুদ্র	২. কাণ্ড, পাতা, মসৃণ পাতার প্রশস্ত প্রান্ত দন্তর
৩. পাতা শিরাযুক্ত	৩ পাতা শিরাবিহীন
৪. পাতা ১ থেকে ৩ সেন্টিমিটার লম্বা	৪. পাতা ০.৫ থেকে ১ সেন্টিমিটার লম্বা

৫। হাতিশুঁড় (Indian heliotrope) *Heliotropium indicum* L.

বাংলাদেশে প্রচুর হাতিশুঁড় আগাছা জন্মাতে দেখা যায়। শাকসবজির জমি, রাস্তাপার্শ্ব, জমির আইল, বাড়ির আঙিনা ইত্যাদিতে প্রচুর হাতিশুঁড় আগাছা জন্মায়। উঁচু জমিতে হাতিশুঁড় আগাছা জন্মাতে পারে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : একবর্ষী আগাছা। পাতা একান্তর, ফুল ছোট সাদা বা ঈষৎ পাটল, শীর্ষীয়। ফল ভেঙে দু' খণ্ড হয়, প্রতিটি খণ্ডে ২টি করে বীজ থাকে। পাতা বোঁটা যুক্ত, গোলাকার। ঈষৎ দন্তর। মঞ্জরী হেলিকয়েড অনিয়ত।

বংশ বিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : হাতে তোলা, লাঙল চাষ, কোদল্যানো ইত্যাদির মাধ্যমে সহজেই হাতিশুঁড় আগাছা দমন করা যায়। এসব কার্যাবলী গাছে ফুল উৎপাদন বা পরিপক্ব হওয়ার পূর্বে করতে হয়।

সম্পর্কযুক্ত আগাছা—

১. *Heliotropium curassavicum*

2. *Heliotropium supinum.*

৬। **দন্ডকলস বা শ্বেতদ্রোণ** (White Verticilla) *Leucus aspera* L.

উঁচু জমির জন্য দন্ডকলস খুবই ক্ষতিকর আগাছা।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বার্ষিক আগাছা। পুষ্প অবৃন্তক, মঞ্জুরী ভার্টিসিলেস্টার, বর্ণ সাদা। পাতা সরু, গাঢ় সবুজ লম্বাটে ২ থেকে ১২ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা। বৃন্তি শিরাযুক্ত ৫টি, পরাগধানী ৪টি, বৃতির মুখ সঙ্কুচিত, বৃতির নিচে মসৃণ ও উপরে শিরাযুক্ত, মঞ্জরীপত্র লম্বা ও সরু।

বংশ বিস্তার : রীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : কোনো জমিতে শ্বেতদ্রোণের বিস্তার একবার হলে এদের দমন করা খুব কষ্টকর হয়, কারণ এদের বীজের সংখ্যা যেমন বেশি তেমনি বীজের সজীবতাও মাটিতে অনেকদিন টিকে থাকে। সাধারণত উচ্চভূমিতে এদের বৃদ্ধি বিস্তার ভাল হয়। শ্বেতদ্রোণ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

এ আগাছা দমন করতে হলে বীজ অঙ্কুরোদগমের পর এবং গাছে ফুল আসার আগে নিড়ানি, কোদালি বা লাঙল চাষ দিয়ে তুলে ফেলতে হয়। জলাবদ্ধতা সৃষ্টি করেও এই আগাছা দমন করা যায়।

সম্পর্কযুক্ত আগাছা—

১. *Leucus linifolia*— সমগ্র বৃতি মসৃণ, ব্রাক্ট খাটো, পাতা লোমযুক্ত।

২. *Leomus sibiricus* L. রক্তদ্রোণ, ফুলের বর্ণ লাল।

৭। **বিন্দলতা বা হিরনখুড়ি আগাছা :** (Field bindweed) *Canyolyuhus awensis*

বাংলাদেশের জন্য বিন্দলতা আগাছা বা হিরনখুড়ি আগাছা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাস্তাপার্শ্ব, বাড়ির আঙিনা, হাল্কা জঙ্গল, পুকুর পাড় ইত্যাদিতে এই আগাছা ব্যাপকভাবে জন্মাতে দেখা যায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বহুবর্ষী সরু লতানো গাছ। নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান অঞ্চলে বেশি জন্মে। লতা মাটিতে কিছুটা গড়ানো। গড়ানো অংশের পর্ব সন্ধিতে শিকড় জন্মায়। কাণ্ডের উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার। পাতা ২ থেকে ৭ সেন্টিমিটার লম্বা। একান্তর ফুলের সংখ্যা প্রতি পত্রাক্ষে ১ থেকে ৪টি। ফুলের বর্ণ সাদা থেকে পাটল। ফল ডিম্বাকার ক্যাপসুল, পাতলা আবরণ দিয়ে আচ্ছাদিত, ২ কোষবিশিষ্ট বীজের সংখ্যা ২ থেকে ৪টি। বীজের বর্ণ ধূসর বাদামি।

বংশ বিস্তার : বীজসহ কাণ্ডাংশের মাধ্যমেও এই আগাছা বংশবিস্তার করতে পারে।

দমন পদ্ধতি : শিকড়সহ হাতে টেনে তোলা এ আগাছা দমনের প্রধান পদ্ধতি। বি-দলতার আগাছার ব্যাপক আক্রমণ হলে উপযুক্ত আগাছানাশক দ্রব্য প্রয়োগ করলে এদের দমন করা যায়।

সম্পর্কযুক্ত আগাছা—

১. *Convolvulus sepium* L. (Hedge bindweed) পাতা ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার লম্বা, পত্রবৃন্ত সরু। ফুল একক।

৮। মিকানিয়া লতা (Mikania) *Mikania sevandens*

বাংলাদেশে উচ্চভূমিজ ফসলে ও জমিপার্শ্ব বা রাস্তারপার্শ্ব জঙ্গলে, বাড়ির আঙিনায় প্রচুর মিকানিয়া লতা জন্মাতে দেখা যায়। নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসে এই আগাছায় ফুল আসে ও বীজ পরিপক্ব হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : লতানো বহুবর্ষী আগাছা। পাতা বিপরীত বোঁটাযুক্ত পুষ্পধারক ক্ষুদ্র, ৪ ফুলবিশিষ্ট, ব্রাক্ট–৪, সরু। দল ৫টি দলমণ্ডল নলাকার পাতা দন্তর, লম্বায় প্রায় ৫ থেকে ১০ সেন্টিমিটার।

বংশ বিস্তার : বীজ ও গোড়া কাণ্ড উভয়ের মাধ্যমেই এই আগাছা বংশ বিস্তার করতে পারে।

দমন পদ্ধতি : এই আগাছা দমনের প্রধান প্রধান পদ্ধতি হচ্ছে হাতে তোলা, আগুনে পোড়ানো (জঙ্গল পরিষ্কার করার সময়), রাসায়নিক ওযুধ প্রয়োগ ও জৈবিক পদ্ধতিতে দমন। জৈবিক পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে মাইমোসা গণের *(Mimosa)* অন্তর্ভুক্ত একটি কাঁটাযুক্ত ও লতানো প্রজাতি দিয়ে দমন করা। এ *Mimosa* প্রজাতির বৃদ্ধির হার মিকানিয়া লতার চেয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি বলে অল্প সময়ের মধ্যে মিকানিয়া ছেয়ে ফেলে ও ক্ষতিগ্রস্ত করে।

৯। উলু (Sun grass) *Imperata cylindirica*

চাষকৃত জমির চারপাশ,নদীর ধার, পুকুর পাড়, পতিত উঁচু ও পাহাড়িয়া এলাকায় সারা বছরই জন্মাতে দেখা যায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বহুবর্ষী বিরুৎ, কাণ্ড খাড়া, সরল, লম্বা, মসৃণ। কাণ্ডাবরক পত্রমূল ঈষৎ আলগা, লিগ্যুল (ligule) ঝিলির মতো। পাতার ফলক সরু। কীলকমঞ্জরী ১ ফলবিশিষ্ট অনিয়ত শীর্ষ যৌগিক। ফুলশীর্ষ লালচে কিন্তু ফলশীর্ষ রূপালি সাদা। পুংকেশর ২টি।

বংশ বিস্তার : বীজ ও ভূ-নিম্নস্থ ধাবকের সাহায্যে বংশ বিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : সমূলে তুলে ফেলা ব্যতীত এই আগাছা দমন করা খুবই কঠিন।

পানিসেচ ব্যবস্থাপনা

গমের জমিতে উচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করতে হলে পানিসেচ দিতে হয়। গমের গাছে মুকুট শিকড় বের হওয়ার সময় অবশ্যই সেচ দিতে হয়। গমে দুটি সেচ দিলে প্রথমটি মুকুট শিকড় উৎপাদন পর্যায়ে এবং দ্বিতীয়টি শীষ বের হওয়ার সময় অর্থাৎ গাছের বয়স ৪৫ থেকে ৫০ দিন হলে দিতে হয়। জমিতে তৃতীয় সেচ দেওয়ার সুযোগ থাকলে তা গাছের ৭৫ থেকে ৮০ দিন বয়সে দিতে হয়।

গমের জমিতে সেচ দেওয়ার পূর্বে আগাছা দমন করে ইউরিয়ার উপরিপ্রয়োগ করে নিতে হয়।

জমিতে পানি সেচ ও সার প্রয়োগ করে গমের ফলন বাড়ানো হলে নিয়মিত আগাছা দমন করতে হয়। জমিতে প্রধানত নিড়ানি দিয়ে আগাছা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। জমিতে নিড়ানি দেওয়ার সময় কোনো স্থানে গাছ ঘন থাকলে তা পাতলা করে দিতে হয়। জমিতে বীজ বপনের পর ১২ থেকে ১৫ এবং ৩৫ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে দুটি নিড়ানি দিলেই চলে। জমিতে নিড়ানি দেওয়ার পর ইউরিয়া উপরপ্রয়োগ করতে হয়।

গমের জমির প্রধান আগাছা হচ্ছে দূর্বা, শ্যামা, মুথা, কাঁটানটে, শ্বেতদ্রোণ, বথুয়া ইত্যাদি। এসব আগাছা শিকড়সহ টেনে তুলতে হয় এবং গাছে ফুল আসার পূর্বের আগাছা দমন করতে হয়।

বিনা চাষে ও স্বল্প চাষে গম আবাদ

মাটির রস বুঝে আমন ধান কাটার ১৫ দিন পূর্বে ক্ষেতের মধ্যে ছিটিয়ে গম বোনা যায়। আমন ধান কাটার পর মাটিতে রস থাকা অবস্থায় মাত্র দুটি চাষ দিয়ে গম বোনা যায়। সময়মত গম বোনা চাষের খরচ কমানো এবং মাটির রস বজায় রাখার জন্য পদ্ধতি দুটি উত্তম। গম চাষীরা বর্তমানে এসব প্রযুক্তি কিছু কিছু ব্যবহার করছে।

১০। পোকা দমন

গমের প্রধান প্রধান পোকার মধ্যে রয়েছে—

(ক) জাবপোকা (Aphid)

(খ) তার পোকা বা তার কৃমি (Wire worm)

(গ) মাজরা পোকা।

জমিতে এসব পোকা দেখা দিলে রাসায়নিক কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়। গম ফসলে পোকা ও রোগাক্রমণ সম্পর্কিত রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজন করা হয়েছে।

১১। ইঁদুর দমন

ইঁদুর গমের একটি প্রধান শত্রু। গম ক্ষেতে বিশেষ করে শীষ আসার পর থেকে ইঁদুরের উপদ্রব দেখা যায়। উপদ্রবের মাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে গম পাকার সময়। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত "২% জিঙ্ক সালফাইড বিষটোপ" ইঁদুর দমনে যথেষ্ট কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিষটোপ প্রস্তুত প্রণালী (এক কেজি বিষটোপের জন্য)

উপাদান	পরিমাণ
গম	৯৬৫ গ্রাম .
বার্লি	১০ গ্রাম
জিঙ্ক ফসফাইড (সক্রিয়া উপাদান ৮০%)	২৫ গ্রাম
১০০ মিলিলিটার পানি (যা রোদে শুকিয়ে যায়)	

একটি মাটির বা এলুমিনিয়ামের হাড়িতে ১০ গ্রাম বার্লি ও ১০০ মিলিলিটার পানি মিশিয়ে ২/৩ মিনিট আগুনে জ্বাল দিতে হয়। বার্লি আঠালো হয়ে গেলে পাত্রটি নামিয়ে ফেলতে হয়। ঠাণ্ডা হওয়ার পর ২৫ গ্রাম জিঙ্ক ফসফাইড আঠালো বার্লির সাথে ভালভাবে মিশাতে হয়।

জিঙ্ক ফসফাইড মিশানোর পর ৯৬৫ গ্রাম গম হাড়িতে ঢেলে এমনভাবে মিশাতে হয় যেন প্রতিটি গমের দানার গায়ে কালো আবরণ পড়ে। এরপর এক থেকে দুঘন্টা রোদে শুকালে তা বিষটোপে পরিণত হয়। পরে ঠাণ্ডা করে পলিথিন ব্যাগ বা বায়ুরোধক পাত্রে রাখতে হয়।

উঁচু জমিতে ও নরম মাটিতে ইঁদুরের উপদ্রব খুবই বেশি হয়। বাংলাদেশে গম জমির ইঁদুরের মধ্যে মাঠ ইঁদুর ও কালো ইঁদুরের উপদ্রব বেশি। মাঠ ছাড়াও ঘরের সংরক্ষণ করার সময়ও গম দানা খেয়ে ইঁদুর-এর প্রচুর ক্ষতি করে।

গমের জমিতে দমনের জন্য বাজার থেকে কিনে বিষটোপ ব্যবহার করতে হয়। ইঁদুরের গর্তে বা গর্তের পাশে পর পর ৩ থেকে ৪ রাত বিষটোপ ব্যবহার করতে হয়। ইঁদুরের গর্তে পানি ঢেলে বা ধূয়া দিয়েও ইঁদুর দমন করা যায়।

ইঁদুর দমনের অন্যান্য পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে জঙ্গল পরিষ্কার করা, পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ এবং সর্বদা ইঁদুরের উপস্থিতি খেয়াল রাখা, জমির আইল পরিচ্ছন্ন রাখা প্রভৃতি।

১২। রোগ দমন

গমের প্রধান প্রধান রোগের মধ্যে রয়েছে–

(ক) মরিচা রোগ (Wheat rust)

(খ) পাতার রোগ (Leat spot)

(গ) শিকড় ও কাণ্ড পঁচা রোগ (Root and stem rot)

(ঘ) ঝুল রোগ (Smut)।

গমের ফলন এসব রোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা যায়।

১। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের ব্যবহার, যেমন– পাতার দাগ ও মরিচা রোগ দমন।

২। বীজ শোধন করা : প্রতি কেজি বীজে ২ থেকে ৩ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ প্রয়োগে কৃমি রোগ দমন হয়।

৩। একই জমিতে পর পর গমের চাষ না করা, যেমন– কৃমি রোগ দমন।

৪। আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা, যেমন– ঝুল রোগ দমন।

৫। রোগনাশক রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন– সুপারিশকৃত হারে কিউপ্রাভিট ও ডাইথেন – ৪৫ প্রয়োগ।

এছাড়াও গমে রোগ দমনের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত চাষাবাদ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে সুস্থ বীজ ব্যবহার, সঠিক বীজ হার অবলম্বন, আগাছা দমন, রোগিং ও অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সম্পাদন।

১৩। ফসল কাটা ও মাড়াই

গম পাকার পর সকালে বা বিকালে কাটতে হয়। গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে যেতে থাকলে বুঝতে হয় গম পরিপক্ক হয়েছে। একটি শীষ হাতে নিয়ে তালুতে ঘষলে যদি দানা বের হয়ে আসে তা হলে বুঝতে হয় দানা পরিপক্ক হয়েছে। এছাড়া দানা দাঁতে কাটলে কট কট শব্দ হলে বুঝতে হয় দানা পেকে গেছে।

গম কাটার পর দুপুর বেলা মাড়াই করা উচিৎ। বাদলা দিনে গম কাটতে নেই। গম কাঠের উপর পিটিয়ে বা গরু মাড়াই করা যায়। গম মাড়াই করার পর ঝেড়ে ও শুকিয়ে বায়ুরুদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হয়।

ব্যবহার

গমক্ষেতে সদ্য মাটি উঠানো (নতুন) গর্ত সনাক্ত করে গর্তের মুখের মাটি সরিয়ে ৩ থেকে ৫ গ্রাম জিঙ্ক ফসফাইড বিষটোপ কাগজে শক্ত করে পুটলি বেঁধে গর্তের ভিতরে দিতে হয়। সতেজ গর্তের আশে পাশে কাগজে বা মাটির পাত্রে বিষটোপ রেখে দেওয়া যায়।

১৪। মুগ-রোপা আমন-গম

লালমনিরহাট, রংপুর এবং নীলফামারিস্থ ফার্মিং সিস্টেম (এমএলটি) গবেষণা এলাকায় ১৯৮৬ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত গবেষণা করে এই উন্নত ফসলধারা উদ্ভাবন করা হয়। প্রচলিত ফসল ধারা বোনা *আউশ-রোপা আমন-পতিত* এর পরিবর্তে এটি অনুমোদন করা হয়। এই ফসলধারার ডাল শস্য থাকায় তা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ		
ফসল	মুগ	রোপা আমন	গম
জাত	কান্তি	বিআর -১১	কাঞ্চন
বপন	মার্চ	জুলাই	নভেম্বর
বীজের হার (কেজি/হেঃ)	৪০	২০×১৫ সে.মি.	১২৫
সারের মাত্রা (কেজি/হেঃ)ইউরিয়া	৩০ থেকে ৩৫	১৭০ থেকে ১৮০	১৩০ থেকে ১৪০
টিএসপি	৩০ থেকে ৯৫	১২০ থেকে ১২৫	১১০ থেকে ১৩০
এমপি	২০ থেকে ৩০	৫০ থেকে ৬০	৪৫ থেকে ৭৫
জিপসাম	—	—	১০০ থেকে ১২০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সবটুকু সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়	টিএসপি, এমপি শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। ইউরিয়া চারা রোপণের ১৫, ৩৫ এবং ৫০ থেকে ৫৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হয়।	সবটুকু টিএসপি, এমপি, জিপসাম এবং ইউরিয়া সারের অর্ধেক শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়। বাকি ইউরিয়া সার সর্বোচ্চ কুশি গজানোর সময় দিতে হয়।
ফসল সংগ্রহ	জুন	নভেম্বর	মার্চ
ফলন (টন/হেক্টর)	১. ০	৫.০	২ থেকে ২,৫

বিভিন্ন গম জাতের এলাকাভিত্তিক ফলন

জাত	ফলন (টন / হেক্টর)			
	দিনাজপুর	রাজশাহী	যশোহর	গড়
কাঞ্চন	৫.৩২	৩.৪৮	৪.০৫	৪.২৮
আকবর	৪.৬১	৩.৬৬	৪.৬৩	৪.৩০
অঘ্রাণী	৪.৮৫	৩.৬৮	৪.৩৮	৪.৩০
সওগাত	৫.১৩	৪.২৪	৪.২৪	৪.৫৪
প্রতিভা	৫.০৮	৩.৭২	৪.১৩	৪.৩১
বার্ড-৫১৮	৫.৩৯	৩.৭১	৩.৬৭	৪.২৬
ডুরাম	২,৪৯	৩.২৮	৪.২৯	৩.৫২
ট্রিটিকেল	৪.২৭	৪.২৮	৪.০৯	৪.২১

সূত্র : Razzak *et. al.*, 1995, WRBARI.

ষোড়শ অধ্যায়

উন্নত জাতের গম উৎপাদন

১। ভূমিকা

বাংলাদেশে দ্বিতীয় খাদ্যশস্য বলতে গমকেই বোঝায়। স্বাধীনতার পূর্বে এদেশে মাত্র ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে দেশীয় জাতের গম আবাদ হতো, যার মোট উৎপাদন ছিল মাত্র ১ লক্ষ টন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উচ্চ ফলনশীল জাতের গম আবাদ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং বিদেশ থেকে বীজ আমদানির ব্যবস্থা করা হয়। দেশীয় জাতের তুলনায় উচ্চ ফলনশীল জাতের ফলন তিন গুণেরও বেশি হওয়ায় গম আবাদে তখন বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। প্রতি বছরই গম চাষাধীন জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৮৫ সালের মধ্যে প্রায় ৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে গম আবাদ সম্প্রসারিত হয় এবং উৎপাদন ১২ লক্ষ টনে উন্নিত হয়। পরবর্তীতে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে গত ১৯৯৮ মৌসুমে ৮ লক্ষ হেক্টর জমি হতে ১৮ লক্ষ টন গম উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশের গম গবেষণা কেন্দ্র হতে এ পর্যন্ত ২০টি উচ্চ ফলনশীল জাত চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করেছে। বর্তমানে এদেশে আবাদকৃত জাতগুলোর মধ্যে সোনালিকা, আকবর, কাঞ্চন, অঘ্রাণী এবং প্রতিভা খুবই ভাল ফলন দিচ্ছে। ভবিষ্যতে এদেশে অন্য জাতগুলোর আবাদ সম্প্রসারণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক ধরনের গমের চাষাবাদ হয়ে থাকে। এর মধ্যে উচ্চ ফলনশীল সবচেয়ে জনপ্রিয় জাতগুলোর বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

২। গমের জাত

কাঞ্চন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে দুটি ভারতীয় জাত ইউপি-৩০১ এবং সি-৩০৬-এর মধ্যে সঙ্করায়ণ করে কাঞ্চন জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং তা ১৯৮৩ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

১. এ জাতের গাছের উচ্চতা ৯০ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার।

২. কুশির সংখ্যা ৬ থেকে ৭টি।

৩. পাতা কিছুটা খাড়া, নিশান পাতা খাড়া ও খুব চওড়া নয়।

৪. শীষ বের হতে ৬৫ থেকে ৭০ দিন সময় লাগে, প্রতি শীষে ৩৫ থেকে ৪০ টি দানা থাকে।

৫. দানা সাদা, আকারে বড় এবং হাজার দানার ওজন ৪৮ থেকে ৫২ গ্রাম।

৬. চারা অবস্থায় গাছের কুশিগুলো মাটির উপরে ছড়ানো থাকে।

৭. দানা আকারে বড় ও শক্ত।
৮. বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৬ থেকে ১১২ দিন সময় লাগে।
৯. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৩,৫০০ থেকে ৪,৮০০ কেজি ফলন হয়। উন্নত ব্যবস্থাপনায় ফলন হেক্টর প্রতি ৬,৫০০ কেজি হতে পারে।
১০. জাতটি দেশের সকল অঞ্চলে চাষের জন্য উপযোগী।
১১. বর্তমানে জাতটি খুবই জনপ্রিয় এবং প্রায় ৮০ ভাগ এলাকায় এ জাতের আবাদ হচ্ছে।

৩। আকবর

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, যশোহর, কুষ্টিয়া ও খুলনা জেলায় এ জাতের ফলন ভাল হয়। জাতটি দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জন্যও উপযোগী।

আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র, সিমিট, মেক্সিকোতে রবিন ও টোবারী নামক দুটি জাতের মধ্যে সঙ্করায়ণের পর কৌলিক সারি ১৯৭৭ সালে বাছাইকরণ নার্সারির মাধ্যমে বাংলাদেশে আকবর নামে ১৯৮৩ সালে অনুমোদিত হয়।

১. এ জাতের গাছের উচ্চতা ৮৫ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার।
২. কুশির সংখ্যা ৬ থেকে ৭টি, পাতা কিছুটা হেলানো, নিশান পাতা খুবই চওড়া ও লম্বা।
৩. শীষ বের হতে ৫০ থেকে ৫৫ দিন সময় লাগে।
৪. প্রতি শীষে ৫০ থেকে ৫৫টি দানা থাকে।
৫. দানা সাদা, আকারে মাঝারি।
৬. হাজার দানার ওজন ৩৭ থেকে ৪২ গ্রাম।
৭. বোনা থেকে কাটা পর্যন্ত ১০৩ থেকে ১০৮ দিন সময় লাগে।
৮. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৩,৫০০ থেকে ৪,৫০০ কেজি হয়। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল।

৪। অঘ্রানী

দেরিতে বপনের জন্য এ জাতটি বিশেষভাবে উপযোগী। হাল্কা বেলে মাটিতে ভাল হয়।

আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র, মেক্সিকো হতে সনোরা/পি ৪১৬০ই/সনোরা/ইনিয়া নামক কৌলিক সারিটি পাকিস্তানে পাঞ্জাব-৮১ নামে নামকরণ করা হয়। ১৯৮২ সালে বাছাইকরণ নার্সারির মাধ্যমে উক্ত জাতটি বাংলাদেশে আনায়ন করা হয় এবং অঘ্রাণী নামে ১৯৮৭ সালে অনুমোদন লাভ করে।

১. এ জাতের গাছের উচ্চতা ৮৫ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার।
২. কুশির সংখ্যা ৫ থেকে ৬টি, পাতা কিছুটা হেলানো।
৩. নিশান পাতা খুবই চওড়া ও লম্বা।
৪. গাছের পাতা ও কাণ্ডে মোমের পাতলা আবরণ লক্ষ্য করা যায়।
৫. শীষ বের হতে ৫৫ থেকে ৬০ দিন সময় লাগে।
৬. প্রতি শীষে ৫০ থেকে ৫৫টি দানা থাকে।

৭. দানার রঙ সাদা, আকারে মাঝারি এবং হাজার দানার ওজন ৩৮ থেকে ৪২ গ্রাম।
৮. পাতার গোড়ায় বেগুনি রঙের লিগ্যুল (ligule) থাকে।
৯. বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৩ থেকে ১১০ দিন সময় লাগে।
১০. উন্নত প্রযুক্তিতে চাষ করলে ফলন হেক্টর প্রতি ৩,৫০০ থেকে ৪,০০০ কেজি হয়।
১১. জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল।

প্রতিভা

১৯৮২ সালে বাছাইকরণ নার্সারিতে কে–ইউ–১২ নামক কৌলিক সারিটি বাংলাদেশে নির্বাচন করা হয় এবং ১৯৯৩ সালে তা প্রতিভা নামে অনুমোদিত হয়।

১. এ গাছের উচ্চতা ৮৫ থেকে ৯৫ সেন্টিমিটার।
২. কুশির সংখ্যা ৬ থেকে ৭টি।
৩. পাতা কিছুটা খাড়া, নিশান পাতা খাড়া ও খুব চওড়া নয়।
৪. শীষ বের হতে ৬০ থেকে ৬৫ দিন সময় লাগে, শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে ৩৫ থেকে ৪৫টি দানা থাকে।
৫. দানা সাদা, আকারে বড় ও হাজার দানার ওজন ৪২ থেকে ৪৮ গ্রাম।
৬. গাছের কাণ্ডের পর্বে (node) ছোট সূক্ষ্ম লোম থাকে।
৭. বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫ থেকে ১১০ দিন সময় লাগে।
৮. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন হেক্টর প্রতি ৩,৮০০ থেকে ৪,৫০০ কেজি পাওয়া যায়।
৯. জাতটি পাতার মরিচা ও দাগ রোগ সহনশীল।

সৌরভ

আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র, সিমিট, মেক্সিকোতে নেকোজারি এবং ভেরি জাতের মধ্যে সঙ্করায়ণকৃত কৌলিক সারিটি বাছাইকরণ নার্সারির মাধ্যমে ১৯৮৯ সালে এদেশে আনা হয়।

১. এ গাছের উচ্চতা ৯০ থেকে ১০০ সেন্টিমিটার।
২. কুশির সংখ্যা ৫ থেকে ৬টি।
৩. পাতা চওড়া, হেলানো ও গাঢ় সবুজ।
৪. কাণ্ড শক্ত, মোটা, ঝড়–বৃষ্টিতে হেলে পড়ে না।
৫. নিশান পাতা চওড়া ও হেলে থাকে।
৬. শীষ বের হতে ৬০ থেকে ৬৭ দিন সময় লাগে।
৭. প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪২ থেকে ৪৮টি।
৮. দানার রঙ সাদা এবং হাজার দানার ওজন ৪০ থেকে ৪৫ গ্রাম।
৯. নিশান পাতার নিচের দিকে মোমের মতো পাতলা আবরণ থাকে।
১০. নিচের গ্লুমের (glume) ঠোঁট বড় (প্রায় ৫ মিলিমিটার)।
১১. বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২ থেকে ১১০ দিন সময় লাগে।

১২. উন্নত পদ্ধতিতে আবাদ করলে হেক্টর প্রতি ফলন ৩,৫০০ থেকে ৪,৬০০ কেজি পাওয়া যায়।
১২. জাতটি পাতার দাগ রোগ–সহিষ্ণু এবং পাতার মরিচা রোগ সহনশীল।
১৩. দেশের সকল অঞ্চলের জন্য উপযোগী।

গৌরব

দেশে সকল অঞ্চলের জন্য উপযোগী। যে কোনো অবস্থায় বর্তমানে আবাদকৃত জাতের তুলনায় কমপক্ষে ১০ থেকে ২০ ভাগ বেশি ফলন দেয়।

আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র, সিমিট, মেক্সিকোতে টুরাকো এবং চিলেরো জাতের মধ্যে সঙ্করায়ণকৃত কৌলিক সারিটি ১৯৯১ সালে বাছাইকরণ নার্সারির মাধ্যমে বাংলাদেশে আসে।

১. এ গাছের উচ্চতা ৯০ থেকে ১০২ সেন্টিমিটার।
২. কুশির সংখ্যা ৫ থেকে ৬টি।
৩. পাতা গাঢ় সবুজ, সরু।
৪. নিশান পাতা খাড়া, সরু ও কিছুটা ভাজ করা।
৫. শীষ বের হতে ৬০ থেকে ৬৫ দিন সময় লাগে।
৬. শীষ লম্বা এবং অগ্রভাগ সরু, প্রতি শীষে ৪৫ থেকে ৫০টি দানা থাকে।
৭. দানার রঙ সাদা এবং হাজার দানার ওজন ৪০ থেকে ৪৮ গ্রাম।
৮. বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০০ থেকে ১০৮ দিন সময় লাগে।
৯. উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টর প্রতি ৩,৬০০ থেকে ৪,৮০০ কেজি ফলন পাওয়া যায়।
১০. এ জাতটি পাতার মরিচা রোগ এবং দাগ রোগ সহনশীল।

৫। গমের উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তি সারমর্ম

বপনের সময় : বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি হতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। যেসব জমিতে ধান কাটতে ও জমি তৈরি করতে বিলম্ব হয় সেসব ক্ষেত্রে কাঞ্চন ছাড়াও আকবর, অঘ্রাণী, প্রতিভা ও গৌরব বপন করলে খুব ভাল ফলন পাওয়া যায়।

বীজের হার : বীজ গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮৫ ভাগের বেশি থাকলে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হয়।

বীজ শোধন : ভিটাভেক্স ২০০ প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হয়।

বপন পদ্ধতি : সারিতে অথবা ছিটিয়ে গম বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরির পর লাঙ্গল দিয়ে নালা তৈরি করে ৪ থেকে ৫ সেন্টিমিটার গভীরে ও ২০ সেন্টিমিটার দূরে দূরে গম বীজ বুনতে হয়।

৬। সার প্রয়োগ

গম চাষে নিম্নবর্ণিত সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সারের পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	সেচসহ	সেচছাড়া
ইউরিয়া	১৮০ থেকে ২২০	১৪০ থেকে ১৮০
টিএসপি	১৪০ থেকে ১৮০	১৪০ থেকে ১৮০
এমপি	৪০ থেকে ৫০	৪০ থেকে ৫০
জিপসাম	১১০ থেকে ১২০	১১০ থেকে ১২০

সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ইউরিয়া সারের দুই–তৃতীয়াংশ এবং সম্পূর্ণ ফসফেট, পটাশ ও জিপসাম শেষ চাষের পূর্বে প্রয়োগ করে মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি এক–তৃতীয়াংশ ইউরিয়া প্রথম সেচের সময় উপরিপ্রয়োগ করতে হয়। সেচ ছাড়া চাষের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সার অর্থাৎ ইউরিয়া, ফসফেট, পটাশ ও জিপসাম শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হয়।

৭। পরিচর্যা

১. মাটির প্রকারভেদে সাধারণত ২ থেকে ৩টি সেচের প্রয়োজন হয়।
২. প্রথচ সেচ চারার তিন পাতার সময় (অর্থাৎ চারার বয়স যখন ১৭ থেকে ২১ দিন)।
৩. দ্বিতীয় সেচটি গমের শীষ বের হওয়ার সময় (বয়স যখন ৫৫ থেকে ৬০ দিন)।
৪. তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫ থেকে ৮০ দিন পর) প্রয়োগ করতে হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

১. প্রথম সেচের পর জমিতে আগাছা দমনের জন্য নিড়ানি দিতে হয়।
২. ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ হলে ফাঁদ পেতে বা বিষটোপ (জিংক ফসফাইড) ব্যবহার করে ইঁদুর দমন করা যায়। তাছাড়া ল্যানিরেটও ব্যবহার করা যেতে পারে। ইঁদুরের গর্তে ফসটক্সিন ট্যাবলেট দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে রাখলে ইঁদুর মারা যায়।

৮। গমের রোগ : গমের পাতার মরিচা রোগ

Puccinia recondida নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

প্রথমে পাতার উপর ছোট গোলাকার হলদে দাগ পড়ে। শেষ পর্যায়ে এই দাগ মরিচার মতো দেখায়। হাত দিয়ে আক্রান্ত পাতা ঘষা দিলে হাতে লালচে মরিচার মতো গুঁড়া দেখা যায়। এ রোগের লক্ষণ প্রথমে নিচের পাতায়, ধীরে ধীরে সব পাতায়, এমনকি কাণ্ডেও দেখা যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১। রোগ প্রতিরোধী গমের কাঞ্চন, আকবর, অঘ্রাণী, প্রতিভা, সৌরভ, গৌরব।
২। সুষম সার প্রয়োগ করতে হয়।
৩। টিল্ট ১০০ ইসি নামক ছত্রাক বারক (০.০৪%) অর্থাৎ ১ মিলিলিটার ওষুধ আড়াই লিটার পানিতে মিশিয়ে ১২ থেকে ১৫ দিন অন্তর ৩ থেকে ৪ বার স্প্রে করতে হয়।

৯। গমের পাতার দাগ রোগ

Bipolaris sorokiniana নামক ছত্রাক এ রোগ ঘটায়।

রোগের লক্ষণ

প্রথমে নিচের পাতায় বাদামি ডিম্বাকার দাগ পড়ে। পরে দাগ আকারে বাড়তে থাকে এবং গমের পাতাকে ঝলসে দেয়।

রোগের জীবাণু বীজে কিংবা ফসলের পরিত্যক্ত অংশে বেঁচে থাকে।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১। রোগমুক্ত ক্ষেত হতে বীজ সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

২। গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হয়।

৩। প্রতি কিলোগ্রাম গম বীজে ২.৫০ থেকে ৩.০ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হয়।

৪। টিল্ট ২৫০ ইসি (০.০৪%) প্রতি আড়াই লিটার পানিতে এক মিলিলিটার ওষুধ ১২ দিন অন্তর ৩ বার স্প্রে করতে হয়।

১০। গমের গোড়া পচা রোগ

Sclerotium rolfsii নামক ছত্রাক দ্বারা গমের এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ

এ রোগের ফলে মাটির সমতলে গাছের গোড়ায় হলদে দাগ দেখা যায়। পরে গাঢ়-বাদামি বর্ণে পরিণত হয়। পরবর্তীতে পাতা শুকিয়ে গাছ মরে যায়।

রোগের জীবাণু মাটিতে কিংবা ফসলের পরিত্যক্ত অংশে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে।

সাধারণত বৃষ্টির পানি কিংবা সেচের পানি দিয়ে এক জমি হতে অন্য জমিতে বিস্তার লাভ করে।

প্রতিকার ব্যববস্থা

১। রোগ প্রতিরোধী জাতের ফসল, যেমন— কাঞ্চন, আকবর, অঘ্রাণী, প্রতিভা, সৌরভ ও গৌরব চাষ করতে হয়।

২। মাটিতে সবসময় পরিমিত আর্দ্রতা রাখা প্রয়োজন।

৩। শস্য পর্যায়ে অনুসরণ করতে হয়।

৪। ভিটাভেক্স ২০০ দিয়ে প্রতি কেজি গম বীজে ২.৫ থেকে ৩.০ ভিটাভেক্স ২০০ বীজ শোধন করতে হয়।

১১। গমের আলগা ঝুল রোগ

Ustilago tritici নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

রোগের লক্ষণ

গমের শীষ বের হওয়ার সময় এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ছত্রাকের আক্রমণের ফলে গমের গর্ভাশয় প্রথম দিকে পাতলা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। পরে তা ফেটে যায় এবং দেখতে ঝুলের

মতো দেখায়। ছত্রাকের স্পোর সহজেই বাতাসের মাধ্যমে অন্যান্য গাছে ও অন্য ক্ষেতের গমে সংক্রমিত হয়।

রোগের জীবাণু বীজের ভ্রূণে জীবিত থাকে। পরবর্তী বছর আক্রান্ত বীজ জমিতে বুনলে বীজের অঙ্কুরোদ্গমের সময় জীবাণুও সক্রিয় হয়ে উঠে।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. রোগ প্রতিরোগী জাত, যেমন— কাঞ্চন, আকবর, অঘ্রাণী, প্রতিভা, সৌরভ ও গৌরব।
২. রোগমুক্ত জমি হতে বীজ সংগ্রহ করতে হয়।
৩. ভিটাভেক্স ২০০ (২.৫ থেকে ৩.০ গ্রাম/ কেজি বীজ) দিয়ে বীজ শোধন করতে হয়।

১২। গমের বীজের কালো দাগ রোগ

Dreschlera প্রজাতি ও *Alternaria* প্রজাতির ছত্রাকসমূহের সাহায্যে গমের এ মারাত্মক রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

এ রোগের ফলে গমের খোসায় বিভিন্ন আকারের বাদামি অথবা কালো দাগ পড়ে। বীজের কেন্দ্রস্থলেও দাগ পড়ে এবং পরবর্তীতে সম্পূর্ণ বীজে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের জীবাণু বীজের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়ে থাকে।

প্রতিকার ব্যবস্থা

১. সুস্থ বীজ সংগ্রহ করে বপন করতে হয়।
২. ভিটাভেক্স- ২০০ নামক ছত্রাকবারক দিয়ে (২.৫ থেকে ৩.০গ্রাম/ কেজি বীজ) বীজ শোধন করতে হয়।

১৩। গম চাষের অন্যান্য প্রযুক্তি : বিনা চাষে (zero tillage) গম আবাদ

বিনা চাষে গম আবাদ পদ্ধতিতে আমন ধান কাটা ও গম বোনার মধ্যবর্তী সময় গমের আবাদ করা যায় এবং গম চাষের খরচ কমিয়ে আনা যায়। যেসব এলাকায় ধান কাটার পর জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকে অর্থাৎ হাটলে পায়ের দাগ পড়ে এমন অবস্থায় বিনা চাষে আবাদ সম্ভব।

জমিতে রস না থাকলে ধান কাটার পর পরই হাল্কা সেচ দিয়ে 'জো' আসলে বীজ বোনা দরকার। বীজ বোনার পর ১৫দিন পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হয়। পাখির উপদ্রব কমানো এবং রোদে শুকিয়ে যাওয়ায় রোধ করার জন্য বীজ গোবর গুলানো পানির মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ডুবিয়ে রাখার পর উঠিয়ে শুকাতে হয় যেন বীজের গায়ে গোবরের প্রলেপ লাগে।

বিনা চাষে গম আবাদে রাসায়নিক সার দুভাগে প্রয়োগ করা যায়। প্রথমত বীজ ও সার একই সময়ে ছিটানো চলে অথবা গম বোনার ১৭ থেকে ২১ দিনের মধ্যে জমিতে প্রথম হাল্কা সেচের আগে বা পরে অনুমোদিত হারে সব সার প্রয়োগ করা যায়।

বীজ বোনার ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আগাছা দমন করা প্রয়োজন। বিনা চাষে গম আবাদ প্রযুক্তিটি কৃষক পর্যায়ে এখনো তেমন প্রচলিত হয়নি।

১৪। স্বল্প চাষে (Reduced tillage) গম আবাদ

দেশী লাঙল দিয়ে দুবার চাষ করে গম আবাদ করা যায়। এক্ষেত্রে ধান কাটার পর জমিতে 'জো' আসার সাথে সাথে চাষ দিতে হয়। যদি 'জো' না থাকে তবে সেচ দেওয়ার পর 'জো' আসলে চাষ করতে হয়। অথবা দ্বিতীয় চাষের সময় লাঙলের পিছনে আনুমানিক ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে সারিতে বীজ বোনা যায়।

১. বপনের পর ১৫ দিন পযর্ন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে হয়।
২. বপনের ১৭ থেকে ২১ দিনের মধ্যে হাল্কাভাবে প্রথমে সেচ দিতে হয়।
৩. প্রথম সেচের সময় ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়।
৪. বপনের ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আগাছা দমন করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

১৫। গমের বীজ সংরক্ষণ প্রযুক্তি

গ্রামীণ পরিবেশে উন্নত পদ্ধতিতে গম বীজ সংরক্ষণ গম চাষের একটি অন্যতম বিষয়। কারণ উন্নতমানের গম বীজের অভাবে অনেক চাষী গম বপন করতে পারে না। এজন্য কৃষক পর্যায়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কিভাবে বীজ সংরক্ষণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রথমে পুষ্ট বীজ ভালভাবে রোদে শুকাতে হয়। ড্রাম, কেরোসিন টিনে বায়ুরোধক অবস্থায় বীজ সংরাক্ষণ সবচেয়ে উত্তম। ০.১২ মিলিমিটার পুরু পলিথিন ব্যাগেও বীজ ভাল থাকে। ব্যাগটিকে চটের বস্তার ভেতরে ঢুকিয়ে রাখতে হয়। এছাড়া আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া মাটির কলস বা মটকায় বীজ রাখা যায়।

সব ক্ষেত্রেই বীজ দিয়ে পাত্র ভর্তি করতে হয় তা না হলে পোকার আক্রমণ হতে পারে। পাত্রে বীজ রাখার পূর্বে ঠাণ্ডা করে নিতে হয়। পাত্র সরাসরি মেঝেতে না রেখে মাচায় রাখা ভাল।

১৬। গম মাড়াই

গম মাড়াই করার জন্য বাংলাদেশে একটি উন্নতমানের মাড়াই যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ যন্ত্র ব্যবহার করে গমের মাড়াই সমস্যা সমাধান করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, গমে শুঙ থাকায় এর ম্যানুয়েল মাড়াইয়ে সমস্যা দেখা দেয়।

এখানে পা-চালিত গম মাড়াই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

পা-চালিত গম মাড়াই যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

১। ঘণ্টায় প্রায় ৪০ কেজি গম মাড়াই করা যায় ;
২। যন্ত্রের জীবনকাল কমপক্ষে পাঁচ বছর ;
৩। যন্ত্রের মূল্য প্রায় ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা ;
৪। মাড়াই খরচ ১০০ কেজি গমের জন্য ১৮ (আঠার) টাকা ;
৫। এ মাড়াই যন্ত্রটি দেশীয় দ্রব্য দিয়ে তৈরি ।

সপ্তদশ অধ্যায়

বার্লি

১। ভূমিকা

বার্লির অপর নাম যব। এদেশে দীর্ঘদিন ধরে যবের চাষ হয়ে আসছে। সাধারণত খরাঞ্চলে, চর এবং অনুর্বর জমিতে স্বল্প ব্যয়ে-এর চাষাবাদ করা হয়। যব লবণাক্ততা সহনশীল। বার্লি দিয়ে শিশু খাদ্য, ওভালটিন, হরলিক্স প্রভৃতি সুস্বাদু খাদ্য তৈরি হয়। পুষ্টি মানের দিক থেকে গমের চেয়ে উন্নত।

২। বাংলাদেশে বার্লি উৎপাদন তথ্য

জেলা	১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
ঢাকা	—	—	২৫	—
ফরিদপুর	১৬৪০	৩৫৫	১৪৭৫	৩৪৫
জামালপুর	২৭০	৬৫	২৭০	৬৫
টাঙ্গাইল	১৭৩৫	৬১৫	১৬৮৫	৫৯৫
বরিশাল	৫০	১০	৫৫	১৫
যশোর	—	—	—	—
খুলনা	—	—	—	—
কুষ্টিয়া	২১০০	৪৯৫	২১৬০	৫৯০
দিনাজপুর	৫৩৫	৮৫	৬৭০	১১০
পাবনা	৩৪২০	৯৮০	৩৪৪০	১০১০
রাজশাহী	১৩৩৪০	৩৪০০	১৩৪৪৫	৩২৪০
রংপুর	২৫	১০	২০	০৫
বাংলাদেশ	**২৩১১৫**	**৬০১৫**	**২৩২৪৫**	**৫৯৮৫**

৩। বার্লির জাত

বাংলাদেশে গবেষণার মাধ্যমে বেশ কয়েকটি বার্লির জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। এসব জাতের মধ্যে জনপ্রিয় অনুমোদিত জাতগুলোর বর্ণনা এখানে দেওয়া হলো।

বারি বার্লি-১

১. সিমিট থেকে ১৯৮৮ সালে এ জাতটি বাংলাদেশে আনয়ন করা হয় এবং ১৯৯৪ সালে বারি বার্লি-১ নামে জাতটি অবমুক্ত করা হয়।

২. এ জাতটির উচ্চতা ৮৫ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার।

৩. পাতার রঙ সবুজ এবং কাণ্ড শক্ত, ফলে নুয়ে পড়ে না। বীজগুলো শীষে ছয় সারি বিশিষ্ট অবস্থায় থাকে।

৪. দানা খোসাযুক্ত।

৫. দানার রঙ সোনালি।

৬. হাজার দানার ওজন প্রায় ৩৭ গ্রাম।

৭. এ দেশের আবহাওয়ায় এর জীবনকাল ১০৮ থেকে ১১২ দিন।

৮. এ জাতটিতে রোগবালাই এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ খুব কম।

৯. সেচ ছাড়া চাষ করলেও হেক্টর প্রতি ২.০ থেকে ২.৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

১০. একটি সেচ প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি পায়।

৪। বারি বার্লি -২

১. বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৯৪ সালে বারি বার্লি-২ জাতটি মুক্তায়িত করে।

২. এ জাতের গাছ মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন।

৩. কাণ্ড শক্ত, ফলে সহজে হেলে পড়ে না।

৪. দানা বড় আকৃতির।

৫. হাজার বীজের ওজন ৩৫ থেকে ৩৮ গ্রাম এবং দানাতে আমিষ থাকে।

৬. বারি বার্লি-২ জাতটি গোড়া পচা ঝলসানো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

৭. সেচবিহীন চাষে এ জাতটি হেক্টর প্রতি ২.০ থেকে ২.৫ টন এবং একটি সেচসহ চাষে ২.৫ থেকে ৩.০ টন ফলন দেয়।

৫। বারি বার্লির উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি ও মাটি

পানি জমে না এমন বেলে-দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি বার্লি চাষের জন্য উপযুক্ত। জমিতে 'জো' আসার পর মাটির প্রকার ভেদে ২ থেকে ৪টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করে বুনতে হয়।

বপনের সময়

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এর বীজ বোনা যায়। তবে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বুনলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

বীজের হার

ছিটিয়ে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ১০০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। অংকুরোদ্গম ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগের নিচে হলে সে বীজ বপন না করা ভালো।

বপন পদ্ধতি

বীজ ছিটিয়ে অথবা সারিতে বোনা যায়। সারিতে বুনলে দু'সারির মাঝে দূরত্ব ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার রাখতে হয়। লাঙল দিয়ে ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার গভীরে সারি টেনে বীজ বুনে মাটি দিয়ে ভালভাবে ঢেকে দিতে হয়।

নিড়ানো ও আগাছা দমন

চারা গজানোর পর ২ থেকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে চারাগুলোর ৮ থেকে ১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রেখে বাকি চারা পাতলা করে দিতে হয়। জমিতে আগাছা দেখা দিলে নিড়িয়ে দিতে হয়।

সার প্রয়োগ

সার প্রয়োগে বার্লির ফলন বৃদ্ধি পায়। হেক্টর প্রতি ১৬৫ থেকে ১৮৫ কেজি ইউরিয়া, ৮০ থেকে ১০০ কেজি টিএসপি ও ৬০ থেকে ৭০ কেজি এমপি প্রয়োগ করা উত্তম।

সেচের ব্যবস্থা থাকলে শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া এবং সবটুকু ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগ করতে হয়।

বাকি অর্ধেক ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে বীজ বপনের ৩০ থেকে ৩৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ বোনার ৫৫ থেকে ৬০ দিন পর সেচের পর পরই প্রয়োগ করা উচিত।

পানি সেচ ও নিস্কাশন

রবি মৌসুমে খরা দেখা দিলে ১ থেকে ২টি হাল্কা সেচের ব্যবস্থা করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়। তবে খেয়াল রাখতে হয় যেন জমিতে কোনো অবস্থাতেই পানি জমে না থাকে।

৬। **বার্লির রোগ দমন : পাতা ঝলসানো রোগ**

বার্লির রোগসমূহের মধ্যে বাংলাদেশে পাতা ঝলসানো রোগ ও গোড়াপচা রোগ গুরুত্বপূর্ণ। এখানে এ দুটি প্রধান রোগের লক্ষণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা আলোচনা করা হলো।

বার্লির পাতা ঝলসানো রোগ

রোগের লক্ষণ

১. *Decslera* প্রজাতির ছত্রাক হতে এ রোগটি ঘটে।
২. সবুজ পাতায় ঈশৎ বাদামি রঙের ছোট ছোট ডিম্বাকার দাগ পড়ে।
৩. পরবর্তীতে এসকল দাগ বাদামি থেকে কালো বর্ণ ধারণ করে।
৪. দাগগুলো একত্রিত হয়ে সমস্ত পাতা বাদামি বর্ণ ধারণ করে।
৫. ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, বীজ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে।
৬. অধিক আর্দ্রতা ও উচ্চ তাপমাত্রা ও রোগ বিস্তারে সহায়তা করে।

প্রতিকার ব্যবস্থা

(১) গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হয় ;
(২) টিল্ট ২৫০ ইর্সি (০.০৪%) হারে ১০ থেকে ১২ দিন পর পর স্প্রে করতে হয় ;
(৩) ভিটাভ্যাক্স-২০০ প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম ওষুধ দিয়ে বীজ শোধন করতে হয়।

৭। বার্লির গোড়াপচা রোগ

Sclerotium rolfsi নামক ছত্রাক হতে এ রোগটি হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

১. এ রোগজীবাণু প্রায় সকল ক্ষেত্রে মাটির কাছে কাণ্ড ও মূলের সংযোগস্থলে আক্রমণ করে।

২. প্রথমে গাছের গোড়ায় হলুদ দাগ দেখা যায় যা গাঢ় বাদামি দাগে পরিণত হয় ও আক্রান্তস্থলের চারদিকে ঘিরে ফেলে।

৩. তারপর গাছ শুকিয়ে মারা যায়।

৪. অনেক সময় গাছের গোড়ায় ও মাটিতে সরিষার দানার মতো বাদামি থেকে কালো রঙের স্কেলেরোসিয়া দেখা যায়।

৫. রোগের জীবাণু মাটিতে বা ফসলের পরিত্যক্ত অংশে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে এবং বৃষ্টি ও সেচের পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

৬. আর্দ্রতাপূর্ণ মাটি এ রোগ দ্রুত বিস্তারে সহায়ক।

প্রতিকার ব্যবস্থা

(১) সবসময় মাটিতে পরিমিত আর্দ্রতা বজায় রাখা প্রয়োজন ;

(২) শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হয় ;

(৩) ভিটাভ্যাক্স ২০০ প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম ওষুধ দিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভুট্টা চাষ

পৃথিবীতে ভুট্টা উৎপাদনকারী প্রধান প্রধান দেশ হচ্ছে— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, ব্রাজিল ও মেক্সিকো।

১। ভুট্টা উপপ্রজাতির পরিচিতি

ভুট্টার অনেকগুলো প্রজাতি ও উপপ্রজাতি রয়েছে। নিচে এসব উপপ্রজাতির পরিচয় উল্লেখ করা হলো—

ভুট্টার বৈজ্ঞানিক নাম– *Zea mays*

১. ডেন্ট ভুট্টা (Dent) : *Zea mays indentate*
ভুট্টা দানার উপরিভাগ দাঁতের মতো খাঁজ কাটা।

২. ফ্লিন্ট (Flint) : *Zea mays indurata*
ভুট্টার পরিপক্ব দানার উপরিভাগ গোলাকার।

৩. মিষ্টি ভুট্টা (Sweet) : *Zea mays saccharata*
পুষ্ট দানা কিছুটা সংকুচিত দানা মিষ্টি।

৪. খৈ (Pop) ভুট্টা : *Zea mays* everta
দানার আকার ছোট, খৈ তৈরি হয়।

৫. ময়দা (Flour) ভুট্টা : *Zea mays amylacca*
দানা নরম, শেতসার দিয়ে গঠিত।

৬. মোম (Waxy) ভুট্টা : *Zea mays ceritina*
নাম, ভাঙার পর মোমের মতো দেখায়।

৭. পপ (Pop) ভুট্টা : *Zea mays tunicata*
দানা খোসার দিয়ে আবৃত খাদ্যমান কম।

নিচের সারণিতে বিভিন্ন ভুট্টা প্রজাতির পরিচিতি, চাষ এলাকা ও বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো।

বিভিন্ন প্রকার ভুট্টা	চাষ এলাকা	দানার রঙ	অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
ডেন্ট ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	হলদে, সাদা, লাল	দানার উপরিভাগ নরম, সংকুচিত
ফ্লিন্ট ভুট্টা	এশিয়া, ইউরোপ	সাদা, হলদে, লাল, নীল	গাছ ছোট, মোটা, চিকন পোকার আক্রমণরোধী

মিষ্টি ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা	হলদে, সাদা	পুড়িয়ে খাওয়া যায়। গাছ মাঝারি
খৈ ভুট্টা	এশিয়া	হলদে, সাদা, লাল	গাছ ছোট
ময়দা ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	নীল, সাদা	আটা তৈরি করা যায়, গাছ মাঝারি
মোম ভুট্টা	যুক্তরাষ্ট্র	হলদে, লাল	দানায় খোসা আছে

ভুট্টার গুরুত্ব

বিশ্বে উৎপাদন ও ব্যবহারের বিবেচনায় ভুট্টা তৃতীয় দানা খাদ্য ফসল। তবে বাংলাদেশে এর চাষ এখনো সীমিত। যদিও এর ব্যবহার দ্রুত বাড়ছে। পশু খাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার বাংলাদেশে জনপ্রিয় হচ্ছে।

নিচে বাংলাদেশে ভুট্টার গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো—

১। ভুট্টার দানা মানুষ ও পশুপাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

২। ভুট্টার গাছ ও পাতা পশুখাদ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

৩। ভুট্টার গাছ ও খড় কাগজ ও বোর্ডজাতীয় কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

৪। ভুট্টা থেকে তেল উৎপাদিত হয়।

৫। ভুট্টার ভ্রূণে প্রায় ৩৫% তেল, ২০% আমিষ ও ১০% খনিজ দ্রব্য রয়েছে।

৬। হলদে ভুট্টায় প্রচুর ভিটামিন "এ" রয়েছে (প্রতি কেজিতে প্রায় ৫ মিলিগ্রাম)।

৭। ভুট্টা সারা বছর চাষ করা যায়।

৮। আন্তঃফসল হিসেবেও ভুট্টা চাষ করা যায়।

৯। ভুট্টা আন্তঃফসলের উদাহরণ—

ক) মরিচ + ভুট্টা আন্তঃফসল
খ) মিষ্টি কুমড়া + ভুট্টা আন্তঃফসল
গ) মিষ্টি আলু + ভুট্টা আন্তঃফসল
ঘ) শীত সবজি + ভুট্টা আন্তঃফসল
ঙ) আউশ + ভুট্টা আন্তঃফসল

১০। ভুট্টার বহু উচ্চ ফলনশীল জাত রয়েছে। ফলন সংকর ভুট্টা প্রতি শতকে ৪০ কেজি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

১১। ভুট্টা গাছ মাটির গভীর থেকে পুষ্টিদ্রব্য শোষণ করে।

১২। ভুট্টা দিয়ে প্রায় ২০০ ধরনের খাদ্য তৈরি করা যায়।

১৩। চর ও হাওড় এলাকায় পতিত জমিতে চাষ করা যায়।

২। বাংলাদেশে ভুট্টা জমির পরিমাণ (বিবিএস ১৯৯০)

বছর	জমি (হেক্টর)	ফলন (কেজি/হেক্টর)
১৯৮০–৮১	২০২৪	৪৯৪
১৮৮৪–৮৬	৩৬৪৪	৮২৩
১৯৮৭–৮৯	৩২৩৯	৯২৬
১৯৯০–৯২	৪৩০০	১৩০০

ভুট্টা উৎপাদন তথ্য

জেলা	১৯৯৫–৯৬		১৯৯৬–৯৭	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	৬৮০	৫১৫	৩৫০	১৯৫
চট্টগ্রাম	৩৫	২০	৫৫	৩৫
কুমিল্লা	—	—	—	—
খাগড়াছড়ি	৬৫	১৫	৫৫	১৫
নোয়াখালি	—	—	—	—
রাঙ্গামাটি	৪০৬৫	১৫৭৫	২১৬০	৮৪৫
সিলেট	—	—	—	—
ঢাকা	৪০	২০	৪৫	২৫
ফরিদপুর	—	—	—	—
জামালপুর	৩০	১০	২০	১০
কিশোরগঞ্জ	৫	৫	০৫	০৫
ময়মনসিংহ	৩৫	১৫	৩০	১৫
টাঙ্গাইল	৬৫	৩০	৭০	৩৫
বরিশাল	—	—	—	–
যশোর	৭০	৫৫	১২৫	১০০
খুলনা	—	—	—	—
কুষ্টিয়া	১৫৫	৯০	১৮০	১১০
পটুয়াখালী	—	—	—	—
বগুড়া	৪৫	২৫	৪৫	২৫
দিনাজপুর	৩৮৫	১২০	৪৩৫	১৫০
পাবনা	৫	২৫	—	—

রাজশাহী	৪১৫	১২৫	৪২৫	১৪০
রংপুর	১৫৫	৫০	১২০	৪০
বাংলাদেশ	**৬৫৫০**	**২৬৭৫**	**৪১২০**	**১৭৪৫**

বাংলাদেশে প্রধান প্রধান দানা ফসলের ফলন

ফসল	গড়ফলন (কেজি/হেক্টর)	ফলন মান ভুট্টা ১০০ হিসেবে
ভুট্টা	৫,১০০	১০০
গম (উন্নত চাষ)	১,৮৪৫	৩৬
রোপা আমন	২,৫০০	৫০
বোরো ধান	২,৭৫০	৫৫
বোনা আমন ধান	১,৫৫০	৩১
আউশ ধান (উফশী)	২,৩৮৫	৪৭
গম (সাধারণ চাষ)	১,৩৬৭	২৭
অন্যান্য দানা ফসল	৫৮৬	১১

বাংলাদেশে ভুট্টা চাষের সম্ভাব্য জমির পরিমাণ

জমির ধরন	সম্ভাব্য জমির পরিমাণ (লক্ষ হেক্টর)	মন্তব্য
বন্যা উপদ্রুত	৫ থেকে ২০	বন্যায় পানি সরে যাওয়ার পর অক্টোবর-জানুয়ারি মাসে বপন উপযোগী
কর্ষিত পতিত জমি	৭ থেকে ১০	শীতকালীন ভুট্টা
আউশ জমি	৫ থেকে ১০	আউশের অর্ধেক জমির বিকল্প ভুট্টা হিসেবে
খাস জমি	৫ থেকে ১০	খাস ও অশ্রেণিভুক্ত বনাঞ্চল
অন্যান্য	১ থেকে ৫	সাথী বা মিশ্র ফসল হিসেবে

সূত্র: ইসলাম ও কাউল, ১৯৮৬

ভুট্টার সাথে অন্যান্য ফসলের আয়-ব্যয়ের তুলনা

ফসল	মোট খরচ	মোট ব্যয়	আয়-ব্যয়ের অনুপাত
ধান বোরো	১৫,৪৭৪	২১,৭৩৮	১.৪০ : ১
গম	৯,৫৭৬	১৪,৪৪৬	১.৫১ : ১

তুলা	৬,৮৯৭	৯,৪৬৪	১.৩৭ : ১
সরিষা	২,৭৫৬	৪,৫৯৪	১.৬৭ : ১
পেঁয়াজ	১৪,৯০৬	২৩,২৩২	১.৫৬ : ১
আনারস	১৯,৮১৫	৩২,৩৯৮	১.৬৪ : ১
ভুট্টা	৬,৩৪৫	১৪,৪৫৫	২.২৮ : ১

ইলিয়াস ১৯৮৫, ১৯৮৮

ভুট্টা চাষের আয়-ব্যয় হিসাব

ব্যয়	টাকা/হেক্টর
পশুশক্তি	৯৫৬
বীজ	৪৬৩
সার	১,৫২০
বালাইনাশক	৬৫৪

আয়—

মোচা থেকে প্রাপ্ত	১৪,৮৭৬
অন্যান্য দ্রব্য	১,৭২৮
ঝুঁকি বাবদ	১৬,৬০৪
ব্যয়	৩,৫৯৩
প্রকৃত মুনাফা	১২,০১১

৩। খাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার

বিশ্বের অনেক দেশে খাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভুট্টার গাছ, পাতা, মোচা, দানা এবং দানা থেকে তৈরি রকমারি খাদ্য মানুষ ও পশুপাখির ক্যালোরি যোগানে ব্যাপক অবদান রাখছে। আমেরিকা ও আফ্রিকার অনেক দেশে মোট ক্যালোরির প্রায় ৬০ ভাগ আসে ভুট্টা থেকে। নিচে ভুট্টা খাবারের নাম উল্লেখ করা হলো।

(ক) মানুষের খাদ্য : ভুট্টার আটা ও দানাভিত্তিক খাবার

১. মিশ্র রুটি
২. মিশ্র পরোটা
৩. মিশ্র লুচি
৪. ভুট্টার গজা
৫. আলু-ভুট্টা রুটি
৬. জার্ড
৭. ভুট্টা খিচুড়ি
৮. ভুট্টা ফিরনি
৯. ভুট্টা ক্ষীর
১০. হট স্যুপ
১১. ভুট্টা মুরগি স্যুপ

(খ) কাঁচা মোচাভিত্তিক খাবার

১. মোচা পোড়া বা ঝলসানো মোচা
২. মোচা সিদ্ধ
৩. কচি মোচার তরকারি
৪. ভুট্টার চানা
৫. ভুট্টা-চাল খিচুড়ি
৬. ভুট্টা পোলাও

(গ) খই-ভুট্টাভিত্তিক খাবার

১. খই
২. মোয়া
৩. মুরকি
৪. নাড়ু

(ঘ) পশুখাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার

১. সবুজ পাতা ও চারা গাছ
২. পরিপক্ব গাছ
৩. ভুট্টার সাইলেজ
৪. ভুট্টার দানা.

(ঙ) হাঁস-মুরগির খাদ্য হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার

১. ভুট্টা ভাঙা
২. দানাদার সুষম খাদ্য তৈরির উপকরণ

(চ) শিল্প উপাদান হিসেবে ভুট্টার ব্যবহার

১. স্টার্চ বা শ্বেতসার (Starch)
২. ভুট্টার তেল (Corn oil)
৩. কর্ন ফ্লেক্স
৪. বল বর্ধনকারী খাবার
৫. কনফেকশনারি দ্রব্য
৬. কর্ন সিরাপ
৭. টিনজাত ভুট্টা
৮. শিল্পে ব্যবহার (রেয়ন)
৯. গাঁজানো শিল্পে ব্যবহার
১০. বিবিধ শিল্পে ব্যবহার

ভুট্টা ও চালের তুলনামূলক পুষ্টিমান (খাদ্যোপযোগী ১০০ গ্রামে)

উপাদান	ভুট্টার দানা	চাল
শক্তি (ক্যালরি)	৩৪২	৩৪৬
আমিষ (গ্রাম)	১১.১	৬.৪
চর্বি (গ্রাম)	৩.৬	০.৪
খনিজ (গ্রাম)	১.৫	০.৭
ক্যালসিয়াম (মিগ্রা)	১০.০	৯.০
ফসফরাস (মিগ্রা)	৩৪৮.০	১৪৩.০
কেরোটিন	৯০.০	১.০
রিবোফ্ল্যাভিন	১.০	১.০

৪। বাংলাদেশে ভুট্টার জাতসমূহের পরিচিতি

বাংলাদেশে চাষকৃত ভুট্টার জাতসমূহের পরিচিতি এখানে উল্লেখ করা হলো। এবং গ্রন্থের শেষাংশে ভুট্টা চাষ প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র সংযোজিত করা হলো।

ভুট্টার জাত পরিচিতি

জাতের নাম	উৎস	গাছের উচ্চতা সেন্টিমিটার	দানার বর্ণ
বর্ণালী	দেশী	১৮০ থেকে ১৯০	সোনালি
শুভ্রা	দেশী	১৭০ থেকে ১৮০	সাদা
সোয়ান–২	থাইল্যান্ড	১৬৫ থেকে ১৭৫	হলদে
খৈ ভুট্টা	দেশী	১১০ থেকে ১২০	সোনালি
মোহর	উদ্ভাবিত	১৯০ থেকে ২০০	সোনালি
পাহাড়ী	পার্বত্য চট্টোগ্রাম	১১০ থেকে ১২০	মিশ্র
সঙ্কর		১৮০ থেকে ২০০	সোনালি

৫। ভুট্টাভিত্তিক উন্নত ফসল বিন্যাস

(ক) খরিফ ভুট্টা

১	ভুট্টা	রোপা আমন	গোল আলু	(উঁচু সেচ যুক্ত দোআঁশ মাটি)
২	ভুট্টা	মুগ কালাই	সরিষা	(উঁচু বৃষ্টিনির্ভর দোআঁশ মাটি)
৩	ভুট্টা	গম	সরিষা	
৪	ভুট্টা	রোপা আমন	ছোলা/সরিষা/তিশি	
৫	ভুট্টা	রবি ফসল		
৬	ভুট্টা	শাক–সবজি		
৭.	ভুট্টা	চিনাবাদাম		

(খ) রবি ভুট্টা

১	আউশ/পাট	ভুট্টা
২	শাক–সবজি	ভুট্টা
৩	শাক–সবজি— রোপা আমন	ভুট্টা
৪	আউশ/ পাট— রোপা আমন	ভুট্টা
৫	চিনাবাদাম	ভুট্টা

(গ) গো-খাদ্য হিসেবে ভুট্টার ফসল বিন্যাস

১	ভুট্টা	রোপা আমন–গোল আলু
২	ভুট্টা	রোপা আমন– ছোলা/গম/সরিষা
৩	ভুট্টা	বোরো ধান

(ঘ) আন্তঃফসল হিসেবে ভুট্টা চাষ

১	মরিচ + ভুট্টা
২	মিষ্টি আলু + ভুট্টা
৩	মিষ্টি কুমড়া + ভুট্টা
৪	খেসারি (বা মটর) + ভুট্টা (বিনা চাষে)

BANSDOC Library Dhaka

উনবিংশ অধ্যায়

উচ্চ ফলনশীল জাতের ভুট্টা উৎপাদন

১। বর্ণালী

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৬ সালে বর্ণালী জাতটি উদ্ভাবন করে।

স্থানীয় জাতগুলোর চেয়ে বর্ণালী গাছের উচ্চতা বেশি।

১. এ জাতটির মোচা আকারে বেশ বড় এবং আগার দিক কিছুটা সরু।

২. মোচাগুলো অগ্রভাগ পর্যন্ত শক্তভাবে খোসা দিয়ে আবৃত থাকে।

৩. বর্ণালীর দানা সোনালি হলদে রঙের এবং দানাগুলো আকারে বেশ বড়।

৪. হাজার দানার ওজন ১৪৫ থেকে ৩২০ গ্রাম।

৫. তুলনামূলকভাবে বর্ণালী জাতটির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশি।

৬. এ জাতটি রবি মৌসুমে ১৪০ থেকে ১৪৫ দিনে এবং খরিফ মৌসুমে ৯৫ থেকে ১০০ দিনে পাকে।

৭. ফলন রবি মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৫.৫ থেকে ৬.০ টন এবং খরিফ মৌসুমে ৪.০ থেকে ৪.৫ টন হয়।

৮. এ জাতে বেশি পরিমাণে ক্যারোটিন আছে।

৯. বর্ণালী ভুট্টার দানা হাঁস–মুরগির একটি অতি উত্তম খাদ্য উপকরণ।

২। শুভ্রা

১. শুভ্রা নামে ভুট্টার এ উচ্চফলনশীল জাতটি ১৯৮৬ সালে উদ্ভাবন করা হয়েছে।

২. স্থানীয় জাতের চেয়ে শুভ্রা জাতের গাছের উচ্চতা বেশি।

৩. শুভ্রার দানা আকারে বড় এবং পুরো মোচাটাই দানায় ভর্তি থাকে।

৪. এক হাজার দানার ওজন ৩২০ গ্রাম।

৫. এ জাতটির গাছের উপরের অংশের পাতাগুলো নিচের অংশের পাতাগুলোর চেয়ে আকারে ছোট এবং অপেক্ষাকৃত সরু হয়।

৬. জাতটি রবি মৌসুমে ১৩৫ থেকে ১৪৫ দিনে এবং খরিফ মৌসুমে ৯৫ থেকে ১০৫ দিনে পাকে।

৭. পরিপক্ব অবস্থায় মোচা সংগ্রহ করলে প্রতি হেক্টরে ৫০ থেকে ৫৩ হাজার মোচা পাওয়া যায়।

৮. ফলন রবি মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ৪.০ থেকে ৫.৫ টন এবং খরিফ মৌসুমে ৩.৫ থেকে ৪.৫ টন হয়।

৯. দানার রঙ সাদা বলে আটার সাথে মিশিয়ে রুটি তৈরি করা যায়।

৩। খঁইভুট্টা

১. খঁইভুট্টা জাতটি ১৯৮৬ সালে জাত হিসেবে অনুমোদন লাভ করে।

২. গাছ মাঝারি উচ্চতা সম্পন্ন, মোচার উপরের পাতা অপেক্ষাকৃত সরু দানা আকারে ছোট।

৩. হাজার দানার ওজন ১৪৫ থেকে ১৫০ গ্রাম।

৪. খঁইভুট্টা রবি মৌসুমে ১২৫ থেকে ১৩০ দিনে এবং খরিফ মৌসুমে ৯০ থেকে ১০০ দিনে পাকে।

৫. রবি মৌসুমে ফলন হেক্টরে প্রায় ৩.৫ থেকে ৪.০ টন এবং খরিফ মৌসুমে ২.০ থেকে ৩.৫ টন হয়।

৬. খঁইভুট্টার দানা থেকে শতকরা ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ খৈ পাওয়া যায়।

৭. খৈগুলো আকারে বেশ বড় ও সুস্বাদু হয়।

৪। মোহর

১. মোহর জাতটি ১৯৯০ সালে উচ্চ ফলনশীল জাত হিসেবে বাংলাদেশে চাষের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

১. মোহর জাতের গাছ অন্যান্য অনুমোদিত জাতের গাছের চেয়েও বেশ উঁচু, ফলে খড়ের পরিমাণ বেশি হয়।

২. এ জাতটির মোচা পাকার পরেও পাতা বেশ সুবজ থাকে বলে উৎকৃষ্ট গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

৩. মোহর জাতের কাণ্ড বেশ শক্ত হওয়ায় ঝড় বা বাতাসে সহজে হেলে পড়ে না।

৪. এই জাতটির গাছের গড় উচ্চতা রবি মৌসুমে ২০৫ থেকে ২১০ সেন্টিমিটার এবং খরিফ মৌসুমে ২১০ থেকে ২৩০ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে।

৫. মোচাগুলো বেশ মোটা, লম্বা এবং সম্পূর্ণ মোচা দানায় পূর্ণ থাকে।

৬. দানা উজ্জ্বল গাঢ় হলুদ এবং আকারে বেশ বড়।

৭. হাজার দানার ওজন ২৮০ থেকে ১৪৪ গ্রাম। মোহর জাতটি দানা এবং গো-খাদ্য উভয় উদ্দেশ্যে চাষ করা যেতে পারে।

৮. জাতটি রবি মৌসুমে ১৩৬ থেকে ১৪৪ দিনে এবং খরিফ মৌসুমে ৯৫ থেকে ১০৫ দিনে পাকে।

৯. রবি মৌসুমে ফলন হেক্টর প্রতি ৫.০ থেকে ৫.৫ টন এবং খরিফ মৌসুমে ৩.৫ থেকে ৪.৫ টন হয়।

৫। বারি ভুট্টা -৫

১. সালে নাইজেরিয়া থেকে সংগৃহীত ১০টি ইনব্রেড থেকে ৫টি বাছাই করা হয়।

২. পরবর্তীতে ১টি অগ্রবর্তী কম্পোজিটের সংগে সঙ্করায়ণের মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।

৩. এ জাতের গাছের উচ্চতা ১৮০ থেকে ১৯০ সেন্টিমিটার।

৪. জাতটির মোচা বেশ এবং বড় খোসা দিয়ে আবৃত।

৫. এ জাতের দানার রঙ হলুদ এবং হাজার দানার ওজন প্রায় ২৯৫ থেকে ৩১০ গ্রাম।

৬. জাতটির জীবনকাল ১৩৪ থেকে ১৫৩ দিন।

৭. হেক্টর প্রতি ফলন ৬ থেকে ৬.৫ টন।

৬। বারি ভুট্টা-৬

১. সিমিটের অনেকগুলো কম্পোজিট জাতের মধ্যে থেকে বাছাই করে বারি ভুট্টা-৬ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।

২. রবি মৌসুমে এ জাতটির জীবনকাল ১৪৪ থেকে ১৫০ দিন এবং খরিফ মৌসুমে প্রায় ৯০ থেকে ১১০ দিন।

৩. এ জাতটির গাছের গড় উচ্চতা রবি মৌসুমে ১৬৫ থেকে ১৭৫ সেন্টিমিটার এবং খরিফ মৌসুমে ১৭০ থেকে ১৮৫ সেন্টিমিটার।

৪. এ জাতের মোচা খোসা দিয়ে ভালভাবে আবৃত।

৫. মোচা মাঝারি আকারের।

৬. হাজার দানার গড় ওজন ৩১৭ গ্রাম।

৭. বারি ভুট্টা-৬ জাতে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ কম।

৮. হেক্টর প্রতি ফলন রবি মৌসুমে ৬ থেকে ৭ টন এবং খরিফ মৌসুমে ৫ থেকে ৫.৫ টন।

৭। বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১

১. থাইল্যান্ড থেকে সংগৃহীত ইনব্রেড থেকে বাছাইয়ের মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবিত হয়।

২. জাতটি বাংলাদেশের আবহাওয়া উৎপাদনের উপযোগী।

৩. জাতটির ফলন হেক্টর প্রতি ৭.৫ থেকে ৮.৫ টন।

৪. জীবনকাল খরিফ মৌসুমে ৯০ থেকে ১০০ দিন ও রবি মৌসুমে ১৩৫ থেকে ১৪৫ দিন।

৫. জাতটির দানা বেশ বড়, রঙ হলুদ এবং অগ্রভাগ ভরাট।

৬. এ জাতটির গড় উচ্চতা ১৯০ থেকে ২১০ সেন্টিমিটার।

৭. হাজার দানার গড় ওজন ৫৭০ থেকে ৫৮৫ গ্রাম।

৮. এ জাতটির রোগবালাই ও পোকার উপদ্রব কম হয়।

ভুট্টার সাধারণ চাষ পদ্ধতি

ভুট্টার চাষের আধুনিক কলাকৌশলসমূহ নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা যায়। যথা—

১. জমি নির্বাচন ও প্রস্তুতকরণ

২. বীজ বপন

৩. সার প্রয়োগ ও পানি সেচ

৪. আগাছা, পোকা ও রোগ দমন

৫. ফসল সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ

১। জমি ও মাটি নির্বাচন

ভুট্টা চাষের জন্য উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমি ভাল। তবে শীতকালে চাষ করতে হলে কোনো কোনো মাঝারি নিচু জমিতেই এর চাষ করা যায়। পাহাড়ের ঢাল, উপত্যকা, পাদভূমিসহ ঈষৎ ক্ষারীয় জমিতেও ভুট্টা চাষ করা যায়।**

ভুট্টা চাষের জন্য দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ মাটি ভাল। মাটির অম্লমান ৬.৫ থেকে ৭.৫ উত্তম। সঙ্কর জাতের ভুট্টা চাষ করে অধিক ফলন পেতে হলে জমি উর্বরতাসম্পন্ন হওয়া দরকার।

বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাই ভুট্টা চাষ করা যায়। তবে নিম্নলিখিত মাটিযুক্ত এলাকাসমূহ এ কাজের জন্য ভাল।

১. দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি
২. সেচ সুবিধা থাকলে অন্যান্য মাটি
৩. চর ও হাওড় এলাকা উঁচু পর্যায়ের মাটি যা অক্টোরব মাসে শুকিয়ে যায়।

২। জমি প্রস্তুতকরণ

জমিতে ৫ থেকে ৬টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে ভুট্টার জমি তৈরি করতে হয়। মাটির ঢেলা গুঁড়া করে মাটি ঝুরঝুরে করে মই দিয়ে জমি সমতল করতে হয়। জমিতে প্রয়োগ জৈব সার ইউরিয়ার অংশবিশেষ টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও দস্তা সার জমির শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হয়। জমির আগাছা মাটির সাথে এমনভাবে মিশিয়ে দিতে হয়, যাতে পঁচে গিয়ে সারে পরিণত হয়। বড় আকারের আর্বজনা বেছে বাইরে ফেলে দিতে হয়। জমির জো অবস্থায় গভীরভাবে চাষ দিতে হয়।

৩। বীজ শোধন ও রোপণ

ভুট্টা বীজ সারাবছরই বপন করা যায়। তবে বাংলাদেশে সাধারণত ৩টি মৌসুমে বীজ বপন করা হয়। যেমন-

ক) রবি ভুট্টা : নভেম্বর–ডিসেম্বরে
খ) গ্রীষ্ম ভুট্টা : মার্চ–এপ্রিলে (খরিফ–১)
গ) বর্ষা ভুট্টা : জুলাই-আগস্টে (খরিফ–২)।

বীজ শোধন

বীজ বপনের আগে প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ বা ৩ গ্রাম খিরাম দিয়ে শোধন করে নিলে রোগের আক্রমণ কম হয়।

ভুট্টার উচ্চ ফলন পেতে হলে উন্নত জাত বাছাই করে তা রোপণ করতে হয়।

ভুট্টা বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার। বীজের হার প্রতি শতকে ৮০ গ্রাম। গো-খাদ্য হিসেবে চাষ করতে হলে বীজের পরিমাণ প্রতি শতকে ৩০০ থেকে ৩৫০ গ্রাম দিতে হয়। বীজ রোপণের প্রতিটিতে দুটি করে বীজ দিতে হয়। ৫ থেকে ৮ সেন্টিমিটার গভীরে রোপণ করতে হয়।

৪। সার প্রয়োগ ও পানি সেচ

ভুট্টার পুষ্টি চাহিদা অনেক বেশি। এজন্য অধিক ফলন পেতে হলে ভুট্টা জমিতে সুষম সার দিতে হয়। ভুট্টা জমির প্রয়োজনীয় সার নিচে দেওয়া হলো। প্রতি শতক জমিতে সারের পরিমাণ নিচে উল্লেখ করা হলো—

সারের নাম	সারের পরিমাণ/শতক
ইউরিয়া	১ থেকে ১.৩ কেজি
টিএসপি	০.৭ থেকে .৯ কেজি
এমপি	০.৫ .থেকে .৮ কেজি
জিপসাম	.৬ থেকে .৭ কেজি
জিপ সালফেট	৫০ থেকে ৮০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি : এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া, টিএসপি ও এমপি সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি ইউরিয়ার অর্ধেক বীজ বপনের ৩০ থেকে ৩৫ দিন পর এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া ৫০ থেকে ৭০ দিন পর প্রয়োগ করতে হয়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বারের ইউরিয়া পার্শ্বপ্রয়োগ করতে হয়। খরিফ মৌসুমে সারের পরিমাণ এক চতুর্থাংশ দিতে হয়।

লাল মাটি ও বেলে দোআঁশ মাটিতে ভুট্টার চাষ করতে হলে পটাশ সারের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়।

৫। ফসল সংগ্রহ প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবহার

ভুট্টার ফসল সংগ্রহ কাজ ও সময় ভুট্টা চাষের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। যেমন–

(ক) গো-খাদ্য : গাছের কাণ্ড শক্ত হওয়ার আগেই ভুট্টা গাছ কেটে গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। বীজ বপনের দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্য ফসল কাটা যায়।

(খ) পুড়িয়ে যাওয়ার জন্য : মোচায় ভুট্টা দানা পুষ্ঠ হতে শুরু করলে মোচা সংগ্রহ করা যায়।

(গ) সবজি হিসেবে খাওয়ার জন্য : ভুট্টার মোচার তৈরি শুরু হওয়ার পরস্পর ৪ থেকে ৫ সেন্টিমিটার লম্বা মোচা সংগ্রহ করতে হয়।

দানা উৎপাদন : দানা হিসেবে ব্যবহারের জন্য মোচা সম্পূর্ণ পরিপক্ব হওয়ার পর সংগ্রহ করার পূর্বেই গাছের নিচের দিকের দুই একটি পাতা নিয়মিত কেটে পশুকে খাওয়ানো যায়। ভুট্টার মোচা সংগ্রহের পর গাছের সবুজ পাতাগুলো গবাদিপশুকে খাওয়ানো যায়। ভুট্টা মাড়াই করার পর তা রোদে ভালভাবে শুকিয়ে সংরক্ষণ করতে হয়।

৬। অন্যান্য প্রযুক্তি : বিনা চাষে ভুট্টা

বন্যার পানি দেরিতে নামলে ধান চাষ সম্ভব হয় না। এ অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে কিছু খাদ্যশস্য, গো-খাদ্য এবং জ্বালানি পাওয়ার জন্য ভুট্টা চাষ করা যায়। সাধারণত মাঝারি উঁচু বা মাঝারি নিচু জমি এজন্য বেশি উপযুক্ত। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর পরই জমির আগাছা

পরিষ্কার করে নিতে হয়। ভুট্টার বীজ ৭৫ সেন্টিমিটার ও ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে ৩ থেকে ৪টি করে পুঁতে দিতে হয়। জমি বেশি ভেজা থাকলে বীজ মাটির উপরে রাখলেই চলে। এরপর সারির দু'পাশে বীজ থেকে ১০ সেন্টিমিটার দূরে সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রতি হেক্টর জমিতে ২৭০ থেকে ২৯০ কেজি ইউরিয়া, ১৮০ থেকে ২২০ কেজি টিএসপি এবং ২৫০ থেকে ২৬০ কেজি এমপি সার দিতে হয়। লাগানোর সময় ইউরিয়া সারের অর্ধেক এবং অন্য দুটি সারের সবটুকু জমিতে প্রয়োগ করতে হয়। চারার বয়স ৩০ দিন হলে প্রতি স্থানে একটি করে চারা রেখে বাকি গাছ উঠিয়ে ফেলতে হয় এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া সারের অর্ধেক বিকালে গাছের গোড়ায় দিতে হয়। বাকি ইউরিয়া মোচা থেকে ফুল বের হবার আগে গাছের গোড়ায় দিতে হয়। এভাবে চাষ করে হেক্টর প্রতি প্রায় ২.৫ থেকে ৩.০ টন ভুট্টা পাওয়া সম্ভব।

ভুট্টা উৎপাদন প্রযুক্তি : নিচে ভুট্টা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১। জমি ও মাটি

বেলে-দোআঁশ বা দোঁআশ মাটি ভুট্টা চাষের জন্য উপযোগী। লক্ষ্য রাখতে হয়, যাতে ক্ষেতে পানি জমে না থাকে। বপনের সময় বাংলাদেশে রবি মৌসুমে নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং খরিফ মৌসুমে ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

২। বপন পদ্ধতি ও বীজের হার

শুভ্রা, বর্ণালী এবং মোহর জাতের ভুট্টার জন্য হেক্টর প্রতি ২৫ থেকে ৩০ কেজি এবং খইভুট্টা জাতের জন্য ১৫ থেকে ২০ কেজি বীজ বুনতে হয়। বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৭৫ সেন্টিমিটার এবং সারিতে ২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে ১টি অথবা ৫০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ২টি গাছ রাখতে হয়।

৩। সার প্রয়োগ ও সারের মাত্রা : ভুট্টা চাষে বিভিন্ন প্রকার সারের পরিমাণ নিচে উপস্থাপিত হলো।

সার	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	
	রবি	খরিফ
ইউরিয়া	২৭২ থেকে ৩১২	২১৬ থেকে ২৬৪
টিএসপি	১৬৮ থেকে ২১৬	১৩২ থেকে ২১৬
এমপি	৯৬ থেকে ১৪৪	৭২ থেকে ১২০
জিপসাম	১৪৪ থেকে ১৬৮	৯৬ থেকে ১৪৪
জিংক সালফেট	১০ থেকে ১৫	৭ থেকে ১২
বোরিক এসিড	৫ থেকে ৭	৫ থেকে ৭
গোবর	৫০০০	৫০০০

হাইবিড্র ভুট্টার (জাত ঃ প্যাসিফিক-২) জন্য হেক্টর প্রতি ৫৫০ কেজি ইউরিয়া, ২৫০ কেজি টিএসপি, ২০০ কেজি এমপি, ২৫০ কেজি জিপসাম, ৬ কেজি জিঙ্ক অক্সাইড এবং ১০ কেজি বোরিক এসিড প্রয়োগ করতে হয়।

অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করে সঙ্কর ভুট্টা থেকে ১০ টনের বেশি ফলন পাওয়া যেতে পারে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে অনুমোদিত ইউরিয়ার এক–তৃতীয়াংশ এবং অন্য সারের সবটুকু জমিতে ছিটিয়ে চাষ দিতে হয়।

বাকি ইউরিয়া সমান দু'ভাগ করে এক ভাগ বীজ গজানোর ২৫ থেকে ৩০ দিন পর এবং ২য় ভাগ বীজ গজানোর ৪০ থেকে ৫০ দিন পর উপরিপ্রয়োগ করতে হয়। চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হয়। চারার বয়স এক মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছামুক্ত রাখতে হয়।

সেচ প্রয়োগ : উচ্চ ফলনশীল জাতের ভুট্টার আশানুরূপ ফলন পেতে হলে সেচ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।

(১) প্রথম সেচ বীজ বপনের ১৫ থেকে ২০ দিনের মধ্যে (৪ থেকে ৬ পাতা পর্যায়ে)।
(২) দ্বিতীয় সেচ বীজ বপনের ৩০ থেকে ৩৫ দিনের মধ্যে (৮ থেকে ১২ পাতা পর্যায়)।
(৩) তৃতীয় সেচ বীজ বপনের ৬০ থেকে ৭০ দিনের মধ্যে (মোচা বের হওয়া পর্যায়)।
(৪) চতুর্থ সেচ বীজ বপনের ৮৫ থেকে ৯৫ দিনের মধ্যে (দানা বাঁধার আগের পর্যায়) দিতে হয়।

ভুট্টার ফুল ফোটা ও দানা বাঁধার সময় কোনো ক্রমেই ক্ষেতে জলাবদ্ধতা হতে দেওয়া যাবে না।

৪। ভুট্টার আগাছা দমন

ভুট্টা ফসল বহু ধরনের আগাছা দ্বারা আক্রান্ত হয়। উচ্চ ফলন পেতে হলে ভুট্টার জমি আগাছামুক্ত রাখতে হয়। ইতোপূর্বে ধান ও গম ফসলে অনেক আগাছার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এসব আগাছা দ্বারা ভুট্টা ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়াও ভুট্টা জমিতে অনেক আগাছা জন্মাতে পারে। এখানে আরও কয়েকটি আগাছার বিবরণ দেওয়া হলো।

বথুয়া (Lambs quarter) *Chenopodium album*

বথুয়া একটি উল্লেখযোগ্য রবি আগাছা। শীতকালে সবজির জমিতেই বেশি দেখা যায়। অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে জমিতে বথুয়ার আবির্ভাব ঘটে, ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে বীজ আসে এবং মার্চ থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে বীজ পরিপক্ব হয়।

বংশ বিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : বথুয়া বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা সহজে বিনষ্ট হয় না। হাতে তোলা, নিড়ানি, কোদলানো ও লাঙল চাষ দিয়ে সহজেই বথুয়া আগাছা দমন করা যায়।

সম্পর্কযুক্ত আগাছা

Chenopodium ambrosidoes : পাতা মুচড়ালে তীব্র গন্ধ বের হয়। বৃতি ৩ থেকে ৫ অংশে বিভক্ত।

Chenopopium murale : বৃত্যাংশ পাতলা, কীলক নেই, পাতা বড়। পাতা মুচড়ালে গন্ধ বের হয় না।

বন ডাটা (Red root pigweed) *Amaranthus retroflexus* L.

এটি উঁচু জমিতে বেশি জন্মে। ভুট্টা ক্ষেতে এই আগাছার প্রকোপ খুব একটা কম নয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বর্ষজীবী গুল্ম। কাণ্ড খাড়া, শক্ত, উপরের দিকে শাখান্বিত, অমসৃণ এবং রোমযুক্ত। মূল উপরের দিকে লাল অথবা পাটল বর্ণ। পাতা একান্তর সরল লম্বা বৃন্তযুক্ত, ডিম্বাকার, কিনারা ঢেউ খেলানো দন্তর। ফুলগুলো স্থূল পুষ্প মঞ্জরীতে ঘন সন্নিবিষ্ট। ফুল ছোট, সবুজ, ৩টি স্থায়ী পুষ্পযুক্ত, ৪ থেকে ৬ মিলিমিটার লম্বা, ৫টি বৃত্যংশসহ দল, পুংদণ্ড ৫টি, গর্ভপত্র ১টি, এককোষী। বীজ ডিম্বাকার কালো বর্ণের।

দমন বিস্তার : বন্য ডাটা ও কাঁটানটে নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি নিম্নরূপ হতে পারে :

১. যেসব জমি এই আগাছা দ্বারা আক্রান্ত সেসব জমিতে আগাছা বীজের অঙ্কুরোদ্গম, তরান্বিত করার জন্য কয়েকবার রবি ঋতুতে চাষ দেয়া প্রয়োজন এবং আগাছা বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার পর পুনরায় চাষ দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হয়।
২. হাতে তোলা।
৩. ফুল ও ফল উৎপাদনের পূর্বে নিড়ানি।
৪. শস্য পর্যায় অবলম্বন।

কাঁটানটে (Spiny amaranth) *Amaranthus spinosus*

বাড়ির আশেপাশে, রাস্তা ও জমিতে এই আগাছার প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। চারা অবস্থায় নিড়ানি দিয়ে তুলে নিলে এই আগাছা তেমন ছড়াতে পারে না। বীজ পরিপক্ব হওয়ার পর কয়েক মাস সুপ্ত থেকে শীতের শুরুতে পুনরায় বীজ অঙ্কুরিত হয়।

প্রধানত মার্চ এপ্রিল মাসে এতে ফুলে দেখা যায় ও জুন থেকে জুলাই মাসে বীজ পরিপক্ব হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বর্ষজীবী বিরুৎ, রবি একবর্ষী। কাণ্ড খাড়া, মসৃণ উপরের দিকে শাখান্বিত। পাতা ডিম্বাকার, একান্তর, সরল এক জোড়া কাক্ষিক কাঁটাযুক্ত, পত্র সবৃন্তক, বর্ণ হলদে সবুজ, স্পাইক লম্বা এবং নরম, স্ত্রীফুল গুচ্ছাকারে সজ্জিত। বীজ কালো, ডিম্বাকার।

বংশ বিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : জমি চাষ, কোদলানো, নিড়ানি।

নটে শাক (Green amaranth) *Amaranthus viridis*

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বর্ষজীবী বিরুৎ। কাণ্ড খাড়া, মসৃণ, গোড়ার দিকে শাখান্বিত, শাখা লতানো—খাড়া, গর্তযুক্ত। পাতা একান্তর, বৃন্ত লম্বা, ডিম্বাকার। পুষ্পমঞ্জরী নিয়ত। মূল ঘন সন্নিবেশিত।

বংশ বিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে সাধারণত সব খরিফ শস্যের মাঠে অনেক জন্মাতে দেখা যায়।

দমন পদ্ধতি : কাঁটানটের মতো এটা এতো বিঘ্ন সৃষ্টি করে না, কারণ একে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে এই আগাছা জন্মাতে দেখা যায়। বর্ষাকালে ফুল আসে এবং বীজ পরিপক্বতা লাভ করে।

সম্পর্কযুক্ত আগাছা

১. *Amaranthus albus* এর পুষ্প মঞ্জরী পাতার চেয়ে খাটো, গাছ খাড়া, ঝোপের অনুরূপ।

২. *Amaranthus gracizans* গাছ গড়ানো প্রকৃতির (prostrate)।

বন বেগুন (Black night shade) *Solanum nigrum*

এ আগাছা মাঠ, পতিত জমি, বাড়ির আঙিনা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মাতে দেখা যায়। বসন্তকালে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে অক্টোবর মাসের মধ্যে পুনরায় পরিপক্ব বীজ উৎপাদন করে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : একবর্ষী আগাছা, ৩০ থেকে ৪৫ সেন্টিমিটার উঁচু। কাণ্ড খাড়া বা বিস্তৃত, বহুল শাখান্বিত। পাতা ৩ থেকে ৭ সেন্টিমিটার লম্বা, পাতলা পুষ্পমঞ্জরী আম্বেল, ফুলের সংখ্যা ৪ থেকে ৮টি। দল সাদা। পরাগধানী হলদে, ফল বেরি, বর্ণ কালো, বীজ অসংখ্য, বীজের বর্ণ হলদে থেকে বাদামি।

দমন পদ্ধতি : কোদলানো ও হাতে তোলা পদ্ধতিতে এই আগাছা দমন করা সহজ।

বংশ বিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে।

সম্পর্কযুক্ত আগাছা—

১. *Solanum dulcamara* গাছ লতানো, ফল ছোট লাল, গাছে কাঁটা নেই। ১ থেকে ৩ মিটার উঁচু, দল বেগুনি সাদা।

২. *Solanum rostratum* কাঁটাযুক্ত বৃতি দিয়ে ফল আবৃত, ফুল হলদে।

৩. *Solanum carolinense* ফুল সাদাটে, পরিপক্ব ফল হলদে, গাছে কাঁটা আছে।

প্রেম কাঁটা (Love thorn) *Chrysopogon aciculatus*

প্রায় সারা বছরেই জন্মাতে দেখা যায়। মধ্য উঁচু ও উঁচু জমি, বাড়ির আঙিনা, রাস্তার পাশে অসংখ্য প্রেমকাটা গাছ জন্মায়। ফুল উৎপাদন ও বীজ পরিপক্ব হওয়ার প্রধান সময়সীমা এপ্রিল থেকে আগস্ট।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বহুবর্ষী গুল্ম, তৃণকাণ্ড, মসৃণ, সোজা, পাতা তলোয়ারাকৃতি, কাণ্ডাবরক পত্রমূল গোলাকার। নিম্ন পুষ্পিকায় লেমা দুই শিরাযুক্ত। পুষ্পমঞ্জরী যৌগিক রেসিম, অবৃন্তক মঞ্জরী উভয়লিঙ্গ, উপরের বর্মপত্র মসৃণ। পুংকেশর ৩টি।

বংশ বিস্তার : বীজ ও লতানো কাণ্ড বা গোড়ার মাধ্যমে বংশবিস্তার করে থাকে।

দমন পদ্ধতি : কোদলানো, গভীর লাঙল চাষ ও আগাছানাশক দিয়ে দমন করা যায়।

ঘাঘড়া (Common cocklebur) *Xanthium strumariun*

প্রায় সব স্থানেই বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের এই আগাছা বেশি দেখা যায়। মধ্যম উঁচু জমি থেকে শুরু করে নিচু জমিতেই জন্মায়। এপ্রিল থেকে মে মাসে বীজ শীতের প্রারম্ভে পুনরায় অঙ্কুরিত হয়ে গাছ উৎপাদন করে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : উষ্ণমণ্ডলীয় বার্ষিক, রবি একবর্ষী আগাছা বহুল শাখা–প্রশাখায় বিভক্ত। গাছের উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার। পাতা প্রশস্ত, পাতার বৃন্ত লম্বা, খাঁজকাটা,

খসখসে। পরিপক্ক ফল হাল্কা-বাদামি, ২.৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। ফল একিন (Achene), প্রতি ফলে (Bur) ২টি চ্যাপ্টা ধরনের বীজ থাকে।

বংশ বিস্তার : বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার করে। পশুর দেহ, লেজ ইত্যাদিতে আটকে থেকে এই বীজ এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।

দমন পদ্ধতি : জমি চাষ, কোদলানো ও হাতে তোলা।

সম্পর্কযুক্ত আগাছা–

১. *Xanthium italiticum*

২. *Xanthium spinosum* –এর পাতা সরু, কাণ্ডে কাঁটা আছে। পাতা সাদাটে।

শিয়াল কাঁটা (Mexican prickly poppy) *Argemone mexicana*

ইক্ষু ও ভুট্টার সাথে জন্মাতে দেখা যায়। শীতের প্রারম্ভে এদের চারা জন্মাতে দেখা যায়। বসন্তে এই গাছে ফুল ফুটে এবং বীজ পরিপক্ক হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বর্ষজীবী বিরুৎ, গাছের উচ্চতা ১ থেকে ২ ফুট। কাণ্ড খাড়া, দৃঢ়, শাখাগুলো হলুদ রসযুক্ত। পাতা অবৃন্তক, একান্তর লম্বায় ১০ ইঞ্চি পর্যন্ত। পত্রপ্রান্ত কণ্টকীত, পাতায় সাদা দাগ থাকতে পারে। ফুলগুলো ২ থেকে ৫ সেন্টিমিটার লম্বা, উজ্জ্বল বৃত্যংশ ৩টি, যুক্ত পাপড়ি ৪ থেকে ৬টি, হলুদ বীজ কালো খয়েরি রঙের।

বংশ বিস্তার : বীজের সাহায্যে বংশ বিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : কোদলানো ও আগাছানাশক দিয়ে দমন করা যায়।

সম্পর্কযুক্ত আগাছা—

১. *Argemone alba*-এর ফুল সাদা।

গালিচা আগাছা (Carpet weed) *Mullugo verticillata L.*

পতিত আঙিনা, বেলে মাটি, রাস্তাপার্শ্ব, শাকসবজির জমি ইত্যাদিতে প্রচুর কার্পেট আগাছা জন্মে। বাংলাদেশে রবি ঋতুতে এই আগাছা বেশি জন্মাতে দেখা যায়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে বীজ অঙ্কুরিত হয়। মার্চ-এপ্রিল মাসে বীজ ফুল আসতে শুরু করে এবং মে-জুন মাসে বীজ পরিপক্ক হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বার্ষিক, উষ্ণমণ্ডলীয় আগাছা। কাণ্ড বহুল শাখান্বিত, গড়ানো মাটিতে চ্যাপ্টা গুচ্ছাকারে বিন্যস্ত। প্রতিটি গুচ্ছের ব্যাস ১৫ থেকে ৫০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত। পাতা ক্ষুদ্র, ২ সেন্টিমিটারের মতো লম্বা, গুচ্ছিত ফুলে ৫টি দল থাকে। দলের বর্ণ সাদাটে। বীজের আকার কিডনির মতো, বর্ণ কমলা লাল, বীজের বর্ণ উজ্জ্বল।

বংশ বিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : হাতে তোলা, নিড়ানি ও কোদলানো পদ্ধতির সাহায্যে দমন করা যায়। শস্য জমিতে এই আগাছা জন্মালে উত্তম লাঙল চাষ ও মই (ফুল ও বীজ উৎপাদনের পূর্বে) এগুলো দমনের জন্য যথেষ্ট কার্যকরি হয়।

কাশ (Kash) *Saccharum spontaneum*

সারা বছরই এ আগাছা জন্মাতে দেখা যায়। উলু আগাছার অনুরূপ, চাষ জমির চারপাশে বেশি জন্মে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বহুবর্ষী বিরুৎ। কাণ্ড খাড়া, গোড়ার দিকে ঘনীভূত (solid), উপরের দিকে ফাঁপা। গাছ বেশ উঁচু হয়, পর্বমধ্য লম্বাটে। পাতা সরু লম্বা। জোড়া কীলক মঞ্জরী, একটি নির্দণ্ড অপরটি পেডিসেল সংযুক্ত। পেডাঙ্কেলে সাদা রূপালি রোম আছে।

বংশ বিস্তার : মূল কন্দের (root stock) মাধ্যমে বংশবিস্তার করে। কাশ গাছে সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে ফুল আসে। চর অঞ্চলে খুব বেশি দেখা যায়।

দমন পদ্ধতি : গভীর চাষ ও কোদলানোর মাধ্যমে কাশ দমন করা যায়।

বন সরিষা (Wild mustard) *Bressica kaber*

পতিত জায়গা, দানাশস্য, জমি, রবিশস্য ইত্যাদিতে প্রচুর বন সরিষা জন্মাতে দেখা যায়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের এই আগাছার প্রকোপ কিছুটা বেশি। শীতকালে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মে-জুন মাস পর্যন্ত গাছ দেখা যায়। এপ্রিল মাস থেকে বীজ পরিপক্ব হতে শুরু করে।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : একবর্ষী আগাছা। রবি ঋতু, বিশেষ করে বসন্তকালে খুবই বেশি জন্মাতে দেখা যায়। গাছ খাড়া, ৩০ থেকে ৬০ সেন্টিমিটার উঁচু। পাতা লম্বায় ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। ফল হলদে, ফল পড, বোটা খাটো। বীজের বর্ণ কালচে বা বাদামি।

বংশ বিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে। প্রতি ফলে অসংখ্য বীজ থাকে।

দমন পদ্ধতি : হাতে তোলা, নিড়ানো, কোদলানো ইত্যাদির মাধ্যমে বন সরিষা আগাছা দমন করা যায়। তবে এসব যাবতীয় পদ্ধতি অবশ্যই ফুল ফোটা বা বীজ পরিপক্ব হওয়ার পূর্বে সম্পাদন করতে হয়।

১. *Brassica hirta* (White mustard)–এর পডের শীর্ষ লম্বা, শীর্ষে একটি বীজ, পডে উপাঙ্গ আছে।
২. *Brassica kaber*–এর পড মসৃণ, পাতা দন্তর, শীর্ষ চ্যাপ্টা।
৩. *Brassica juncea*–এর পড ২ থেকে ৫ সেন্টিমিটার লম্বা, বোঁটা প্রায় ১ সেন্টিমিটার, শীর্ষ কৌণিক, শীর্ষে বীজ নেই।
৪. *Brassica nigra*–এর পড ১ থেকে ২ সেন্টিমিটার, কাণ্ডের দিকে শীর্ষ কৌণিক, শীর্ষে বীজ নেই।

বন মশুর (Wild lentil) *Vicia sativa*

এটি একটি রবি আগাছা। সাধারণত ডাল এবং শীতকালীন সবজির জমিতে জন্মাতে দেখা যায়। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে এই আগাছার বীজগুলো অঙ্কুরিত হতে দেখা যায়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে ফুল ধরে। এপ্রিল-মে মাসে বীজ পরিপক্ব হয়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বার্ষিক বিরুৎ। কাণ্ড নরম, পাকানো আকর্ষীযুক্ত আরোহী। পাতা একান্তর, পক্ষলযৌগ। অনুফলক ৪ থেকে ৮ জোড়া, আয়তাকার, রেখাকার। ফুলের বর্ণ বেগুনি থেকে সাদা, সাধারণ জোড়াগুলো কক্ষে থাকে, অল্প অবৃন্তক। বৃত্যংশ ৫টি, স্থায়ী। পাপড়ি ৫টি কীল। কীল (keel) কাঁচির মতো। পুংদণ্ড দশটি (৯+১) দ্বিগুচ্ছ, ফল এবং বীজ কুঞ্চিত।

বংশ বিস্তার : বীজের সাহায্যে বংশ বিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : সময় মতো নিড়ানি দিয়ে এ আগাছা সহজেই দমন করা যায়।

চাপড়া (Goose grass) *Eleusine indica*

রবি ও খরিফ উভয় ঋতুতেই এই আগাছা পর্যাপ্ত জন্মায়। এছাড়া রাস্তা-ঘাট, খেলার মাঠ ও বাড়ির পতিত আঙিনায় প্রচুর চাপড়া জন্মায়।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : বর্ষজীবী বিরুৎ, গুচ্ছীভূত গাছ। ভূমির উর্বরতা অনুসারে চাপড়ার উচ্চতা ৬০ সেন্টিমিটার হতে পারে। প্রশস্ত ও খাটো কীলকমঞ্জরীর (spike), ২ পাশে ২ সারিতে ২ থেকে ৬টি উর্বর পুষ্পিকা রয়েছে। কাণ্ড চ্যাপ্টা, শায়িত ও বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। কাণ্ডাবরক পত্রমূল ইষৎ আলগা, ফলকের বর্ণ হাল্কা সবুজ। কীলকমঞ্জরীর সংখ্যা সাধারণত ৫ থেকে ৭টি বৃন্তের অগ্রপ্রান্ত থেকে উৎপন্ন। কীলকমঞ্জরী ৩ থেকে ৫টি ফুল সম্পন্ন।

ফুল উৎপাদন ও বীজ পরিপক্বতার প্রধান সময় মে থেকে জুলাই। অন্যান্য সময়েও গাছে ফুল থাকতে পারে তবে তার পরিমাণ কম।

বংশ বিস্তার : সাধারণত বীজের সাহায্যে বংশবিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : দমনের জন্য গাছে ফুল বা ফল উৎপাদনের পূর্বে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে বা হাতে টেনে তুলতে হয়। এজন্য নিড়ানি, কোদলানো ও লাঙল চাষ যথেষ্ট উপকারী। আগাছানাশক প্রয়োগের মাধ্যমেও সহজেই চাপড়া আগাছা দমন করা যায়। বরি ঋতুতে সবজির জমিতে নিড়ানি দেয়ার সময় চাপড়ার ছোট ছোট চারাগাছ ভাল করে তুলে নিলে পরবর্তী মৌসুমে এর আক্রমণ অনেক কমে যায়।

ঘৃতকাঞ্চন বা নুনিয়া (Common purslane) *Portulaca oleraceae*

শীতকালীন ও উঁচু জমির অন্যান্য শস্যের জন্য ঘৃতকাঞ্চন একটি গুরুত্বপূর্ণ আগাছা। বাংলাদেশে অক্টোবর-নভেম্বর মাস থেকে বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করে মে-জুন পর্যন্ত জন্মাতে দেখা যায়। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকেই বীজ পরিপক্ব হতে শুরু করে। চারাগাছের বৃদ্ধি হার খুবই বেশি।

উদ্ভিদতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য : একবর্ষী, শীত ঋতুতে বেশি জন্মায়। গাছ শাখান্বিত, কাণ্ড মাটিতে গড়ানো এবং ৩০ সেন্টিমিটারের মতো উঁচু হতে পারে। কাণ্ডের অগ্রভাগে পাতা গুচ্ছিত। পাতা ১ থেকে ২ সেন্টিমিটারের মতো লম্বা। পুষ্প একক, হলদে বর্ণ। কেবল রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ফুল প্রস্ফূটিত হয়। ফল কাপস্যুল, বীজ অসংখ্য। বীজের বর্ণ কালো। পাতা ঈষৎ পুরু ও রসালো।

বংশ বিস্তার : বীজের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

দমন পদ্ধতি : এ আগাছা দমনের জন্য লাঙল চাষ, নিড়ানি ও কোদলানো খুবই উপযুক্ত। ফুল ফোটা বা বীজ পরিপক্ব হওয়ার পূর্বে এই আগাছা দূরীভূত করতে পারলে পরবর্তী বছরে এর প্রকোপ অনেকটা কমে যায়।

বিংশ অধ্যায়

ভুট্টার পোকা ও রোগ প্রতিকার

ভুট্টার গাছ, মোচা ও দানা বহু ধরনের রোগের সাহায্যে আক্রান্ত হয়। এসব রোগের মধ্যে কয়েকটি প্রধান পোকা ও রোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হলো।

১। পোকা দমন

ভুট্টা প্রধান প্রধান পোকার মধ্যে রয়েছে–

১। কাটুই পোকা (Cutworm)

২। ভুট্টা মাজরা (Maize borer)

৩। ভুট্টার জাবপোকা (Aphid)

৪। মোচা পোকা (Ear worm)

৫। চিনচ্ বাগ (Chinch bug)

ভুট্টার এসব পোকা দমনের জন্য আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা, নাড়া পোড়ানোসহ রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করতে হয়। কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শ মোতাবেক কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়।

২। ভুট্টার বীজ পঁচা ও চারা গাছের রোগ

রোগের লক্ষণ

১. বীজ পচন এবং চারা নষ্ট হওয়ার কারণে জমিতে ভুট্টা গাছের সংখ্যা কমে যায়।

২. বীজ ও মাটিবাহিত *Pythium, Rhizoctonia, Fusarium* ইত্যাদি ছত্রাক বীজ পচন, চারা ঝলসানো, গোড়া ও শিকড় পঁচা রোগ ঘটিয়ে থাকে।

৩. জমিতে রসের পরিমাণ যদি বেশি থাকে, মাটির তাপমাত্রা যদি কম হয় তাহলে বপনকৃত বীজে চারা গজাতে এবং চারা বড় হতে অনেক সময় লাগে, ফলে বিভিন্ন প্রকার ছত্রাকের আক্রমণের মাত্রা বেড়ে যায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা

(১) সুস্থ–সবল, ক্ষতমুক্ত রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম এমন বীজ বপন করতে হয়।

(২) উত্তমরূপে জমি তৈরি করে পরিমিত রস ও তাপমাত্রায় মাটিতে বীজ বপন করলে রোগজনিত ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(৩) বিভিন্ন প্রকার ওষুধ, যেমন— থিরাম বা ভিটাভ্যাক্স ০.২৫% এক কেজি বীজ ২.৫ গ্রাম ওষুধ ব্যবহার করে বীজ শোধন করতে হয়।

৩। ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ

Helminthosporium tersicum ও *Helmimthosporium majidis* নামক ছত্রাক এ রোগ সৃষ্টি করে।

রোগের লক্ষণ

১. প্রথম ছত্রাকটি দ্বারা আমাদের দেশে ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ বেশি হতে দেখা যায়।

২. *Helminthorporium tersicum* দিয়ে আক্রান্ত গাছের নিচের দিকের পাতায় ডিম্বাকার ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায়।

৩. পরবর্তীকালে গাছের উপরের অংশে বিস্তার লাভ করে।

৪. রোগের প্রকোপ বেশি হলে পাতা আগাম শুকিয়ে যায় ও গাছ মরে যায়।

৫. এ রোগের জীবাণু গাছের আক্রান্ত অংশে অনেক দিন বেঁচে থাকে এবং জীবাণুর বীজকণা বা কনিডিয়া বাতাসের সাহায্যে অনেকদূর পর্যন্ত সুস্থ গাছে ছড়াতে পারে।

৬. বাতাসে আর্দ্রতা বেশি হলে এবং ১৮ থেকে ২৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রে . তাপমাত্রায় এ রোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার ব্যবস্থা

(১) রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হয়। মোহরজাত অপেক্ষাকৃত রোগ প্রতিরোধী।

(২) আক্রান্ত ফসলে টিল্ট ২৫০ ইসি (০.০৪%) ১৫ দিন পর পর ২ থেকে ৩ বার স্প্রে করতে হয়।

(৩) ভুট্টা উঠানোর পর আক্রান্ত গাছ জমি থেকে সরিয়ে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

৪। ভুট্টার মোচা ও দানা পচা রোগ

মোচা ও দানাপচা রোগ ভুট্টার ফলন, বীজের গুণাগুণ ও খাদ্যমান কমিয়ে দেয়। বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক যথা— *Diplodis maydis, Fusarium moniliformae, Nigrospora oryzae*, প্রভৃতি এ রোগ ঘটায়।

রোগের লক্ষণ

১. আক্রান্ত মোচার খোসা ও দানা বিবর্ণ হয়ে যায়, দানা কুঁচকে যায়।

২. অনেক সময় মোচার বিভিন্ন দানার মাঝে বা উপরে ছত্রাকের উপস্থিতি খালি চোখে দেখা যায়।

৩. মোচা অবস্থায় আক্রান্ত হলে পুরো মোচাই পচে যায়।

৪. ভুট্টা গাছে মোচা আসার প্রাথমিককাল থেকে ভুট্টা পাকা পর্যন্ত সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি বেশি থাকে তবে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

৫. এ রোগের জীবাণু বীজের অথবা আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশে বেঁচে থাকে।

প্রতিকার ব্যবস্থা

(১) একই জমিতে বার বার ভুট্টা চাষ না করাই ভাল ;

(২) ভুট্টা পেকে গেলে দেরি না করে তাড়াতাড়ি কেটে ফেলতে হয় ;

(৩) কাটার পর ভুট্টার পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হয় ;

৫। ভুট্টার কাণ্ডপঁচা রোগ

বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া যথা– *Diplodis maydis, Fusarium moniliformae, Calletotrichum graminicola, Pithium aphenidermatum Erwinia*-এর কারণে এ রোগ ঘটে থাকে।

রোগের লক্ষণ

১. প্রাথমিক লক্ষণ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুর উপর নির্ভর করে কিন্তু সব ক্ষেত্রেই পরিশেষে গাছের কাণ্ড পচে যায়।

২. আমাদের দেশে খরিফ মৌসুমে এ রোগটি বেশি হয়ে থাকে।

৩. জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি এবং পটাশের পরিমাণ কম হলে ছত্রাকঘটিত কাণ্ডপচা রোগ বেশি হয়।

৪. শিলা বৃষ্টি অথবা শিকড় ও কাণ্ডে পোকার আক্রমণে পাতা ঝলসানো রোগ বেশি হয়।

প্রতিকার ব্যবস্থা

(১) সুস্থ ও উচ্চ মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হয়। বীজ শোধন করা ভাল।

(২) সুষম সার ব্যবহার করতে হয়। বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও পটাশ পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়।

(৩) একই জমিতে বার বার ভুট্টা চাষ না করে অন্য ফসলের চাষ করতে হয়।

(৪) ভুট্টা কাটার পর পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

(৫) শিকড় এবং কাণ্ড আক্রমণকারী পোকা দমন করতে হয়।

৬। বীজ সংগ্রহ

দানার জন্য ভুট্টা সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোচা চকচকে খড়ের রঙ ধারণ করলে এবং পাতা কিছুটা হলুদ হয়ে এলে সংগ্রহের উপযুক্ত হয়েছে বুঝতে হয়। এ অবস্থায় মোচা থেকে ছাড়ানো বীজের গোড়ায় কালো দাগ দেখা গেলে নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে মোচা সংগ্রহের সময় হয়েছে।

শতকরা ৭৫ থেকে ৮০ ভাগ গাছের মোচা এরকম হলে সেই ক্ষেত থেকে ভুট্টা সংগ্রহ করা যাবে। মোচার মাঝামাঝি অংশ থেকে বড় ও পুষ্ট দানা বীজ সংগ্রহ করতে হয়।

৭। ভুট্টা মাড়াই : শক্তিচালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র

ভুট্টা মোচা থেকে দানা সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। হস্তচালিত ও শক্তিচালিত মাড়াই যন্ত্র দিয়ে মোচা থেকে দানা সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশে গবেষণা করে সম্প্রতি একটি শক্তিচালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ যন্ত্র ব্যবহার করে সহজেই মোচা থেকে ভুট্টা দানা সংগ্রহ করা যায়। উদ্ভাবিত এ যন্ত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা হলো।

বৈশিষ্ট্য

(১) দেশীয় মালামাল দিয়ে তৈরি ও মেরামত করা যায়।

(২) এ ভুট্টা মাড়াই যন্ত্রের মূল্য প্রায় ২০,০০০/– টাকা।

(৩) কার্যক্ষমতা ৩০ থেকে ৩৫ টন/ঘন্টা।
(৪) ইঞ্জিন বা মটর দিয়ে চালানো যায়।
(৫) বড় চাষী এবং সমবায়ীদের জন্য এটি খুবই উপযোগী।

৮। বীজ সংরক্ষণ

মোচা সংগ্রহের সময় বীজে সাধারণত রবি ফসলের বেলায় ২৬ থেকে ২৮% এবং খরিফ ফসলের ক্ষেত্রে ২৮% থেকে ৩৫% আর্দ্রতা থাকে। এজন্য বীজ সংরক্ষণের আগে এমনভাবে শুকাতে হয় যেন আর্দ্রতা ১২% এর বেশি না থাকে।

শুকানোর পর দাঁত দিয়ে চাপ দিলে 'কট' শব্দ করে ভেঙে গেলে বুঝতে হয় দানা ভালভাবে শুকিয়েছে।

তারপর বায়ুরোধক পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হয়। নিচে বর্ণিত উন্নত পদ্ধতিতে অর্থাৎ বায়ুরোধক পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হয়।

উন্নত পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ করলে ১০ মাস পর্যন্ত অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৮৬ ভাগের বেশি থাকে।

টিনের পাত্র

এমএস শিট দিয়ে পাত্র তৈরি করা যায়। মুখ বন্ধ করার ঢাকনা এমনভাবে তৈরি করা হয় যেন তার চারিদিকে 'সিলিং' পদার্থ অর্থাৎ তুষ মিশ্রিত কাদা মাটি দিয়ে বাতাস চলাচল বন্ধ করা যায়। ঢাকনায় ২.৫ × ২.৫ সেন্টিমিটার মাপের এক টুকরো কাচ বসানো থাকে। এজন্য ঢাকনা না খুলেও ভেতরের বীজের অবস্থা দেখা যায়। এই পাত্রের ধারণক্ষমতা ৫ কেজি এবং তৈরি খরচ ৪০ টাকার মতো।

মাটির পাত্র

বিশেষভাবে তৈরি এ মাটির পাত্রের ভেতরে ০.০৫ মিলিমিটার পুরু পলিথিন ব্যাগ জড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পলিথিন ব্যাগের মধ্যে ভুট্টা বীজ রেখে মুখ তাপ দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। মাটির পাত্রের মুখ এমনভাবে তৈরি যে 'সিলিং' পদার্থ দিয়ে আটকিয়ে বায়ু চলাচল রোধ করা যায়। পাত্রের মুখের ঢাকনায় ২.৫ × ২,৫ সেন্টিমিটার মাপের এক টুকরো কাচ বসানো থাকে যেন ঢাকনা না খুলে ভেতরের বীজ দেখা যায়। পাত্রের ধারণক্ষমতা ৭ কেজি এবং মোট তৈরি খরচ ১০ টাকার মতো।

একবিংশ অধ্যায়

ক্ষুদে দানা ফসল

১। ক্ষুদে দানা ফসল পরিচিতি

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র দানা ফসলের মধ্যে রয়েছে —

১. কাউন
২. চিনা
৩. সরগাম
৪. অট বা যই
৫. জোয়ার
৬. বাজরা
৭. ভুরা
৮. মারুয়া
৯. রাই
১০. রামী বা রিহা

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র দানা ফসল উৎপাদন

জেঁলা	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫	
	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)	জমি (একর)	উৎপাদন (টন)
বান্দরবান	৩৫	১০	৪০	১৫	৪০	১৫
চট্টগ্রাম	—	—	—	—	—	—
কুমিল্লা	৫৩৫	১৭৫	৫৭০	১৯০	৫৬০	১৮০
খাগড়াছড়ি	—	—	—	—	—	—
নোয়াখালি	১৭৫	৫৫	২১০	৬০	২১৫	৬০
রাঙ্গামাটি	৬৫	২০	৬০	২০	৫৫	১৫
সিলেট	—	—	—	—	—	—
ঢাকা	১১৩২০	৪১৪৫	১১১৭৫	৪১৩৫	১১৩০	৪৬৫০
ফরিদপুর	৮১৮৫	২০৩০	৮০৬৫	১৯৮৫	৮০২৫	২০৪০
জামালপুর	৩৭৪০	১৩৮০	৩১৪০	১১৮০	৩১০৫	১১০০
কিশোরগঞ্জ	৬০	১০	৬৫	১০	৭৫	১০
ময়মনসিংহ	৯৫	২৫	৮০	২০	৭৫	২০
টাঙ্গাইল	৫১৬০	২০২৫	৫০৭৫	২০৩০	৪৭৪০	১৯০৫

বরিশাল	৩৯০	৯০	৩৬০	৮০	৩৩৫	৭৫
যশোর	৩১৬০	৬৯০	৩০০০	৬৬৫	২৮৬০	৬৩০
খুলনা	—	—	—	—	—	—
কুষ্টিয়া	১৪৫৫	৩৩০	১৪০৫	৩৪০	১৩২০	২৯৫
পটুয়াখালী	—	—	—	—	—	—
বগুড়া	৬৩০	২৪৫	৫৮৫	২৩০	৫৮৫	২৩৫
দিনাজপুর	৩৬৫	৮০	৪২৫	৯৫	৩৯৫	৯০
পাবনা	৫৪৯০	২০১৫	৫৩২০	১৮৭৫	৫১১৫	১৮৩৫
রাজশাহী	২৬১০	৭৩০	২৫৬৫	৭৩০	২৫৩৫	৭৫০
রংপুর	২৮৩৫	৯৬০	২৭৮৫	৯৮০	২৭০০	৯৯০
বাংলাদেশ	৪৬৩০৫	১৫০১৫	৪৪৯২৫	১৪৬৪০	৪৩৮৬৫	

২। বাংলাদেশে ক্ষুদে দানা ফসলের গুরুত্ব

এলাকাভেদে বাংলাদেশে এসব ফসলের চাষাবাদ হয়, তবে চাষাধীন জমির পরিমাণ বা উৎপাদন কম। এসব ফসলের চাষাবাদের উন্নত প্রযুক্তিও ব্যবহার করা হয়। তবে এসব ফসলের প্রচুর গুরুত্ব ও কৃষিতাত্ত্বিক তাৎপর্য রয়েছে। গুরুত্বের বিবেচনায় ক্ষুদে দানা ফসল সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র গ্রন্থের শেষাংশে সংযোজিত হয়েছে।

ছোট দানা খাদ্য ফসলসমূহ বাংলাদেশে গরীবের খাদ্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। কারণ প্রান্তিক জমিতে গরীব কৃষক এগুলো চাষ করে থাকে এবং তাদের আংশিক খাদ্যাভাব পূরণ করে। বাংলাদেশে সাধারণত চরাঞ্চলে চাষ করা যায়। এসব ফসলের কয়েকটি প্রধান সুবিধা হচ্ছে —

১। এসব ফসল খরা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ;

২। অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতেও চাষ করা যায় ;

৩। উৎপাদন খরচ কম ;

৪। উৎপাদন পদ্ধতি সহজ ;

৫। দীর্ঘদিন বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বিদ্যমান থাকে ;

৬। এসব ফসলের দানায় প্রচুর আমিষ ও খনিজ পদার্থ রয়েছে ;

৭। পোকা ও রোগের আক্রমণ কম ;

৮। সহজে মাড়াই ও সংরক্ষণ করা যায় ;

৯। স্বাভাবিক খাদ্য ঘাটতির মৌসুমে এগুলো জন্মে থাকে ;

৩। কাউন

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় কাউন একক ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। আবার পাবনা, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে কাউনের সাথে আউশ ধান, ডাটা শাক, তিল ও আখের চাষ হয়ে থাকে।

কাউনের সাথে অন্যান্য ফসলের চাষ কৃষকের জন্য লাভজনক। নিচে কাউনভিত্তিক কিছু ফসল বিন্যাস উল্লেখ করা হলো।

এলাকা	মাটির প্রকার	ফসল বিন্যাস		
		রবি	খরিপ–১	খরিপ–২
পাবনা, যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চল	চুনযুক্ত গাঢ় ধূসর প্লাবণ ভূমি	গম/ডাল	গ্রীষ্মকালীন ডাল	কাউন
রংপুর ও জামালপুর অঞ্চল	ধূসর প্লাবণ ভূমি ব্রহ্মপুত্র প্লাবণ ভূমি	বিআর ১৪ কাউন	কাউন পাট/আউশ	পাট/ আউশ পতিত
দিনাজপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় অঞ্চল	চুনহীন প্লাবণ ভূমি পাদভূমি ও ব্রহ্মপুত্র প্লাবণ ভূমি	সরিষা/গোল আলু	কাউন	রোপা আমন
কুমিল্লা অঞ্চল	মেঘনা প্লাবণ ভূমি	কাউন	পাট/রোপা আউশ	রোপা আমন

বাংলাদেশে কাউন চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। নিম্নলিখিত কারণে কাউন বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ দানা খাদ্য ফসলের দাবিদার।

১। বাংলাদেশে রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই কাউনের চাষ করা যায়।

২। বাংলাদেশে কাউনের অনেক জাত রয়েছে।

৩। এসব জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে সব এলাকায় চাষ করা যায়।

৪। বেলে–দোআঁশ থেকে এঁটেল বুনটের সকল মাটিতে চাষ করা যায়।

৫। কাউনে আমিষের পরিমাণ বেশি প্রায় ১৩%।

৬। কাউন দিয়ে বহু ধরনের খাদ্যসামগ্রী তৈরি করা যায়, যেমন— ভাত, ক্ষীর, পায়েস, পিঠা, ইত্যাদি।

৪। কাউনের উদ্ভিদতাত্ত্বিক পরিচিতি ও পুষ্টিমান

কাউনের (Foxtail millet)বৈজ্ঞানিক নাম *Setaria italica.* একে অনেক সময় *Panicum italicum* ও বলা হয়। কাউনের শীষ দেখতে শিয়ালের লেজের মতো বলে এর ইংরেজি ফক্সটেইল মিলেট। বর্তমানে জাপান, চীন, ভারত ও দক্ষিণ ইউরোপে কাউনের চাষ হয়ে থাকে। কাউনের উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ নিম্নরূপ :

ক্রোমোজোম সংখ্যা -- 2n = 14
পরাগায়ন — স্ব–পরাগী
গাছ — একবর্ষী বিরুৎ
ফল — কেরিওপসিস্

কাণ্ড কাঁপা, পর্ব ভরাট পত্রখোলের চেয়ে পত্রফলক ছোট, গাছের উচ্চতা প্রায় ১ মিটার, কুশি উৎপাদন কম। দানার রঙ হলদে, কমলা, লাল, বাদামি ও কালচে হতে পারে।

কাউনের পুষ্টিমান (খাদ্যোপযোগী ১০০ গ্রাম)

উপাদান	কাউন	চাল	পরিমাণ	
			ভুরা	মারুয়া
আমিষ	১২.৩	৬.৪	৬.২	৭.৩
চর্বি	৪.৩	০.৪	২.২	১.৩
খনিজ	৩.৩	১.৫	৪.৪	২.৭
শক্তি (ক্যালরি)	৩৩১.০	৩৪২.০	৩০৭.০	৩২৮.০

৫। কাউনের সাধারণ চাষ পদ্ধতি

জমি ও মাটি নির্বাচন : উঁচু ও মাঝারি উঁচু জমির দোআঁশ বুনটের মাটিতে কাউন চাষ করা যায়। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই কাউনের চাষ করা যায়। তবে পানি দাঁড়ায় না এমন বেলে দো-আঁশ মাটিতে এর ফলন ভাল হয়।

জাত মনোনয়ন : কাউনের বহু জাত রয়েছে। যেমন— শিবনগর (লাল ও সাদা), মগরা, অরজুনা, ইটালি- ১ জাপানি ইত্যাদি। এসব জাতের জীবনকাল ৯৫ থেকে ১০৫ দিন। গাছের উচ্চতা ৯৫ থেকে ১২০ সেন্টিমিটার। প্রতি শতকে ফলন ৪ থেকে ৬ কেজি।

জমি প্রস্তুতকরণ : জমিতে ৪ থেকে ৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে কাউনের জমি প্রস্তুত করতে হয়। জমি থেকে আর্বজনা ও আগাছা অপসারণ করতে হয়। কাউনের বীজ খুব ছোট বলে যতদুর সম্ভব মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয়। জমি সমতল করতে হয় এবং পানি নিকাশের জন্য জমির ঢাল অনুসারে নালা কাটতে হয়।

৬। কাউনের উন্নত জাত : তিতাস

কাউনের উন্নত জ্যাতের মধ্যে তিতাস উল্লেখযোগ্য। এখানে তিতাস জাতের বিবরণ দেওয়া হলো।

'তিতাস' কাউনের একটি উন্নত জাতের নাম। এ জাতের পূর্ব নাম শিবনগর। কুমিল্লা থেকে ১৯৮০ সালে সংগ্রহ করে এর গুণাবলী পরীক্ষা করে তিতাস নামে কৃষি বিভাগ অনুমোদন দিয়েছে।

১. এ জাতের গাছের উচ্চতা মাঝারি, গড়ে ১২০ সেন্টিমিটার।
২. গাছ শক্ত, সহজে নুয়ে পড়ে না।
৩. তিতাসের শীষগুলোও বেশ লম্বা, প্রায় ১৮ সেন্টিমিটার মোটা ও লোমশ।
৪. বীজের বর্ণ ঘিয়ে, আকার মাঝারি।
৫. ফলন স্থানীয় জাতের চেয়ে বেশি।
৬. তিতাসের জীবনকাল রবি মৌসুমে ১১০ দিন এবং খরিফ মৌসুমে ৯০ দিন।

BANGDOC Library Dhaka

বীজ হার

কাউন ছিটিয়ে রোপা যায় এবং সারিতেও রোপা যায়। বীজ হার প্রতি শতক জমিতে ৩০ থেকে ৪০ গ্রাম । সারিতে বীজের পরিমাণ ২৫ থেকে ৩০ গ্রাম। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২ থেকে ৩ সেন্টিমিটার।

বপনের সময়

দেশের উত্তরাঞ্চলে অগ্রহায়ণ মাস থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসে বীজ বুনতে হয়।

বীজের হার

ছিটিয়ে বুনলে হেক্টর প্রতি ১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৮ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ সারিতে বুনলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার রাখতে হয়। চারা গজানোর পর ২ থেকে ৩ সপ্তাহের মধ্যে সারিতে চারার দূরত্ব ৬ থেকে ৮ সেন্টিমিটার রেখে বাকি চারা উঠিয়ে ফেলতে হয়।

৭। সার প্রয়োগ

কাউনের চাষ করে উচ্চ ফলন পেতে প্রতি শতক জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/প্রতি শতক
ইউরিয়া	৩২০ গ্রাম
টিএসপি	২৫০ গ্রাম
এমপি	১২৫ গ্রাম

সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া জমি প্রস্তুতের সময় দিয়ে বাকি ১২০ গ্রাম ইউরিয়া বীজ বপনের ২৫ থেকে ৩০ দিন পর প্রয়োগ করা ভাল।

৮। আগাছা দমন

কাউনের জমিতে চারা অবস্থায় প্রচুর আগাছা জন্মে। প্রধান প্রধান আগাছার মধ্যে রয়েছে দুর্বা, মুথা, আঙ্গুলী, শ্যামা ইত্যাদি। আগাছা বেশি হলে অর্থাৎ গাছ ৮ থেকে ১০ সেন্টিমিটার উঁচু হলে জমি নিড়ানি দেওয়া দরকার।

পানি সেচ ও নিকাশ

কাউনের জমিতে পানি সেচ দিতে পারলে ভাল। তবে অতিবৃষ্টিতে জমিতে জলাবদ্ধতা দেখা দিলে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হয়। কাউন একটি খরাসহিষ্ণু ফসল। কিন্তু রবি মৌসুমে খরা দেখা দিলে ১ থেকে ২টি হাল্কা সেচের ব্যবস্থা করলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।

কাউন চাষে সচরাচর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় না। তবে অনুর্বর জমিতে হেক্টর প্রতি ৯০ কেজি থেকে ১০০ কেজি ইউরিয়া, ৬০ কেজি থেকে ৭০ কেজি টিএসপি ও ৩০ কেজি থেকে ৩৫ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

৯। কাউনের মিশ্র চাষ

বাদামের মিশ্র ফসল হিসেবে কাউন চাষ

প্রযুক্তি এলাকা	বরিশাল, কিশোরগঞ্জ ও অন্যান্য বাদাম উৎপাদন এলাকা।
জাত : চীনাবাদাম	ডিএম-১
কাউন	তিতাস

জমি নির্বাচন ও তৈরি	মাঝারি উঁচু বেলে-দোআঁশ মাটি এই প্রযুক্তির জন্য উপযুক্ত। মাটিতে 'জো' থাকা অবস্থায় জমি ও মাটির প্রকারভেদে ৩ থেকে ৪টি আড়াআড়ি চাষ দিতে হয়।
বপনের সময়	ফেব্রুয়ারি- মার্চ
বীজের হার : চীনাবাদাম	১০০ কেজি/ হেক্টর (খোসাসহ)
কাউন	২ কেজি/হেক্টর (একক ফসলের ২৫%)
বপন পদ্ধতি	বাদামের সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০ সেন্টিমিটার। বাদাম বপন করার আগে ২৫% হিসেবে কাউন ছিটিয়ে বপন করতে হয়।
সারের পরিমাণ/হেক্টর	ইউরিয়া : ৭০ থেকে ৮০ কেজি
	টিএসপি : ১১০ থেকে ১২০ কেজি
	এমপি : ৭০ থেকে ৮০ কেজি
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সকল প্রকার সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করে মাটির সাথে মই দিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়।
অন্যান্য পরিচর্যা	বপনের সময় রস না থাকলে সেচ দিতে হয়। চারা গজানোর পর (২৫ থেকে ৩০ দিন পর) আগাছা দমন করতে হয়। অনুমোদিত মাত্রায় ওষুধ ব্যবহার করতে হয়।
রোগ ও পোকামাকড় দমন	মে- জুন
ফসল কাটার সময় কাউন	জুন-জুলাই
চীনাবাদাম ফলন চীনাবাদাম কাউন	১,৫ থেকে ১.৮ টন হেক্টর ০.৫ থেকে ৭ টন/হেক্টর

পোকা ও রোগ দমন

কাউনের পোকার আক্রমণ কম। তবে পাতায় দাগ ও বীজ পচাজাতীয় কিছু কিছু রোগ হয়ে থাকে। জমিতে পোকা ও রোগ দেখা দিলে কৃষি কর্মকর্তার সুপারিশক্রমে নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হয়।

১০। ফসল কাটা, মাড়াই ও ব্যবহার

কাউন গাছে শীষ আসার ২০ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে পেকে যায়। কাউনের দানা দাঁতে কামড় দিলে কট করে আওয়াজ হলে বুঝতে হয় দানা পরিপক্ব হয়েছে।

ফসল সংগ্রহের পর লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বা গরু দিয়ে কাউন মাড়াই করা যায়। মাড়াই করার পর কয়েকদিন রোদে শুকিয়ে ঝেড়ে সংরক্ষণ করা যায়।

কাউনের ব্যবহার

কাউন আতপ অথবা সিদ্ধ দু'ভাবেই খাওয়া যায়। ঢেঁকি বা গাইলে ধানের মতো চাল ছাঁটতে হয়। একশত কেজি কাউন থেকে ৮০ থেকে ৮৫ কেজি চাউল পাওয়া যায়। কাউনের চাল ডালের সাথে মিশিয়ে খিচুড়ি পাক করে খাওয়া যায়। কাউনের চালে, দুধ ও চিনি মিশিয়ে সুস্বাদু পায়েশ রান্না করে খাওয়া যায়। আতপ কাউনের পায়েস শিশু, রোগী ও গর্ভবতী মায়েদের সহজপাচ্য খাবার। কাউনের চাল ভেজে পাকানো গুড়ে মোয়া বা নাড়ু তৈরি করা যায়। এসব খাবার মুখরোচক ও খুবই উপাদেয়।

১১। চীনার পরিচিতি ও গুরুত্ব

বাংলাদেশে ধান ও গমের পাশাপাশি এলাকাভেদে ও মাটির প্রকারের ভিত্তিতে চীনার চাষাবাদ হয়ে থাকে। এদেশে খরা ও বন্যা পুনর্বাসন কর্মসূচিতে চীনা উৎপাদন ও ব্যবহার ব্যাপক অবদান রাখতে পারে। বাংলাদেশের চর এলাকা ও অনুর্বর জমিতে চীনার চাষ বেশি হয়। চীনা খরা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন ফসল। খাদ্যমানের দিক থেকে চাল, গম ও ভুট্টার চেয়ে আমিষ ও খনিজ উপাদানের অধিক সমৃদ্ধ।

বাংলাদেশের অনেক এলাকায় চীনার চাষ করা হয়ে থাকে। অনুর্বর এলাকায় অথবা চরাঞ্চলে এ ফসলটি বেশি চাষ করা হয়। বাংলাদেশে মোট চীনা চাষের জমির পরিমাণ ২৩,২৬০ হেক্টর এবং মোট উৎপাদন ৭,৫০০ মেট্রিক টন। খরা বা বন্যার পর কৃষি পুর্নবাসনে চিনা যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে।

চীনা, খুরা, মারুয়া ইত্যাদি আতপ ও সিদ্ধ দু'ভাবেই খাওয়া যায়। ভাঁজা, পায়েশ, নাড়ু, খিচুড়ি ও পিঠা তৈরি করে ছোট দানা ফসলসমূহ খাওয়া হয়ে থাকে।

বিভিন্ন খাদ্য ফসলের পুষ্টিমান (খাদ্যোপযোগী ১০০ গ্রামে)

উপাদান	চিনা	ভুরা	মারুয়া	চাল	গম	ভুট্টা	কাউন
আমিষ	১২.৫	৬.২	৭.৩	৬.৪	১১.৮	১১.১	
চর্বি	১.১	২.২	১.৩	০.৪	১.৫	৩.৬	
খনিজ	১.৯	৪.৪	২.৭	০.৭	১.৫	১.৫	
আঁশ	২.২	৯.৮	৩.৬	০.২	১.২	২.৭	
ক্যালোরি	৩৪১	৩০৭.০	৩২৮.০	৩৪৮.০	৩৪৬.০	৩৪২.০	
পানি	১১.৯	১১.৯	১৩.১	১৩.৩	১২.৮	১৪.৯	
শ্বেতসার	৭০.৪	৬৫.৫	৭২.০	৭৯.০	৭১.২	৬৬.২	
ভিটা: এ (আই ইউ)							৫৪
থায়ামিন (মিগ্রা)	০.২০	০.৩৩	০.৪২	০.২১			০.৫৯

রিবোফ্ল্যাভিন (মিগ্রা)	০.১৮	০.১০	০.১০	০.০৯			০.০৮
নিকোটিনিক এসিড (মিগ্রা)	২.৩০	১.৭০	১.১০	৩.৮০			০.৭০
বায়োটিন (মাইক্রোগ্রাম)	৭৪৮						

উন্নত জাতের চীনা নিম্নলিখিতভাবে চাষ করা হলে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

১২। চীনার জাত : তুষার

স্থানীয়ভাবে চীনার অনেক জাত রয়েছে। তবে তুষার নামে একটি জাতকে ফলন বেশি হওয়ার কারণে সরকারি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এটি ১৯৭২ সালে ফ্রান্স থেকে হোয়াইট মিলেট (white millet) নামে বাংলাদেশে আনা হয়। তারপর বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এর ফলন বেশি পাওয়া যাওয়ায় ১৯৮৯ সালে অনুমোদন দেওয়া হয় এবং এর নাম তুষার রাখা হয়।

তুষার জাতের বৈশিষ্ট্য

১. তুষার জাতের উচ্চতা মাঝারি ৭০ থেকে ৭৫ সেন্টিমিটার।
২. গাছগুলো বেশ শক্ত, সহজে হেলে পড়ে না।
৩. শীষগুলোও বেশ লম্বা প্রায় ২০ সেন্টিমিটার।
৪. শীষের বীজগুলো গুচ্ছাকারে থাকে।
৫. বীজের রঙ হাল্কা ঘিয়ে, বীজ আকারে বেশ বড়।
৬. স্থানীয় জাতের চেয়ে এটি ১০ দিন আগে পরিপক্ব হয়।
৭. প্রতি হাজার দানার ওজন ৪.৫ থেকে ৪.৭৫ গ্রাম।
৮. স্থানীয় জাতের চেয়ে ৩০ থেকে ৪০% ফলন বেশি।
৯. ফলন ২.৫ থেকে ৩.০ টন/হেক্টর।
১০. পোকা ও রোগাক্রমণ প্রতিরোধী।

১৩। জমি ও মাটি নির্বাচন ও তৈরি

বন্যামুক্ত উঁচু দো-আঁশ বা পলি-দো-আঁশ মাটিতে চীনা জন্মানো যায়। মাটিতে জো আসার পর ২ থেকে ৪টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিয়ে তারপর বীজ বুনতে হয়।

১৪। বীজ বপন

তুষার জাতের চীনা রবি মৌসুমে চাষ করা হয়। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি (নভেম্বর) পৌষ মাস (জানুয়ারি) পর্যন্ত কাউনের বীজ বপন করা যায়। তবে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহ (ডিসেম্বর) পর্যন্ত বুনলে ফলন ভাল হয়।

বীজের পরিমাণ

চীনা জমিতে ছিটিয়ে বা সারিতে বোনা যায়। ছিটিয়ে বুনলে প্রতি শতকে ৮০ গ্রাম এবং সারিতে বুনলে ৬৫ গ্রাম বীজ প্রয়োজন হয়।

বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কম হলে সেই অনুপাতে বীজের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হয়। বীজ সারিতে বুনলে দু'সারির দূরত্ব হয় ২০ থেকে ৩০ সেন্টিমিটার। লাঙল দিয়ে সারি টেনে মাটির ৩ থেকে ৪ সেন্টিমিটার গভীরে বীজ বুনতে হয়। বীজ থেকে বীজের দূরত্ব হয় ৩ থেকে ৫ সেন্টিমিটার।

১৫। সার প্রয়োগ ও পরিচর্যা

চীনা মূলত অনুর্বর জমিতে চাষ করা হয়। তবে উন্নত চাষাবাদের সাথে সাথে সুষম সার দিলে চীনার ফলন বাড়ে। চীনার জমিতে নিম্নোক্ত হারে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/প্রতিশতক
ইউরিয়া	৩০ থেকে ৩৫ গ্রাম
টিএসপি	১৫ থেকে ২০ গ্রাম
এমপি	৭ থেকে ১০ গ্রাম

সেচের ব্যবস্থা না থাকলে সবটুকু সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হয়। সেচের ব্যবস্থা থাকলে অধিক ইউরিয়াসহ সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ৩৫ থেকে ৪৫ দিন পর উপরিপ্রয়োগ করতে হয়।

আগাছা দমন ও চারা পাতলাকরণ

চীনার জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হয়। চারা গজানোর এক দুই সপ্তাহ পর ৬ থেকে ৮ সেন্টিমিটার দূরত্বে চারা রেখে বাকি চারা তুলতে হয়। চীনার জমিতে অন্তত দু'বার নিড়ানি দেওয়া ভাল।

রোগ ও পোকা দমন

চীনা ফসলে রোগ পোকার আক্রমণ কম হয়। তবুও পোকার আক্রমণ হলে ২.৫ গ্যালন পানিতে ৪৫ মিলিমিটার বা শিশির ৯ ক্যাপ ডায়াজিনন বা ম্যালথিয়ন শিশির স্প্রে করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ মাড়াই ও সংরক্ষণ

চীনার দুই-তৃতীয়াংশ দরনা খড়বর্ণ ধারণ করলে তা গাছসহ কাটতে হয়। ফসল গরুর পায়ে মাড়িয়ে বা লাঠি দিয়ে মাড়াই করতে হয়। মাড়াই করার পর তা ঝেড়ে, শুকিয়ে বায়ুরুদ্ধ পাত্রে সংরক্ষণ করতে হয়।

ফলন : প্রতি শতকে ১০ থেকে ১৩ কেজি।

১৬। চীনার ফসল বিন্যাস

এলাকা	মাটির প্রকার	খরিফ-১	খরিফ-২	রবি
পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া	চুনযুক্ত গাঢ় ধূসর প্লাবন ভূমি	আউশ/পাট	রোপা আমন	চীনা
রংপুর, জামালপুর	ধূসর প্লাবন ভূমি ও ব্রহ্মপুত্র প্লাবন ভূমি		মাশকলাই/ রোপা আমন	চীনা

দিনাজপুর, রংপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়	চুনহীন প্লাবন ভূমি ও ব্রহ্মপুত্র প্লাবন ভূমি	পাট/আউশ	রোপা আমন	চীনা
কুমিল্লা	মেঘনা প্লাবন ভূমি	আউশ	রোপা আমন	চীনা

তথ্যপঞ্জি

বিএআরআই। ১৯৯৯। *কৃষি প্রযুক্তি হাত বই*। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

মজুমদার। ১৯৮১। *পূর্ব ভারতের ফসল*। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিষদ, কলকাতা।

বিআরআরআই। ১৯৯৪। *আধুনিক ধানের চাষ*। জয়দেবপুর, গাজীপুর।

বিআরআই। *ধান চাষের সমস্যা।* জয়দেবপুর, গাজীপুর।

মোঃ সদরুল আমিন। ১৯৯৮। *সার ব্যবহার নির্দেশনা।* বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। ১৯৮৮। *ধানের শ্রেণিবিভাগ ও উৎপাদন প্রক্রিয়া।* খামার বাড়ি, ঢাকা।

বিআরআই, ১৯৯৩। *ভুট্টার উৎপাদন ও ব্যবহার*। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

ভুট্টা। ১৯৯১। *শুভ্রা, বর্ণালী ও মোহর।* বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

চীনার চাষ : তুষার। ১৯৯৪। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

বিএআরআই। ১৯৯০। *লাভজনক পদ্ধতিতে গম উৎপাদনের উপায়।* গম গবেষণা কেন্দ্র, নশীপুর, দিনাজপুর।

বিএআরআই। *কাউনের চাষ*। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, জয়দেবপুর, গাজীপুর।

IRRI. 1989. *A Farmers Primer on Rice.* Manila, Philippines.

IRRI. 1991. *A Frimer on Organic Based Rice Farming* (R.K. Pandey). IRRI and. Manila, Philippines.

BBS. 1997. *Statistical Pocket Book of Bangladesh.* Bangladesh Bureau of Statistics. Government of Bangladesh.

BARI. 1995. *Sustainability of Rice- Wheat Systems in Bangladesh.* (ed. Razzaque,

M.A. *et al.*, 1985. *Principle of Field Crop Production.* McMillan Pub. Co. USA.

KIPPS, M.S. 1978. *Production of Field crops.* Mc Graw Hill Book Co. USA.

CHAPMAN, S.R. and CARTER, L.P 1982. *Crop Production Principles and Practicing subject.* Pub. New Delhi

CHATTERJEE, B.N and S. Maiti. 1981. *Principles and Practices of Rice Growing.* IBH Publishing Co. India.

ICAR. 1978. *Hand book of Agriculture.* New Delhi, India.

BARC. 1985. *Fertilizer Recommendation Guide.* Bangladesh Agricultural Research Council, Farmgate, Dhaka.

দানা খাদ্য ফসল সংশ্লিষ্ট রঙিন চিত্র

ধান ফসলের বৈশিষ্ট্য

বাঁশিরাজ ধান ফসল

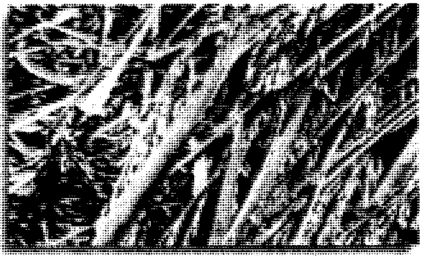
নাসিমশাইল ধান ফসল (পরিপক্ব)

নাসিমশাইল ধান ফসল

জয়া ধান ফসল

পাঁচজাগ ধান ফসল

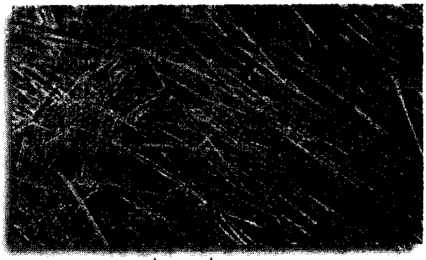
সালে ধান ফসল

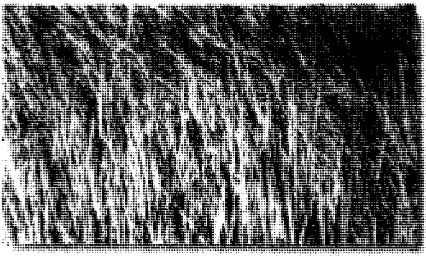
মুক্তাহার ধান ফসল

হালাই ধান ফসল

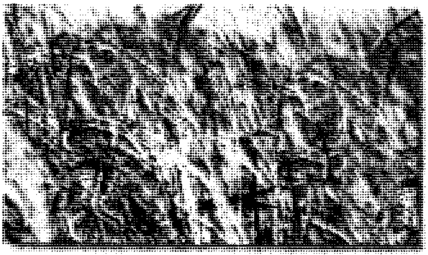

উকুন মধু ধান ফসল

কালোমেই ধান ফসল

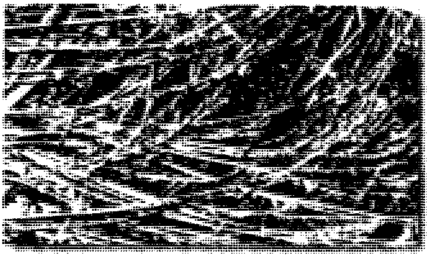

যশোয়া ধান ফসল

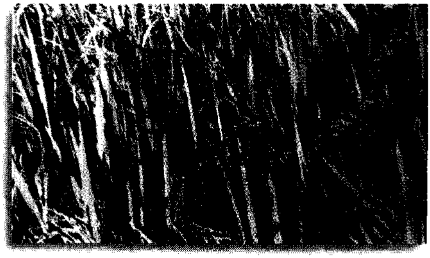

জাদু ধান ফসল

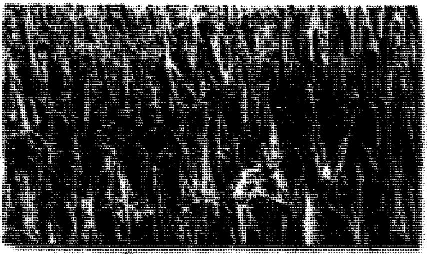

পানিশাইল ধান ফসল

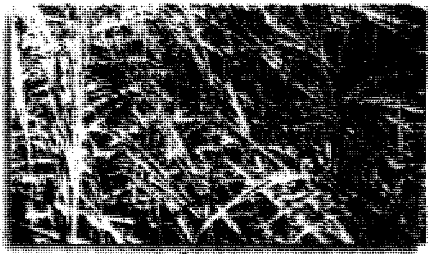

বাওয়াইঝাঁকা ধান ফসল

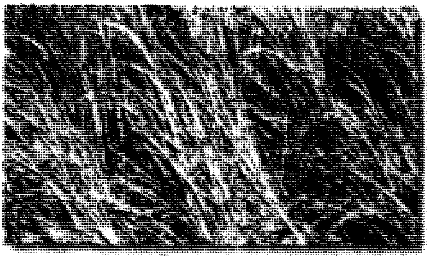

সুজনী ধান ফসল

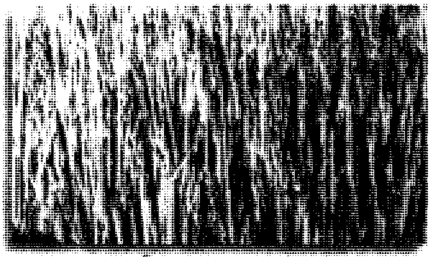

ঝিঙ্গা ধান ফসল

মালশিরা ধান ফসল

বিন্নি ধান ফসল

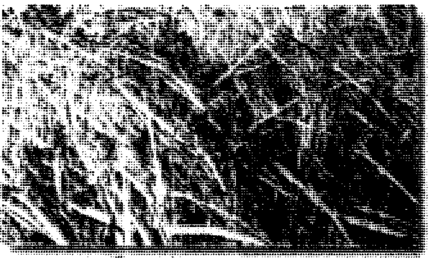

নাগিনশাইল ধান ফসল

সোনাশাইল ধান ফসল

শুভরাজ ধান ফসল

বিন্দিশাকড়ি ধান ফসল

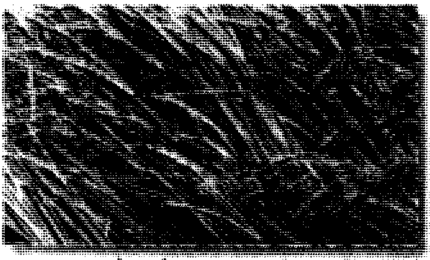

ভুঁয়াশাইল ধান ফসল

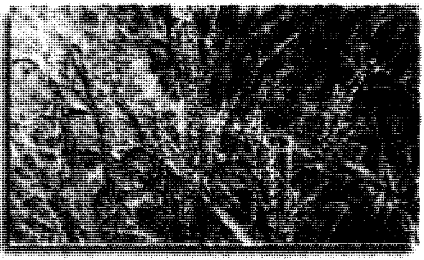

আলে ধান ফসল

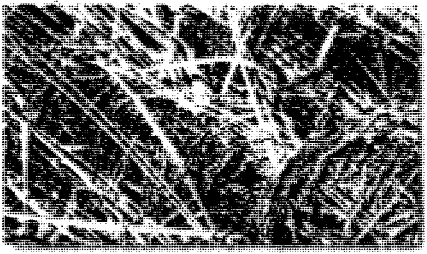

নয়ারাজ ধান ফসল

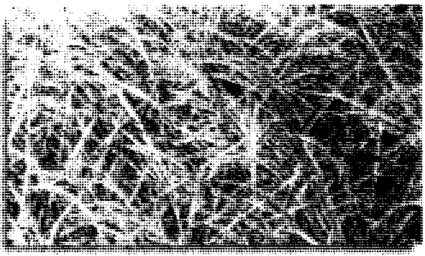

বেতো ধান ফসল

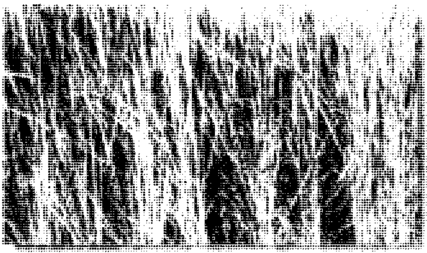

মধুমাসী ধান ফসল

তিলকাবুর ধান ফসল

[illegible] কার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

বিন্দি (উপরে), সোনা (নিচে) ধান শীষ

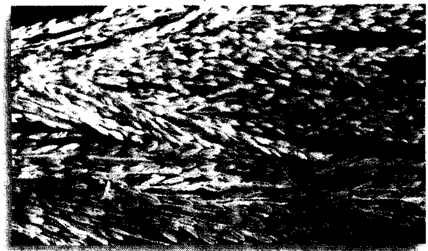

জামাইসোহাগী (উপরে), বাউ-২ (নিচে) ধান শীষ

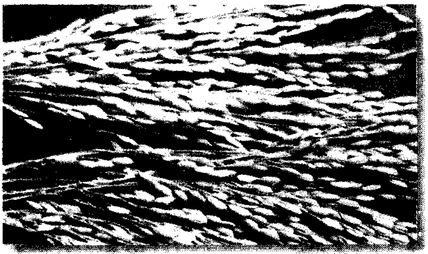

রাজাভোগ (উপরে), বিআর-২৬ (নিচে) ধান শীষ

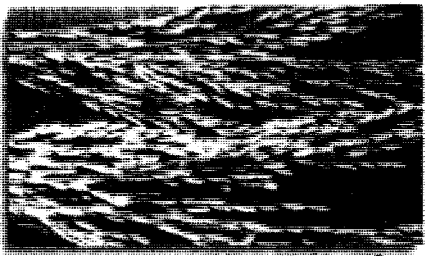

বিআর-৩৯ (উপরে), ঝুটাশাইল (নিচে) ধান শীষ

বিনাশাইল (উপরে), তিলকাবুর (নিচে) ধান শীষ

পাটেশ্বরী (উপরে), পাজাম (নিচে) ধান শীষ

বিনা-৪ (উপরে), নয়ারাজ (নিচে) ধান শীষ

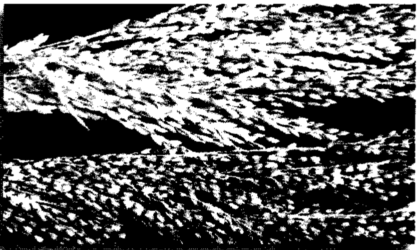

জামাইসোহাগী (উপরে), বাওজ (নিচে) ধান শীষ

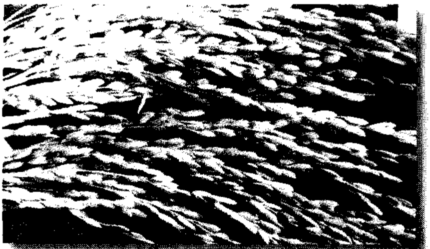

বিআর-২৪ (উপরে), নয়াপাজাম (নিচে) ধান শীষ

বিন্দিপাকড়ি (উপরে), কালোমেই (নিচে) ধান শীষ

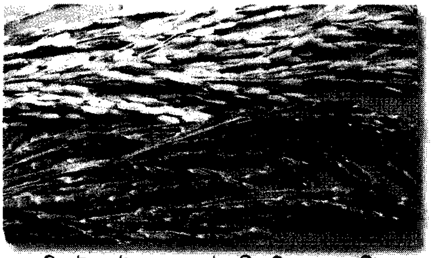

পানিশাইল (উপরে), পাটেশ্বরী (নিচে) ধান শীষ

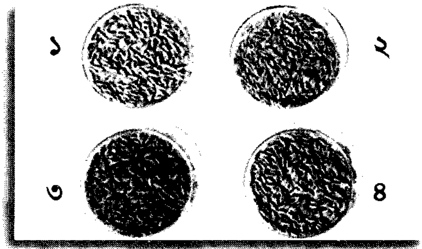

১.কেলাডোমা, ২.ফিল কাটারি, ৩. সাপাহার, ৪. বিআর-৩২ ধান দানা

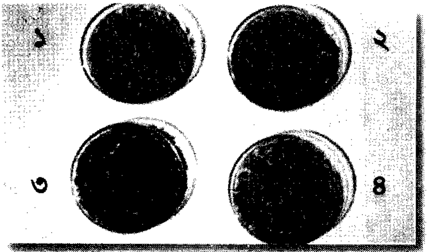

১.বাদশাভোগ, ২.ফিল কাটারি, ৩. পাজাম, ৪. দেশী কাটারি ধান দানা

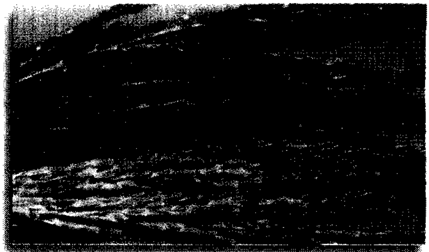

গন্ধরাজ (উপরে), যশোয়া (নিচে) ধান শীষ

কালো কাটারি (উপরে), [illegible] (মধ্যে), [illegible] (নিচে) ধান শীষ

বাদশাভোগ (বামে), কান্দিশাঁও (মধ্যে), কনকচুড় (ডানে) ধান শীষ

বিভিন্ন উপজাতের কালোজিরা ধান দানা

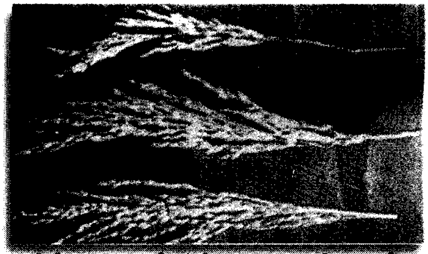

কান্দিশাঁও (উপরে), দেশী কাটারি (মধ্যে), পাজাম (নিচে) ধান শীষ

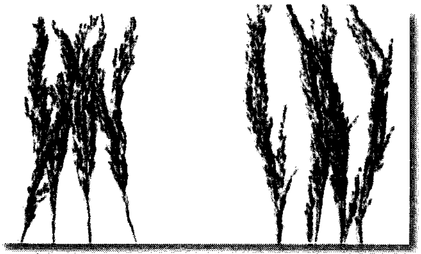

দেশী কাটারি (বামে), বেগুনবীচি (ডানে) ধান শীষ

উফশী ধান শীষ (বামে), দেশী ধান শীষ (ডানে)

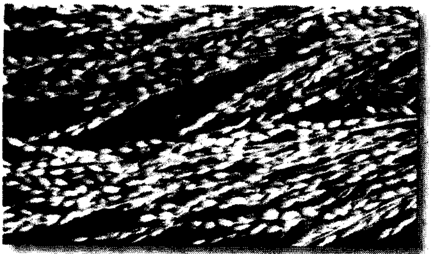
বেগুনবীচি (উপরে), ফিল কাটারি (নিচে) ধান শীষ

বিন্দিপাকড়ি (উপরে), মালশিরা (নিচে) ধান শীষ

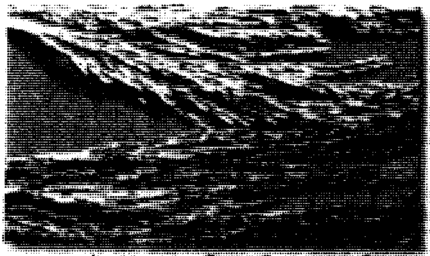
শালে (উপরে), মালশিরা (নিচে) ধান শীষ

পাটেশ্বরী (উপরে), মালশিরা (নিচে) ধান শীষ

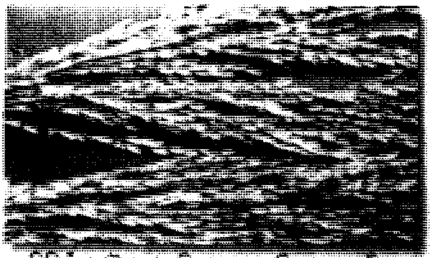
টিনিংগুড়া (উপরে), বিআর-৩৪ (নিচে) ধান শীষ

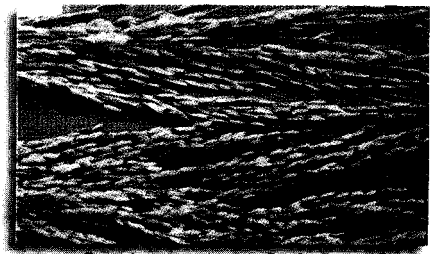
ভোগগান্ধিয়া (উপরে), জটা কাটারি (নিচে) ধান শীষ

বিআর-১ (উপরে), যশোয়া (নিচে) ধান শীষ

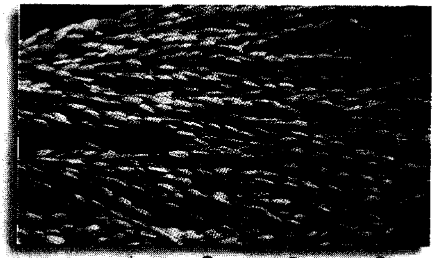
রাজাভোগ (উপরে), শীলকমল (নিচে) ধান শীষ

বিভিন্ন উপজাতের কালোজিরা ধান শীষ

লোহাজং (উপরে),দুধসর (নিচে) ধান শীষ

কালোজিরা (উপরে), চিনিগুঁড়া (নিচে)

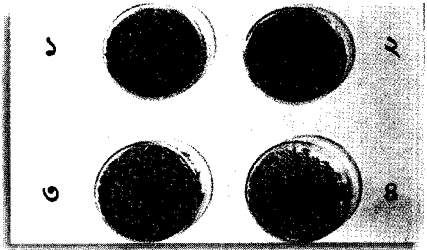

১.কান্দিশাঁও, ২.স্বর্ণা, ৩.পাজাম, ৪.দেশী কাটারি

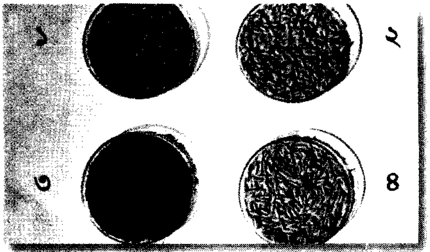

১.কান্দিশাঁও, ২.কনকচুড়, ৩.কালো কাটারি, ৪.ব্রিধান-৩২

ব্রিধান-৩৩ (বামে), পাজাম (ডানে) ধান দানা

স্থানীয় জাতের ধান শীষ ও দানাবিন্যাস বৈশিষ্ট্য

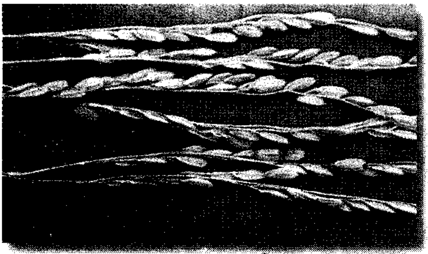

লোহাজং ধান শীষ

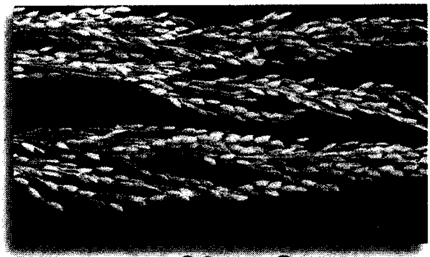

বেগুনবীচি ধান শীষ

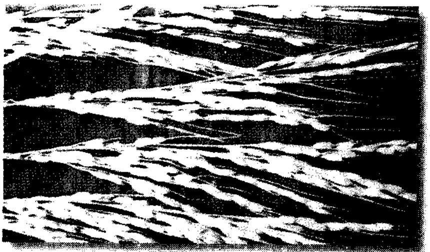

স্থানীয় বোরো ধান শীষ

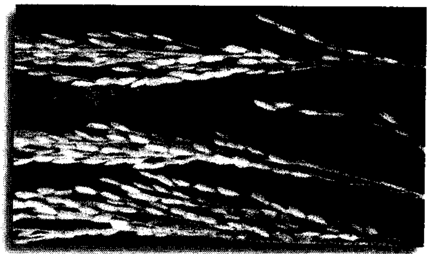

দুধসর ধান শীষ

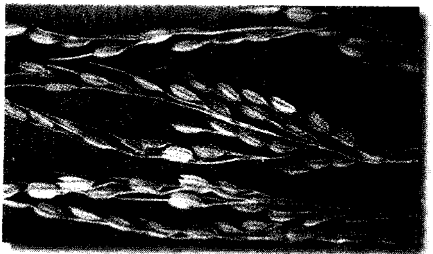

কনকচুড় ধানের উপশীষ

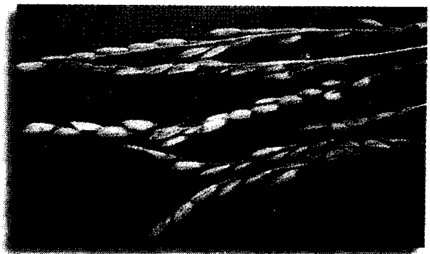

কলম ধানের উপশীষ

কালোজিরা ধান শীষ

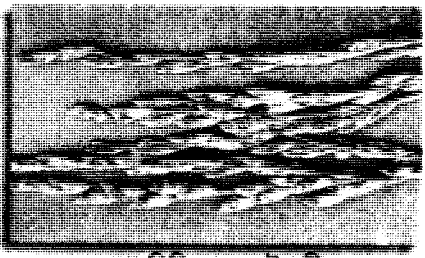

নকশা বিন্নি ধানের উপশীষ

লাল বিন্নি ধানের উপশীষ

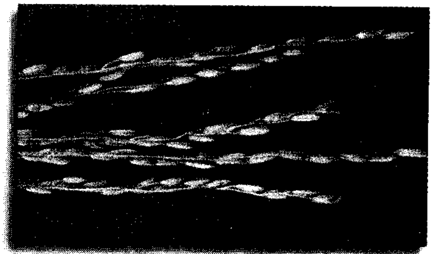

দাড়িকাশাইল ধানের উপশীষ

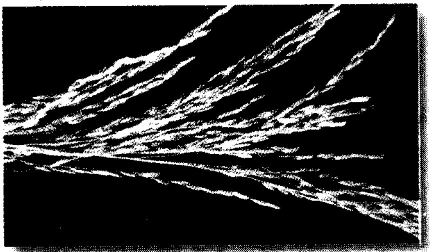

বাঁশিরাজ ধান শীষ

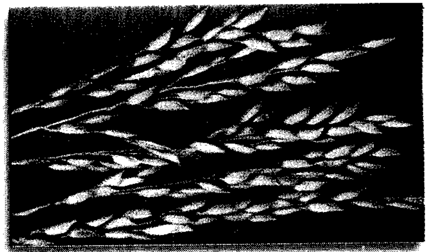

কাটারিভোগ ধানের উপশীষ

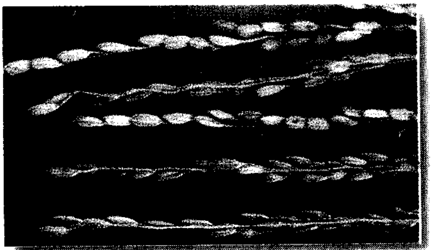

কেলাডোমা ধানের উপশীষ

বন্য ধান শীষ

স্থানীয় জাতের ধান শীষ ও দানার মধ্যকার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

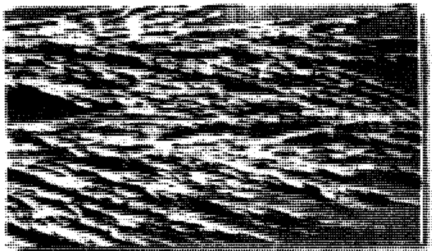

ভোগগাজিরা (উপরে), অজ (নিচে) ধান শীষ ও দানা

উকুন মধু (উপরে), নয়নরাজ (নিচে) ধান শীষ ও দানা

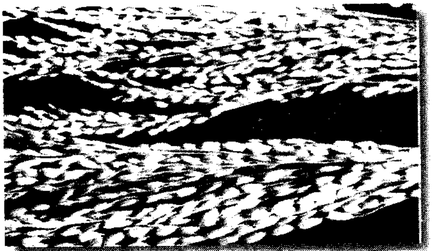

জিরা কাটারি (উপরে), শুভরাজ (নিচে) ধান শীষ

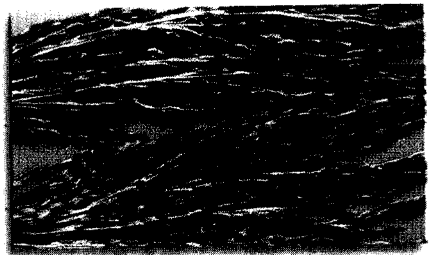

গন্ধরাজ (উপরে), কালোমেই (নিচে) ধান শীষ ও দানা

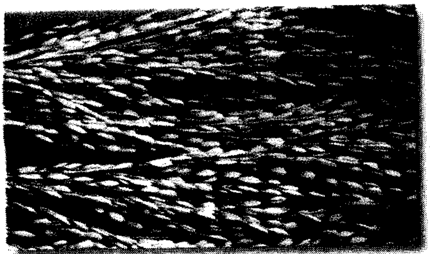

যশোয়া (উপরে), শীলকমল (নিচে) ধান শীষ ও দানা

সাপাহার (বামে), কনকচুড় (মধ্যে), শুঙকলম (ডানে)

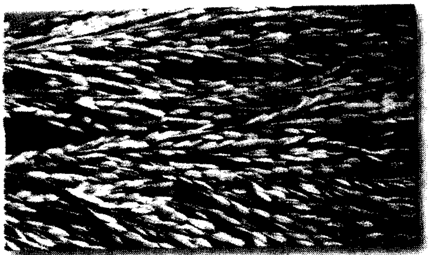

যশোয়া (উপরে), নাসিমশাইল (নিচে) ধান শীষ

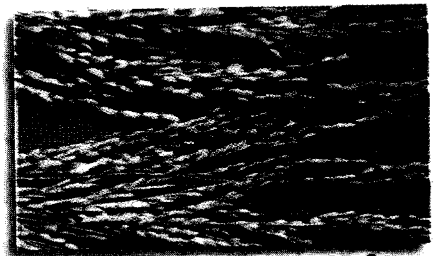

ঢেপা (উপরে), জটা কাটারি (নিচে) ধান শীষ

উফশী জাতের ধান ফসলের বৈশিষ্ট্য

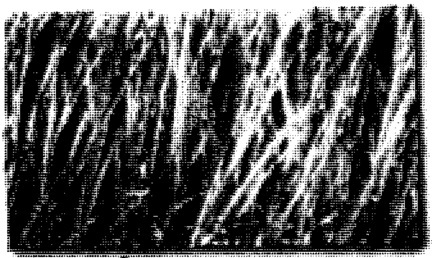

বিআর-২ ধান ফসল

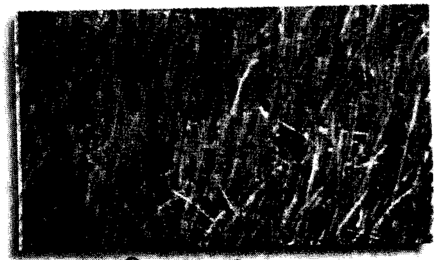

বিআর-৩ ধান ফসল

বিআর-৬ ধান ফসল

বিআর-৭ ধান ফসল

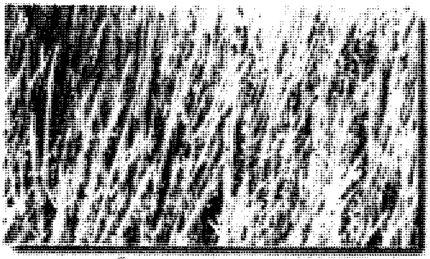
বিআর-৮ ধান ফসল

বিআর-৯ ধান ফসল

বিআর-১০ ধান ফসল

বিআর-১২ ধান ফসল

বিআর-১৪ ধান ফসল

বিআর-১৫ ধান ফসল

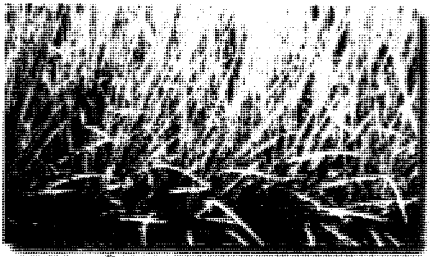
বিআর-১৬ ধান ফসল

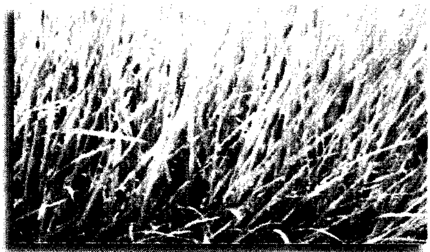
বিআর-১৭ ধান ফসল

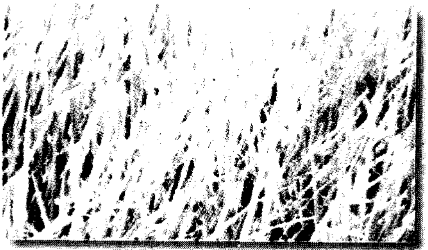

বিআর-১৮ ধান ফসল

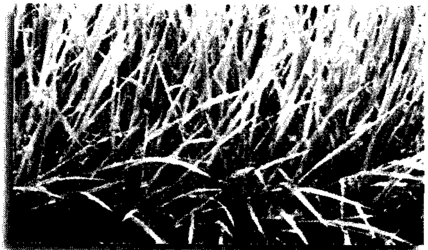

বিআর-১৯ ধান ফসল

বিআর-২৮ ধান ফসল

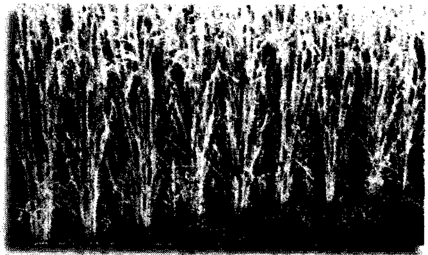

বিআর-৩০ ধান ফসল

ব্রিধান-৩৬ ধান ফসল

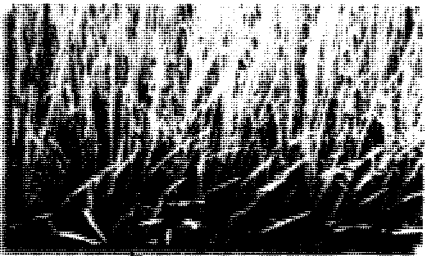

আইআর-৮ ধান ফসল

আইআর-৯ ধান ফসল

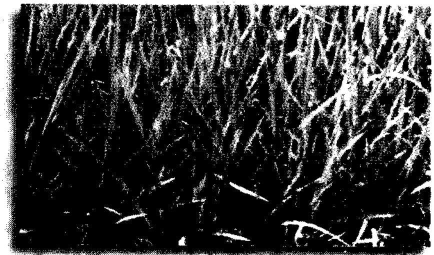

আইআর-৬৪ ধান ফসল

আলোক ধান গাছ

আলোক ধান ফসল

উফশী জাতের ধান ফসলের মধ্যকার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

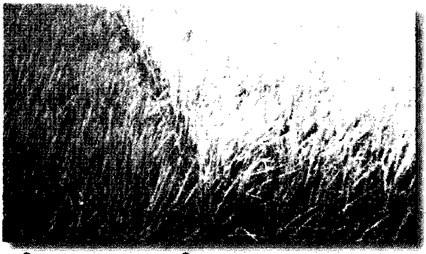

বিআর-১৯ (বামে) ও ব্রিধান-২৮ (ডানে) ধান ফসল

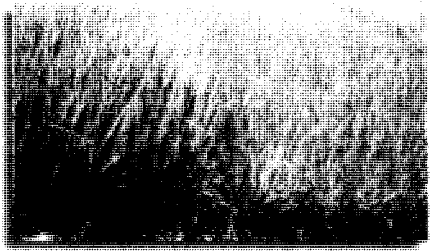

বিআর-৯ (বামে) ও বিআর-১২ (ডানে) ধান ফসল

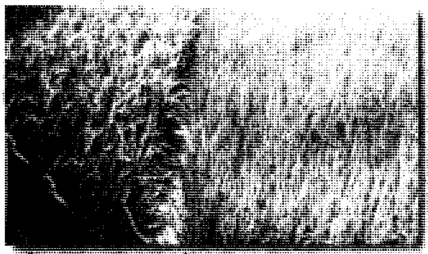

ব্রিধান-৬ (বামে) ও বিআর-৭ (ডানে) ধান ফসল

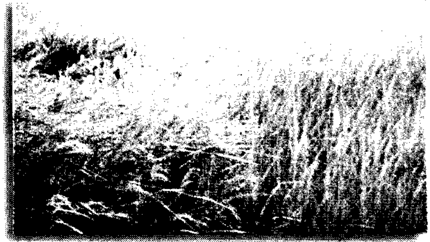

হবিগঞ্জ-৪ (বামে) ও হবিগঞ্জ-৮ (ডানে) ধান ফসল

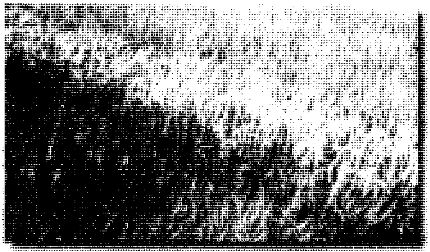

বিআর-৩ (বামে) ও বিআর-৬ (ডানে) ধান ফসল

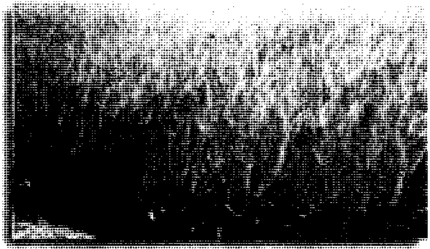

ব্রিধান-৩৫ (বামে) ও ব্রিধান-৩৬ (ডানে) ধান ফসল

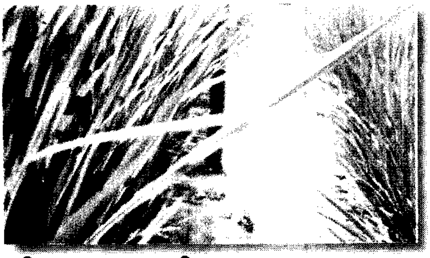

বিআর-২ (বামে) ও বিআর-১৮ (ডানে) ধান ফসল

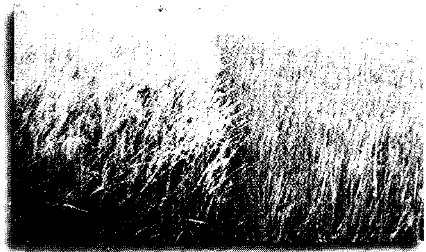

ব্রিধান-২৮ (বামে) ও ব্রিধান-১৯ (ডানে) ধান ফসল

[illegible] তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

বিআর-১৪ (উপরে), বিআর-৩৯ (নিচে) ধান শীষ

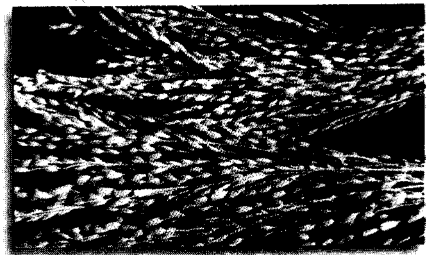

বিবি এইচ জি (উপরে), বাউ-২ (নিচে) ধান শীষ

বিআর-৩৯ (উপরে), সোনাশাইল (নিচে) ধান শীষ

সোনাশাইল (উপরে), নয়াপাজাম (নিচে) ধান শীষ

জাদু (উপরে), বিআর-৩২ (নিচে) ধান শীষ

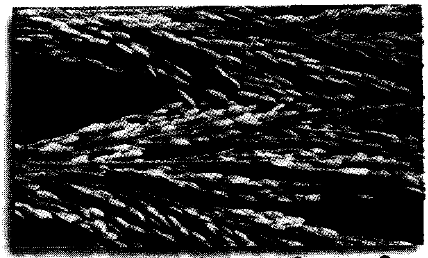

বিআর-৩০ (উপরে), বিআর-১১ (নিচে) ধান শীষ

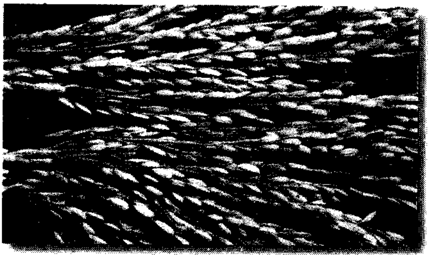
বিআর-৩ (উপরে), বিআর-৩৩ (নিচে) ধান শীষ

বিআর-১০ (উপরে), বিনা-১ (নিচে) ধান শীষ

উফশী জাতের ধান দানার মধ্যকার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য

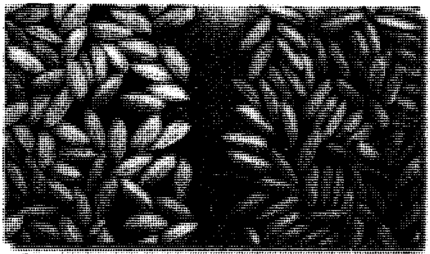
বিআর-৩১ (বামে), বিআর-১২ (ডানে) ধান দানা

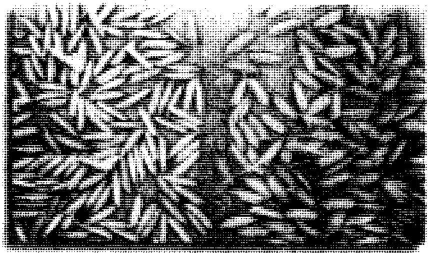
বিআর-১৪ (বামে), বিআর-৭ (ডানে) ধান দানা

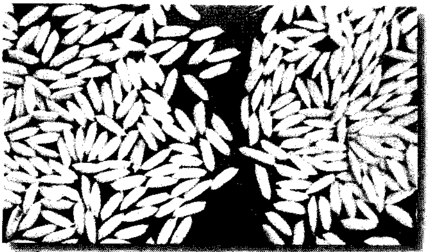
বিআর-৮ (বামে), বিআর-৯ (ডানে) ধান দানা

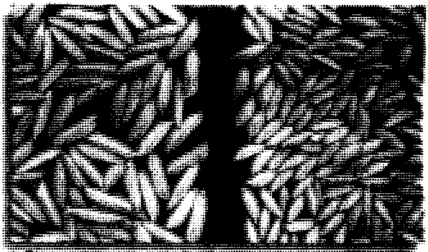
বিআর-২৯ (বামে), বিআর-৩৪ (ডানে) ধান দানা

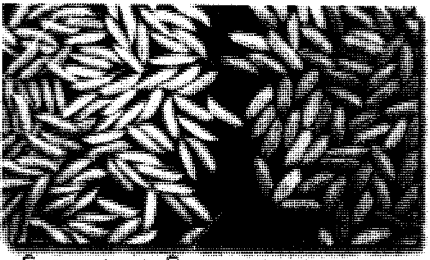
বিআর-৪ (বামে), বিআর-৩৮ (ডানে) ধান দানা

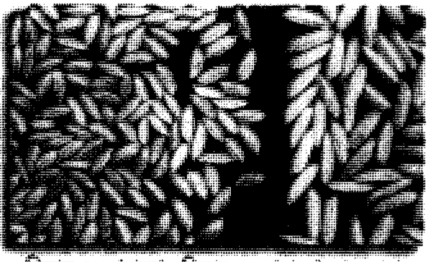
বিআর-১০ (বামে), বিআর-১২ (ডানে) ধান দানা

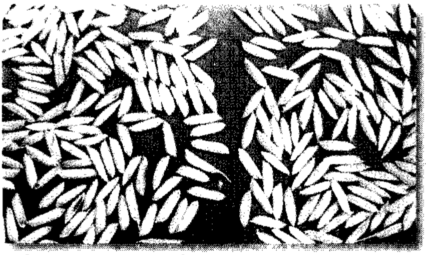

বিআর-১৮ (বামে), বিআর-২৮ (ডানে) ধান দানা

ব্রিধান-৩২ ও ব্রিধান-৩৯ ধান দানা

উচ্চ ফলনশীল ধানের সম্ভাবনাময় সারি

BR-5877-21-23 ও IR-8 ধান ফসল সারি

IR-62894 ধান ফসল সারি

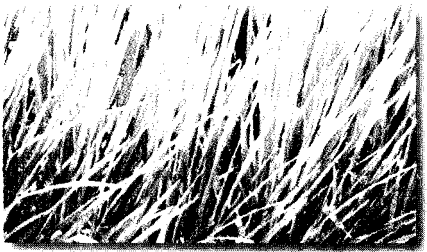

4828-54-4-4-9 ধান ফসল সারি

IR-58025 A ধান ফসল সারি

BRRI-dhan-36 ও BR-4828-54-4-1-4-9 সারি

IR-558388-2-3-2-3-R ও IR-30404 সারি

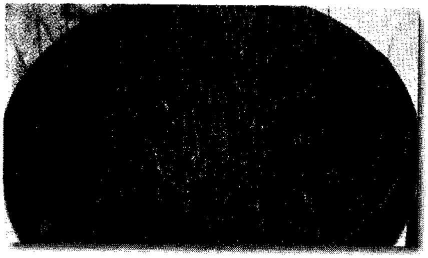

ধানের চারা অবস্থা

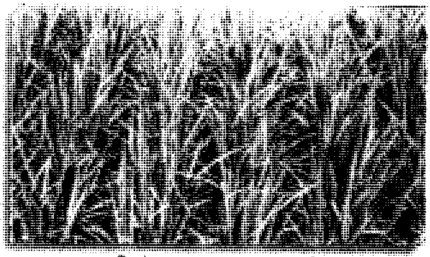

ধানের কুশি উৎপাদন ও দ্রুত বৃদ্ধি অবস্থা

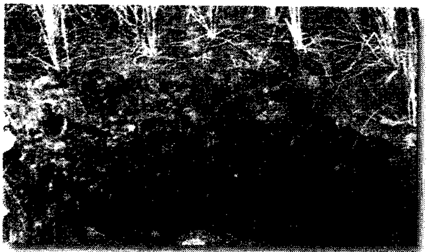

ধানের শিকড় বিস্তৃতি

ধান কাটার পর পুনঃবৃদ্ধি অবস্থা

গতানুগতিক পদ্ধতিতে রোপিত ধান ফসল

কুশি ভেঙে সারিতে রোপিত ধান ফসল

রোগিং করার উপযোগী ধান ফসল (কচি অবস্থা)

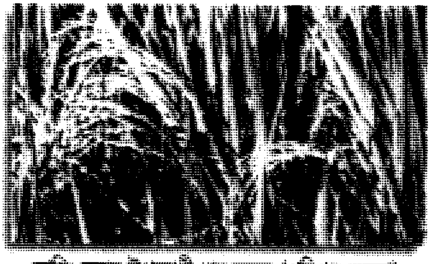

রোগিং করার উপযোগী ধান ফসল (পরিপক্ক অবস্থা)

BANSDOC Library Dhaka

ধান ফসলে অপুষ্টি লক্ষণ

P- প্রয়োগকৃত ব্রিধান-২৮ (বামে), P- অপ্রয়োগকৃত ব্রিধান-২৯ (ডানে)

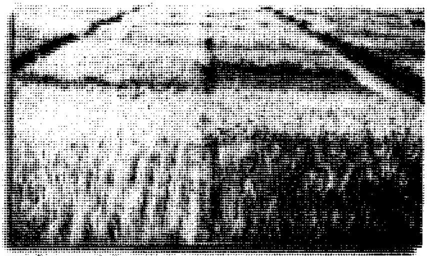

পুষ্টি ব্যবস্থাপনাহীন (বামে) ও NPKZn প্রয়োগকৃত বিআর-৩

ধান ফসলে অ্যাজোলা

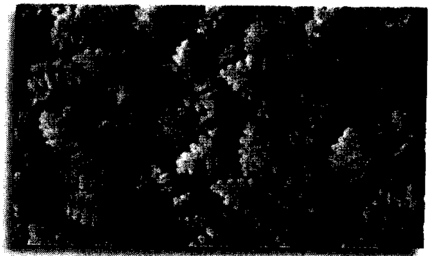

অ্যাজোলার সনাক্তকরণ অবস্থা

ধান ফসলে আগাছা

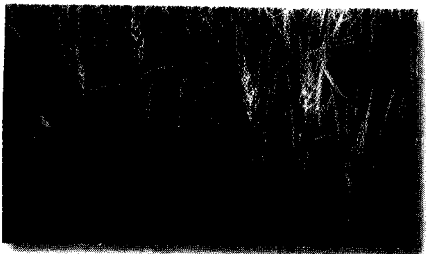

ধান ফসলে শ্যামা আগাছা

ধান ফসলে মুথা আগাছা

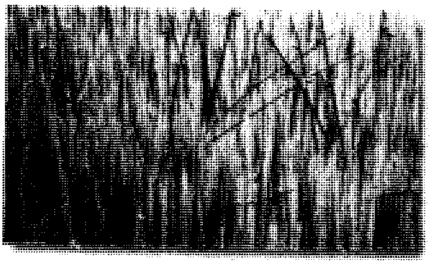

ধান ফসলে আরাইল আগাছা

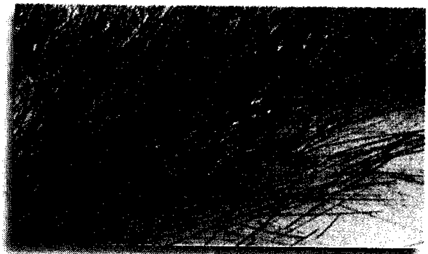

ধান ফসলে চিচড়া আগাছা

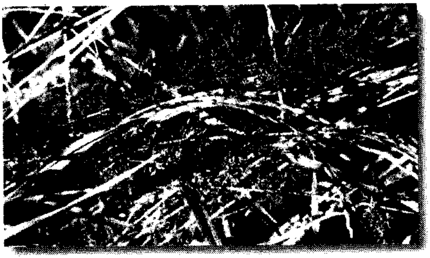

ধান ফসলে বেনা খসখসে আগাছা

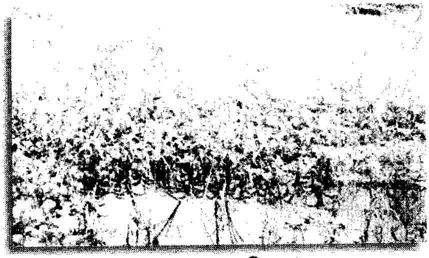

বোনা আমনে জলজ (কচুরি পানা) আগাছা

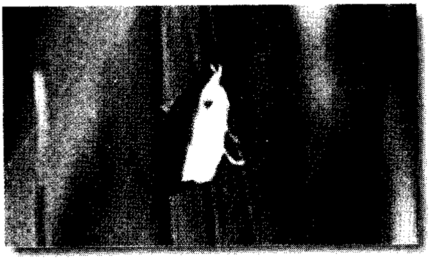

ধান ফসলে মথ

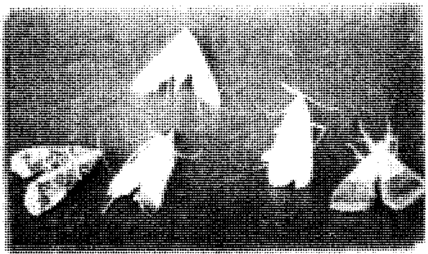

ধান ফসলের বিভিন্ন প্রজাতির মথ

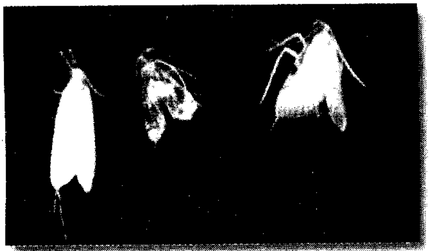

ধান ফসলের বিভিন্ন প্রজাতির মথ

ধান ফসলে প্রজাপতি

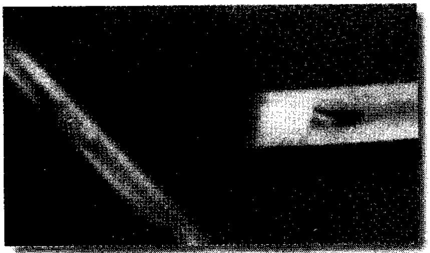

ধান গাছের কাণ্ডে আক্রমণরত গল মাছির কীঁড়া

ধান গাছের কাণ্ডের মাজরা পোকার কীড়া

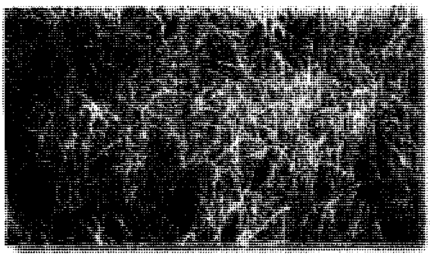

মাজরা পোকাক্রান্ত (ডেড হার্ট) ধান ফসল

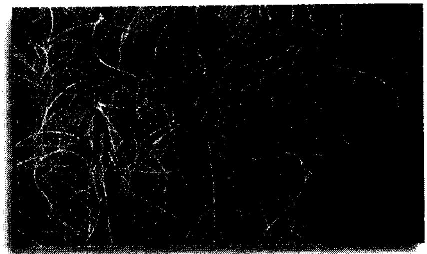

মাজরা পোকাক্রান্ত (ডেড হার্ট) ধান ফসল

সাদা মাথা কাণ্ড ছিদ্রক পোকাক্রান্ত ধান ফসল

মাজরা পোকাক্রান্ত কাটারিভোগ ধান ফসল

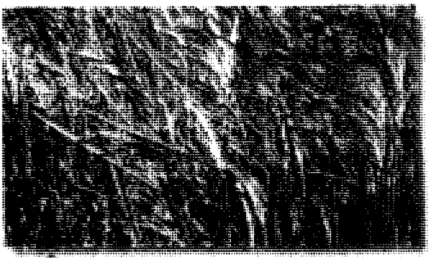

সুগন্ধি ধান ফসলে মাজরা পোকার আক্রমণাবস্থা

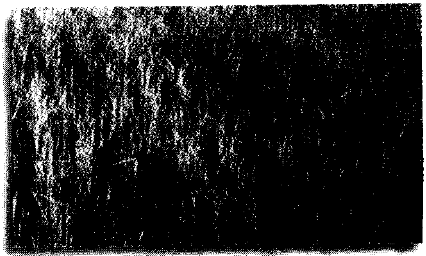

পাতামোড়ানো পোকাক্রান্ত ধান ফসল

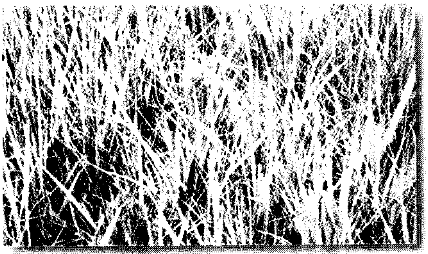

গল মাছি আক্রান্ত ধান ফসল

পাতামোড়ানো পোকাক্রান্ত ধান ফসল

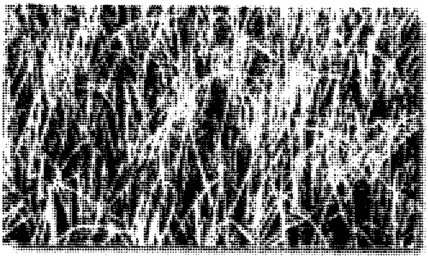

পাতামোড়ানো পোকাক্রান্ত ধান ফসল

গল মাছি আক্রান্ত ধান গাছের কাণ্ড

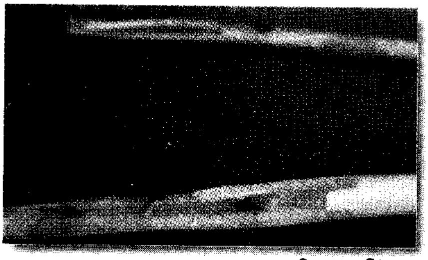

ধান গাছের কাণ্ডের অভ্যন্তরে গল গাছির শূককীট

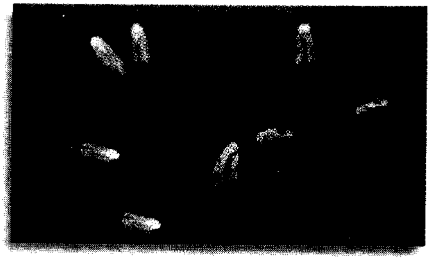

ধানের হপার পোকা

গান্ধি পোকাক্রান্ত ধান ফসল

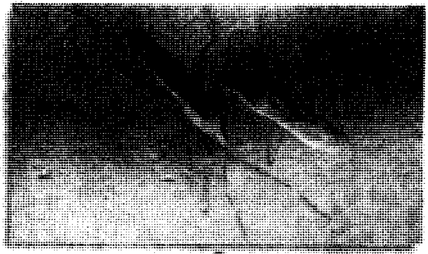

ধানের গান্ধি পোকা

ধান শীষে গান্ধি পোকার কীড়া

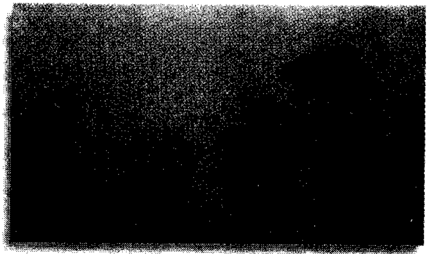

ধানের গান্ধি পোকার কীড়া

বিটল পোকাক্রান্ত ধান শীষ

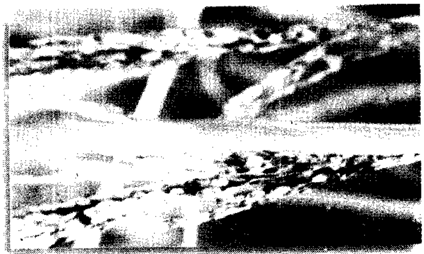

বিটল পোকাক্রান্ত ধান শীষ

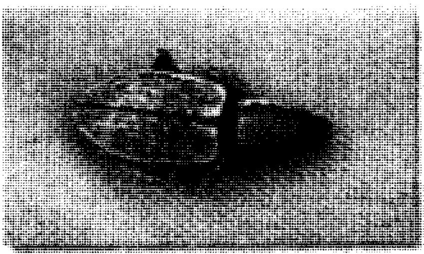

ধানের বিটল পোকা

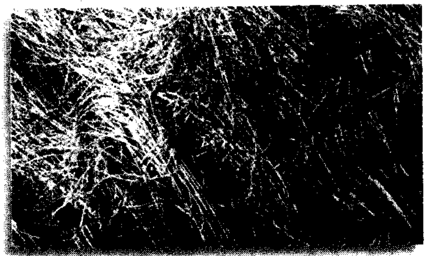

কারেন্ট পোকাক্রান্ত ধান ফসল

কারেন্ট পোকাক্রান্ত ধান ফসল

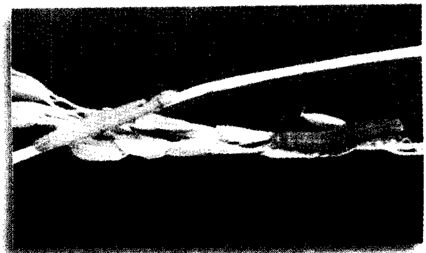

ধানের শীষকাটা লেদাপোকা (কমলা)

ধান শীষে আক্রমণরত লেদাপোকা (বাদামি)

ধান শীষে আক্রমণরত লেদাপোকা (কালচে)

ধান পাতায় আক্রমণরত লেদাপোকা (সবুজ)

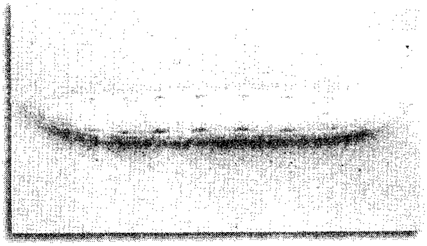

ধান ফসলের লেদাপোকা (সবুজ)

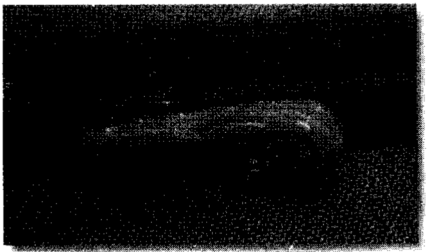

ধান ফসলের লেদাপোকা (ছাই রঙের)

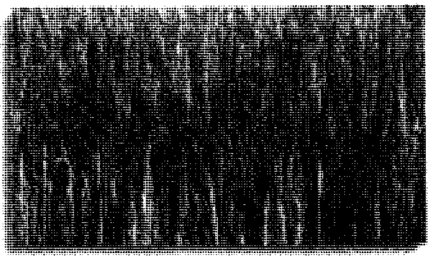

গুচ্ছাকারে ফড়িং আক্রান্ত ধান ফসল

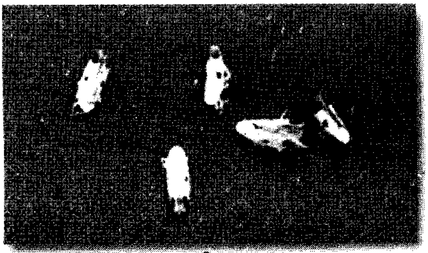

ধান ফসলের রঙিন হপার পোকা

ধান পাতায় রঙিন শুঁড়বিশিষ্ট কীড়া

ধান ফসল আক্রমণকারী ফড়িংয়ের ডিমগুচ্ছ

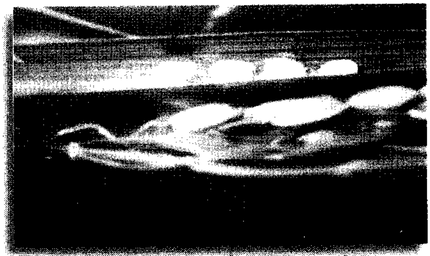

ধান পাতায় আক্রমণকারী ফড়িংয়ের ডিমগুচ্ছ

BANSDOC Library Dhaka

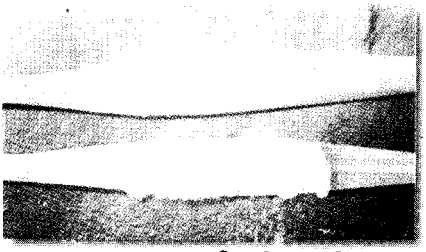

ধান পাতায় আক্রমণকারী ফড়িংয়ের ডিমগুচ্ছ

ধান ফসলে আক্রমণকারী পূর্ণাঙ্গ ফড়িং

ধান ফসলে গাছ ফড়িং কর্তৃক আক্রমণাবস্থা

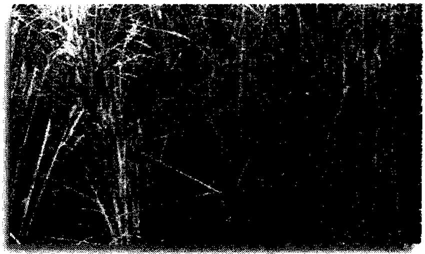

থ্রিপসজাতীয় পোকাক্রান্ত ধান ফসল

ধান ফসলের লম্বা শূঁড়বিশিষ্ট গাছ ফড়িং

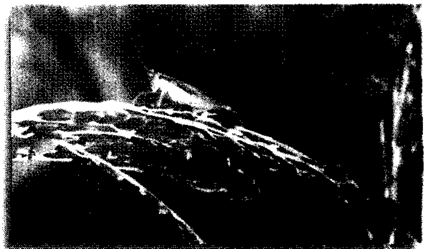

ধান শীষে আক্রমণরত গাছ ফড়িং

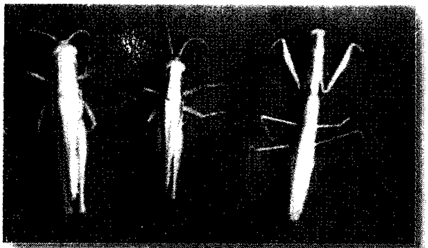

বিভিন্ন প্রকারের গাছ ফড়িং (ম্যান্টিড)

পাখিতে খাওয়া ধান ফসল

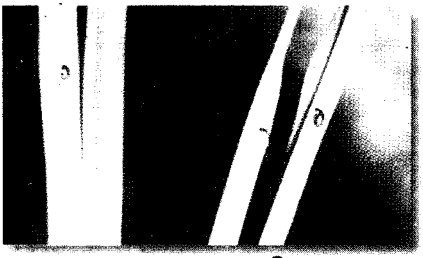

ধান পাতায় আক্রমণকারী শামুক

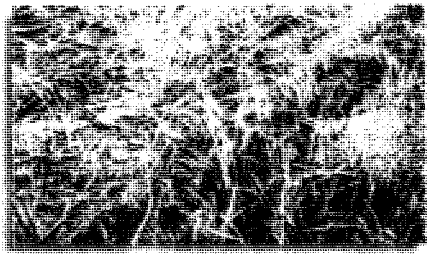

ইঁদুরে খাওয়া ধান ফসল

ধানের আইপিএম-এতে বিড়াল কর্তৃক ইঁদুর দমন

ধান কাণ্ডে অবস্থানরত মাকড়সা

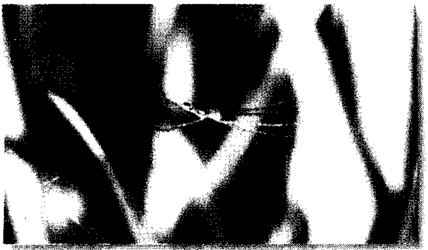

ধানের আইপিএম-এতে মাকড়সার জাল

ধানের আইপিএম-এতে মাকড়সার জাল

ধানের আইপিএম-এতে মাকড়সার জাল

ধানের আইপিএম-এতে মাকড়সার জাল

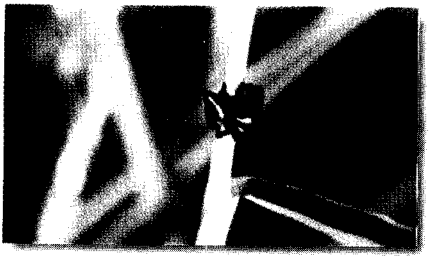

ধান ফসলে কালো মাকড়সা

ধান ফসলে ওয়াস্প পোকা

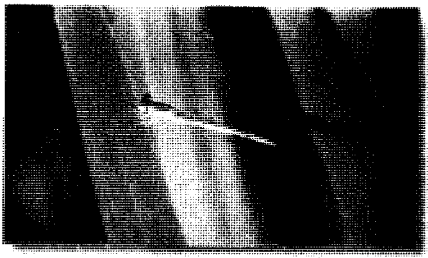

ধান ফসলে ড্যামসেল ফ্লাই

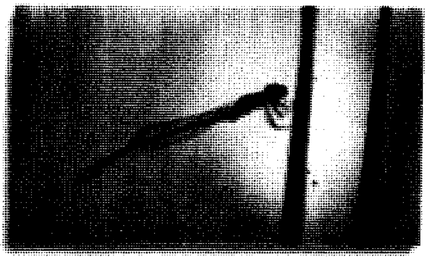

ধান ফসলে ড্যামসেল ফ্লাই

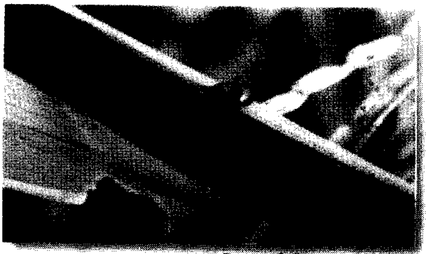

ধান ফসলে লেডিবার্ড বিটল

ধানের আইপিএম-এর অন্তর্ভুক্ত পাখি

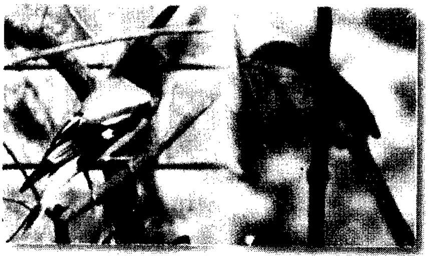

ধানের আইপিএম-এর অন্তর্ভুক্ত পাখি

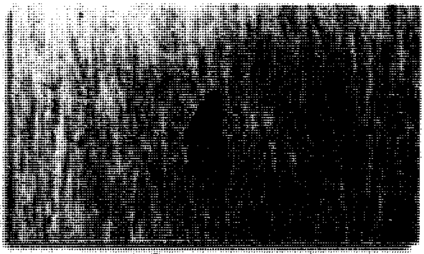

ধানের আইপিএম-এর অন্তর্ভুক্ত পাখি

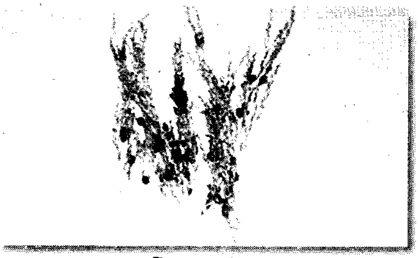
ধান শীষে স্মাট রোগ

ধান দানায় স্মাট রোগ

ধান ফসলে ব্লাস্ট রোগ

ধান ফসলে বাদামি দাগ রোগ

ধানের নিশান পাতায় ব্লাস্ট রোগ

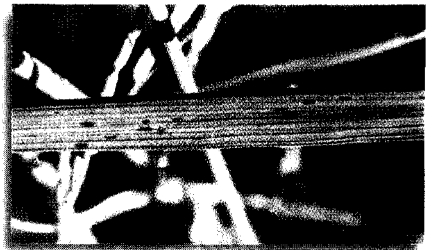
ধান পাতায় বাদামি দাগ রোগ

ধান ফসলে বাদামি দাগ রোগ

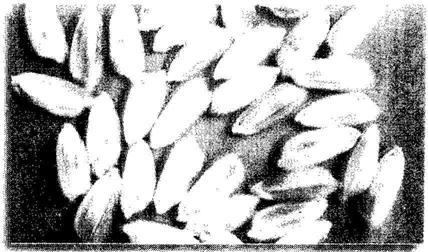
ধান দানায় বাদামি দাগ রোগ

ধান ফসলে খোলপচা রোগ

ধান ফসলে খোলধসা রোগ

ধানের সম্পূর্ণ গাছে খোলপচা রোগ

ধানের শীষ অংশে খোলধসা রোগ

ধানের শীষ অংশে খোলপচা রোগ

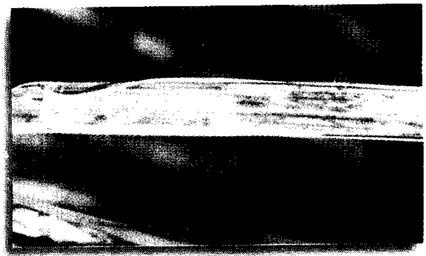

ধানের পাতাধসা রোগ

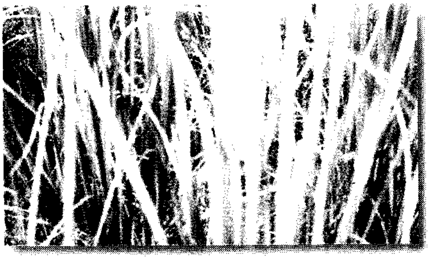

ধান কাণ্ডে খোলধসা রোগ

ধান পাতায় সরু লাল দাগ রোগ

BAMSDOC Library Dhaka

ধান পাতায় সরু লাল দাগ রোগ

ধান ফসলে বিভিন্ন রোগের সম্মিলিত আক্রমণ

বিভিন্ন প্রকার গম ফসল

শতাব্দী গম ফসল

শতাব্দী গম ফসল (নিশান পাতা বড়)

প্রতিভা গম ফসল

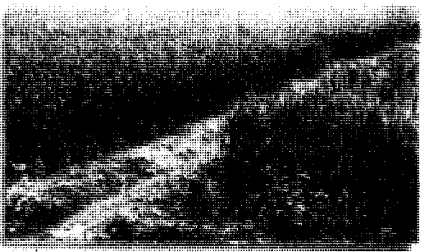

সৌরভ (বামে) ও গৌরব (ডানে) গম ফসল

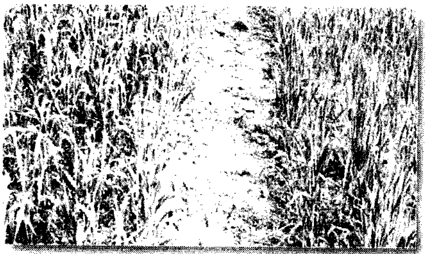

সৌরভ (বামে) ও গৌরব (ডানে) গম ফসল

সৌরভ (বামে) ও প্রতিভা (ডানে) গম ফসল

ডুরাম গম ফসল

বিএটি-১ গম ফসল

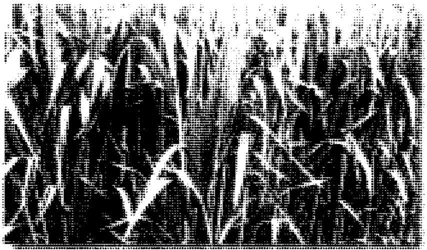

কাঞ্চন গম ফসল

কাঞ্চন গম ফসল

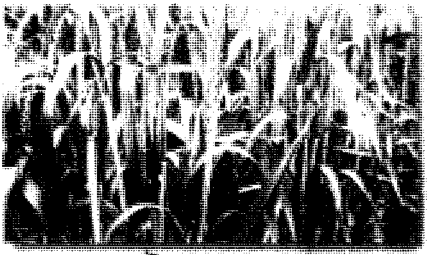

গৌরব গম ফসল

ন্যূনকর্ষণে চাষকৃত গম ফসল

গম ফসলের বিভিন্ন অংশ

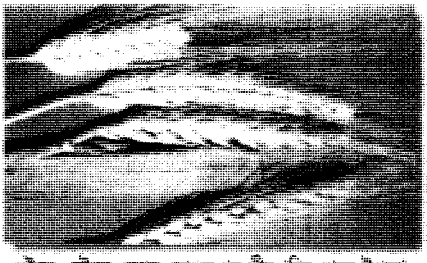

গৌরব, সৌরভ, ডুরাম, কাঞ্চন গম শীষ (নিচ থেকে উপরে)

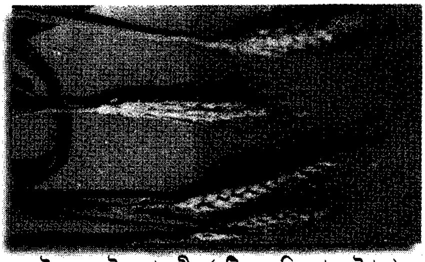

গৌরব ও সৌরভ গম শীষ (দুটি করে নিচ থেকে উপরে)

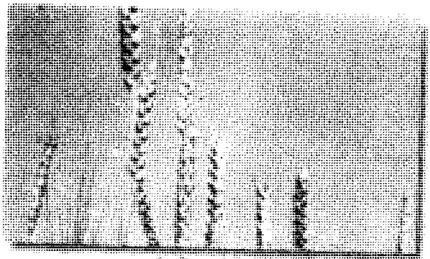

শুঙ্গবিহীন গম শীষ

আনন্দ গম শীষ, স্পাইকলেট ও দানা

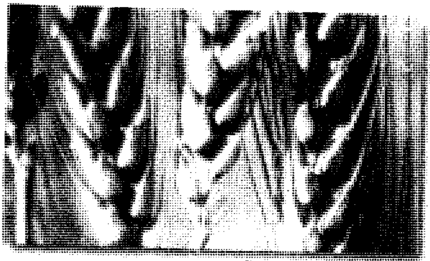

কল্যাণসোনা গম শীষ (কচি)

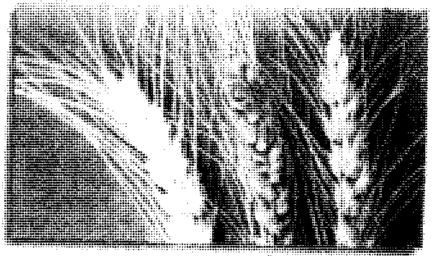

আকবর গম শীষ

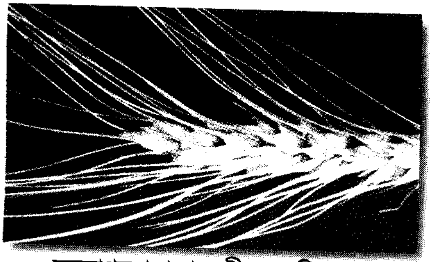

কল্যাণসোনা গম শীষ (পরিপক্ব)

সেরি গমের স্পাইকলেট ও দানা

সোনালিকা গম দানা

আকবর গম দানা

বরকত গম দানা

কাঞ্চন গম দানা

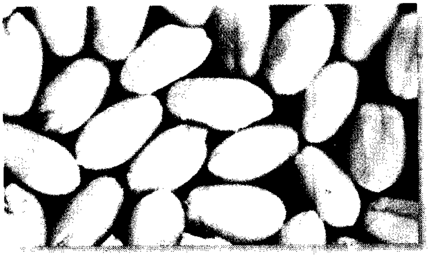

গৌরব গম দানা

অঘ্রাণী গম দানা

বলাকা গম দানা

পাভন গম দানা

ট্রিটিকেলি গম দানা

ডার্ক গম দানা

ডুরাম গম দানা

ইনিয়া গম দানা

প্রতিভা গম দানা

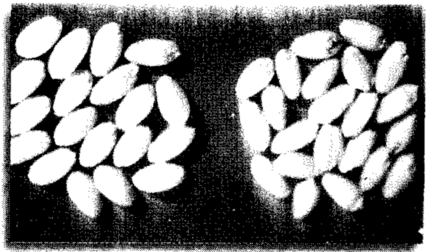
কাঞ্চন (বামে) ও সোনালিকা (ডানে) গম দানা

গম ফসলে মাজরা পোকার আক্রমণ (সাদা শীষ)

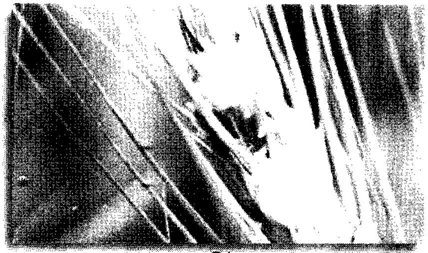
গম ফসলে বিটল পোকা

গম ফসলে N - ঘাটতিজনিত লক্ষণ

গম ফসলে Mg- ঘাটতিজনিত লক্ষণ

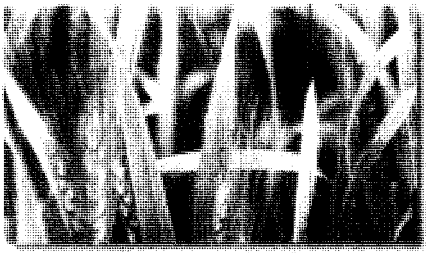

গম পাতায় Mg- ঘাটতিজনিত লক্ষণ

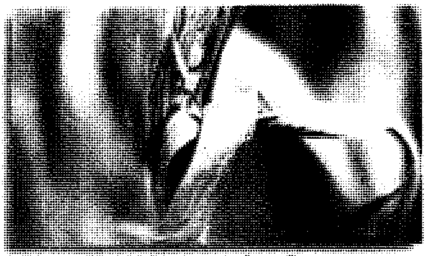

গম শীষে বোরন ঘাটতিজনিত লক্ষণ

গম ফসলে N-ও S- ঘাটতিজনিত লক্ষণ

গম পাতায় K- ঘাটতিজনিত পাতাধসা রোগ

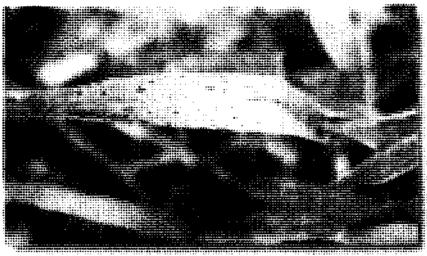

গম ফসলে পাতায় দাগ রোগ

গম ফসলে মরিচা রোগ

কারের ভুট্টা ফসল

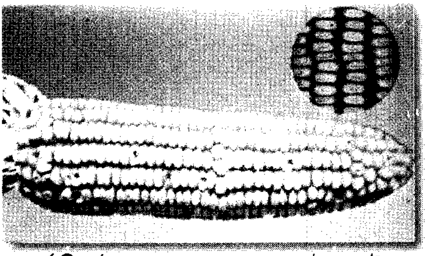

বর্ণালী ভুট্টা মোচা, মোচায় দানা (ইনসেটে)

বারি সঙ্কর ভুট্টা- ১ গাছ

প্যাসিফিক ভুট্টা গাছ

থাই সঙ্কর ভুট্টা মোচা (কচি)

সঙ্কর ভুট্টা দানা

ভুট্টার জার্মপ্লাজম (বিভিন্ন সারি)

ভুট্টা গাছে ফসফরাস ঘাটতিজনিত লক্ষণ

ভুট্টা পাতায় **P-** ও **Mg-** ঘাটতিজনিত লক্ষণ

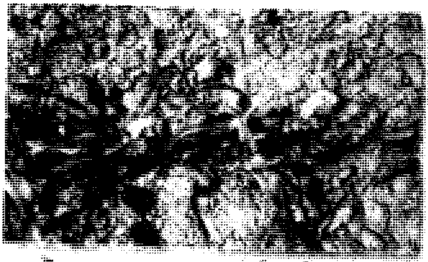

ভুট্টা পাতায় সালফার ঘাটতিজনিত লক্ষণ

ভুট্টা পাতায় Mg ও S (বামে), N ও S (ডানে) ঘাটতিজনিত লক্ষণ

ভুট্টা পাতায় পটাশিয়াম ঘাটতিজনিত লক্ষণ

ভুট্টা গাছে জিঙ্ক ঘাটতিজনিত লক্ষণ

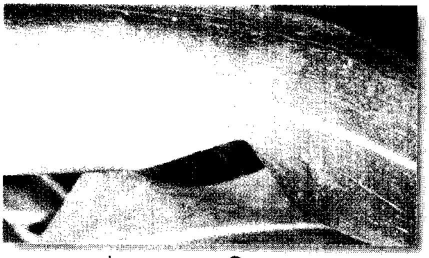

ভুট্টা পাতায় মরিচা রোগ

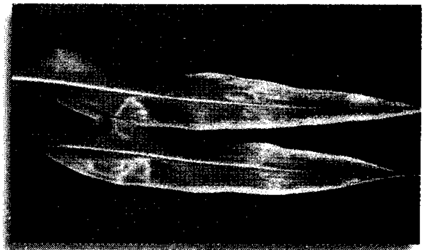

ভুট্টার পাতায় ক্লোরোসিস রোগ

ভুট্টা গাছে জাবপোকার আক্রমণ

ভুট্টা পাতায় জাবপোকা ও পিঁপড়ার আক্রমণ

ভুট্টা পাতায় সাদা কীড়া

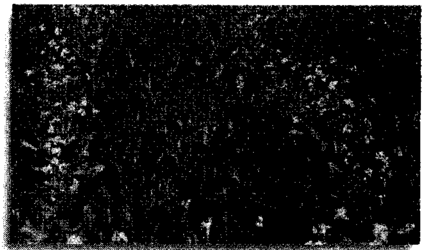

ভুট্টা ও সরিষা আন্তঃফসল

ভুট্টা ও টমেটো সাথী ফসল

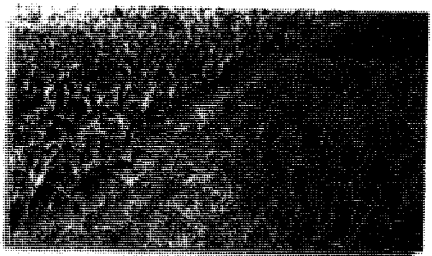

ভুট্টা ও ওট সাথী ফসল

ভুট্টা ও মিষ্টি আলু আন্তঃফসল

ভুট্টা ও সয়াবিন আন্তঃফসল

বিভিন্ন প্রকার ক্ষুদে দানা খাদ্য ফসল

সারিতে রোপিত কাউন ফসল

কাউন চারা (গোড়ায় পিঙ্ক বর্ণ)

উফশী কাউন শীষ (নতুন সারি)

নাবী কাউন ফসল

BANSDOC Library
Dhaka

খাটো জাতের কাউন ফসল

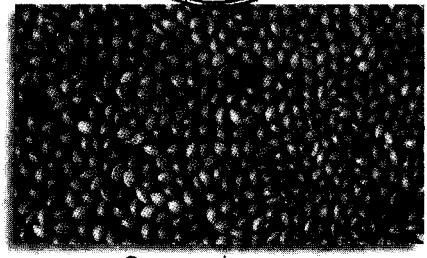
তিতাস কাউন দানা

সারিতে রোপিত চীনা ফসল

তুষার চীনা শীষ

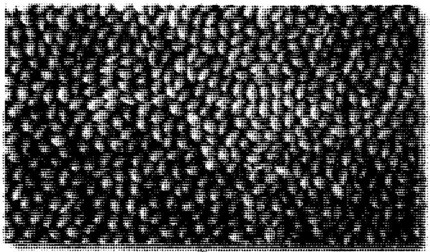
তুষার চীনা দানা

সারিতে রোপিত বার্লি ফসল

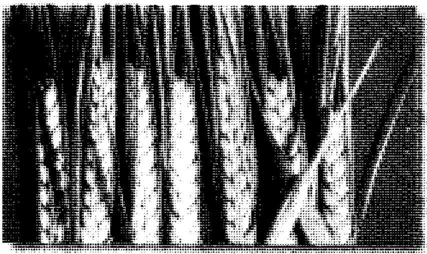
বারি বার্লি শীষ

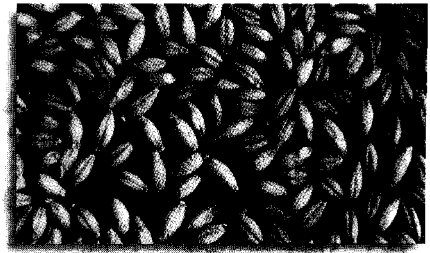
উফশী বার্লি দানা

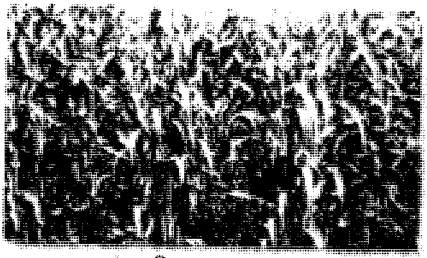
উফশী জোয়ার ফসল

সারিতে রোপিত খাটো জাতের জোয়ার ফসল

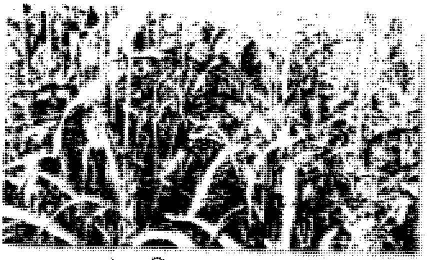
উফশী বাজরা ফসল

উফশী সরগম দানা

উফশী ওট ফসল

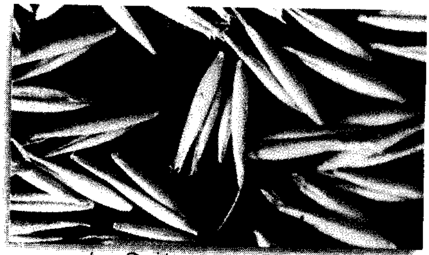
উফশী ওট দানা (খোসাসহ)

বার্লি ফসলে N-ও K- ঘাটতিজনিত লক্ষণ

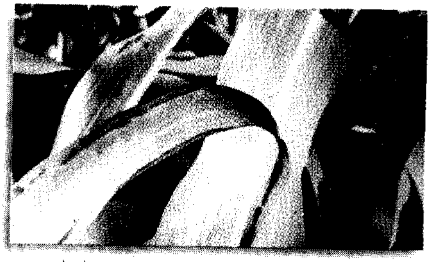
জোয়ার ফসলে পাতায় লাল দাগ রোগ

11802

মোঃ সদরুল আমিন (১৯৪৭-, জন্ম : নেত্রকোণা), পিএইচ.ডি. (মৃত্তিকা বিজ্ঞান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়)। তিনি পটুয়াখালি কৃষি কলেজের মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগে প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সিস্টেম রিসার্চ, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কৃষি পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ে লেখা ও সম্পাদনা বিষয়ে তিনি ফিলিপাইন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইন্দোনেশিয়াতে বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠপুস্তক বোর্ডে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ হিসেবে, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে মৃত্তিকা সম্পদ বিশেষজ্ঞ হিসেবে এবং বাংলাদেশ গবেষণা ইনস্টিটিউটে গবেষক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেন। ফসল উৎপাদনে সার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ের গবেষণা ও লেখালেখিতে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা ১৫টি। তাছাড়া তিনি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রায় ৩০টিরও অধিক সংখ্যক জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। ড. আমিন দেশী ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন বিজ্ঞান সমিতির একজন অন্যতম সদস্য। উচ্চ শিক্ষাস্তরে পাঠ্যসূচির অনুসরণে এ পর্যন্ত তাঁর প্রণীত ৭টি গ্রন্থ বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মৃত্তিকা বিজ্ঞানের প্রফেসর হিসেবে ও একই সাথে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজে কর্মরত ছিলেন। বর্তমানে তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামার বাড়ি, ঢাকা-তে কর্মরত আছেন। বিবাহিত জীবনে তিনি চার সন্তানের জনক।

BANSDOC Library

পাপু
৪